# সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি : একটি সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদেয় গবেষণা-সন্দর্ভ


গবেষক

**মহাদেব দাস**

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধনক্রম : A00SA1201119

বর্ষ : ২০১৯-২০২০

**তত্ত্বাবধায়ক**

**ডঃ অশোককুমার মাহাত**

অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা


**২০২৩**

# Saṃskṛta Sāhityajagate Ācārya Halāyudher Sārasvatakṛti : Ekaṭi Samīkṣā

A thesis submitted to the Faculty of Arts of Jadavpur University in partial fulfilment for the Award of the Degree of

**DOCTOR OF PHILOSOPHY**

in

**SANSKRIT**

By

**Mahadeb Das**

Registration No.: A00SA1201119

Session: 2019-2020

Under the Supervision of

**Dr. Ashok Kumar Mahata**

Professor, Dept. of Sanskrit, Jadavpur University

Department of Sanskrit

Jadavpur University

Kolkata

**2023**

## Certified that the Thesis entitled

**সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি : একটি সমীক্ষা (Saṃskṛta Sāhityajagate Ācārya Halāyudher Sārasvatakṛti : Ekaṭi Samīkṣā)** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Dr. Ashok Kumar Mahata And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Ashok Kr. Mahata
Professor, Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata-700032

Countersigned by the Supervisor :

**Prof. Dr. Ashok Kumar Mahata**

Dated : 02.05.2023

Mahadeb Das

Candidate :

**Mahadeb Das**

Dated : 02.05.2023

# ধন্যবাদ-জ্ঞাপন

**সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি : একটি সমীক্ষা** নামাঙ্কিত বিষয়কে আশ্রয় করে বহু আয়াসসাধ্য গবেষণাকর্মের সমাপ্তিলগ্নে গবেষণা-সন্দর্ভ রচনায় যাঁদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকে এই কর্মের সার্থক পরিণতি সম্ভব ছিল না, তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ-জ্ঞাপন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

গবেষণার সহায়কদের মধ্যে প্রথমেই আমার সম্মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. অশোক কুমার মাহাত মহাশয়ের নাম সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণাকার্য সম্পন্ন হত না। তাঁর নিরন্তর উৎসাহপ্রদান এবং সস্নেহ সাহায্য আমাকে আচার্য হলায়ুধের বিষয়ে গবেষণা করার অনুপ্রেরণা দান করেছে।

এই অবসরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করছি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বেদবিদ্যা কেন্দ্রের নির্দেশক বেদশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর বিভিন্ন উপদেশমূলক তথ্য আমার গবেষণাকর্মে পাথেয় হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মের গবেষণা উপদেষ্টা সমিতির সদস্য হিসাবে ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিদুষী অধ্যাপিকা ডঃ কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য

মহাশয়া। গবেষণা-সন্দর্ভ রচনায় তাঁর কাছ থেকে আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। তাঁকে আমার আন্তরিক প্রণাম, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপিকা ড. দেবার্চনা সরকার মহাশয়ার নিকট অনুসন্ধানবিধি বিষয়ে নানা পরামর্শলাভে উপকৃত হয়েছি। তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. দেবদাস মণ্ডল মহাশয়ের সস্নেহ পরামর্শ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সর্বদা গবেষণায় অনুপ্রেরণা দান করেছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আমার কোনও ভাষা নেই। তাঁর অমূল্য উপদেশাবলীকে পাথেয় করে যাতে জীবনে এগিয়ে যেতে পারি ঈশ্বরের নিকট এটাই কাম্য।

এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. সেল ও রিসার্চ সেকশনের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে কর্মরত কর্মীবৃন্দের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমার অনুরোধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রদানের মধ্য দিয়ে আমাকে গবেষণা-কার্যের পরিসমাপ্তিতে পৌঁছতে সাহায্য করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক শ্রুতিদি ও নিমাইদার নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁরা আমাকে গ্রন্থপ্রদান বিষয়ে আশাতিরিক্তভাবে সহায়তা করেছেন।

যাঁদের আশীর্বাদে আজ এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি তাঁরা হলেন আমার বাবা শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস ও মা শ্রীমতী সুচিত্রা দাস। তাঁরা আজীবন আমার সফলতা কামনা করেছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনও ভাষা আমার নেই। তাঁদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

আমার সহধর্মিণী চন্দনার প্রতি রইল শুভকামনা। তাঁর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মনোভাব সর্বদাই আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আমার কন্যা মনস্বিনীর প্রতি থাকল প্রাণভরা ভালবাসা ও আশীর্বাদ। ঈশ্বরের নিকট কামনা করি তাঁর চিন্তা ও চেতনায় সর্বদা শুভবুদ্ধির উদয় হোক এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হোক।

এই গবেষণার কাজে যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাশে পেয়েছি তাঁরা হলেন অধ্যাপিকা রিকি চক্রবর্তী মহাশয়া, পিংকি খাতুন, দেবাশিষ পাত্র, নিলাদ্রি ঘড়া, সৈকত বেরা, হাবল রুইদাস, রামকুমার তিওয়ারী প্রমুখ। এঁদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। সকলের সারস্বত যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক।

এই শুভক্ষণে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় জীবনের কয়েকজন শিক্ষাগুরুকে স্মরণ করছি যাঁদের সুশিক্ষা ও সহযোগিতায় আমি উচ্চশিক্ষার দ্বারে পৌঁছতে পেরেছি।

পরিশেষে, জগৎপিতা ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর অপার করুণায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করে এই মহৎ কর্ম সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি। তাঁর করুণ ও আশীর্বাদ আমার জীবনের পাথেয়।

যাদবপুর, কলকাতা, ২০২৩ বিনয়াবনত

শ্রী মহাদেব দাস

# সূচীপত্র


| **বিষয় :** | **পৃষ্ঠাঙ্ক** |
|---|---|
| **ধন্যবাদ-জ্ঞাপন :** | i-iii |
| **সূচীপত্র :** | iv-vii |
| **সংকেতসূচি :** | viii-xii |
| **ভূমিকা :** | **১-১৪** |
| **প্রথম অধ্যায় : সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের পরিচয় :** | **১৫-৫৪** |
| ১.১. আচার্য হলায়ুধ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত | ১৫ |
| ১.২. দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজবংশ ও আচার্য হলায়ুধ | ২৪ |
| ১.৩. দাক্ষিণাত্যের হলায়ুধের ব্যক্তিগত পরিচিতি ও কাল | ৩৬ |
| ১.৪. বঙ্গদেশের ইতিহাসে সেন রাজবংশ ও আচার্য হলায়ুধ | ৩৮ |
| ১.৫. বঙ্গদেশীয় হলায়ুধের ব্যক্তিগত পরিচিতি ও কাল | ৪৬ |
| ১.৬. বঙ্গদেশীয় হলায়ুধের পারিবারিক জীবন | ৫০ |
| ১.৭. বঙ্গদেশীয় হলায়ুধের কর্মজীবন | ৫২ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায় : আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত রচনাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :** | **৫৫-১০৭** |
| ২.১. আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত গ্রন্থসমূহ | ৫৫ |
| ২.২. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* | ৫৭ |
| ২.৩. *মীমাংসাসর্বস্ব* | ৬১ |
| ২.৪. *পণ্ডিতসর্বস্ব* | ৬৩ |
| ২.৫. *শৈবসর্বস্ব* | ৬৩ |
| ২.৬. *বৈষ্ণবসর্বস্ব* | ৬৪ |

২.৭. *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি (হলায়ুধবৃত্তি)* ৬৪
২.৮. *কর্মোপদেশিনী* ৬৫
২.৯. *দুর্গোত্সববিবেক* ৬৬
২.১০. *মত্স্যসূক্ততন্ত্র* ৬৬
২.১১. *দ্বিজনয়ন* ৬৭
২.১২. *সেক-শুভোদয়া* ৬৭
২.১৩. *কবিরহস্য* ৭৪
২.১৪. *অভিধানরত্নমালা* ১০১
২.১৫. *হলায়ুধস্তোত্র* ১০৪
২.১৬. *ক্রিয়ানিঘণ্টু* ১০৬

**তৃতীয় অধ্যায় : লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধ রচিত নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা : ১০৮-২৪০**

৩.১. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা : ১০৮
৩.১.১. বেদভাষ্যকার হলায়ুধ ও *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ১০৮
৩.১.২. *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* নামকরণ ও সর্বস্ব শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ১০৯
৩.১.৩. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়সংক্ষেপ ১১০
৩.১.৪. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন ১১১
৩.১.৫. পুরাণসাহিত্য, স্মৃতি ও নিবন্ধ-গ্রন্থের প্রমাণ-প্রয়োগের আকররূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ১৩৭
৩.১.৬. *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* সংস্কারতত্ত্ব ১৪০
৩.১.৭. হলায়ুধ ও গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যাপদ্ধতির তুলনাত্মক অধ্যয়ন ১৫৩
৩.১.৮. হলায়ুধের রচনায় গৃহ্যসূত্রের প্রভাব ১৫৪
৩.১.৯. *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* ব্যাখ্যায় গুণবিষ্ণুপ্রণীত ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের প্রভাব ১৫৫
৩.১.১০. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের স্বরূপ আলোচনা ১৫৬

৩.১.১১. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের উৎস অনুসন্ধান ১৫৭

৩.১.১২. হলায়ুধমতে বেদাধ্যয়নের শর্তাবলি ১৫৯

৩.১.১৩. হলায়ুধমতে বেদাধ্যয়নের রীতি ১৬০

৩.১.১৪. হলায়ুধপ্রণীত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ভাষ্যের রচনাশৈলী ১৬২

৩.১.১৫. *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ব্যাখ্যা ১৬৪

৩.১.১৬. *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* উদ্ধৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা ১৬৯

৩.২. *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা : ১৭২

৩.২.১. ভারতীয় দর্শন ও বেদ ১৭২

৩.২.২. দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ১৭৪

৩.২.৩. মীমাংসাদর্শন ১৭৪

৩.২.৪. মীমাংসা শব্দের অর্থ ১৭৬

৩.২.৫. মীমাংসাদর্শনের প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও ভাষ্যগ্রন্থ ১৭৬

৩.২.৬. *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ১৭৭

৩.২.৭. আচার্য জৈমিনির পরিচয় ১৭৯

৩.২.৮. মীমাংসাচর্চায় আচার্য হলায়ুধভট্ট ১৮০

৩.২.৯. *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন ১৮০

৩.২.১০. *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের রচনাশৈলী ১৯২

৩.৩. *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* (*হলায়ুধবৃত্তি*) বিশেষ পর্যালোচনা : ১৯৪

৩.৩.১. বেদাঙ্গ ১৯৪

৩.৩.২. ছন্দঃ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থবিচার ১৯৬

৩.৩.৩. বৈদিক ছন্দ ১৯৮

৩.৩.৪. ছন্দঃশাস্ত্রের মূল ২০০

৩.৩.৫. ছন্দঃশাস্ত্রের প্রাচীনতা ২০০

৩.৩.৬. *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের বিষয়বস্তু ২০১

৩.৩.৭. পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ২০৫

৩.৩.৮. ছন্দঃশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২০৫

৩.৩.৯. ছন্দঃসূত্রকার পিঙ্গলাচার্য ২১১

৩.৩.১০. আচার্য পিঙ্গলের নিবাসস্থল ২১৪

৩.৩.১১. পিঙ্গলকৃত ছন্দঃসূত্রের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ২১৪

৩.৩.১২. বৃত্তিকার হলায়ুধ ২১৫

৩.৩.১৩. *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের *হলায়ুধবৃত্তি*র বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন ২১৫

৩.৩.১৪. *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি*র গুরুত্ব ২৩৬

৩.৩.১৫. *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি*র রচনাশৈলী ২৩৮

**চতুর্থ অধ্যায় : লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন : ২৪১-২৫৪**

৪.১. অবতরণিকা ২৪১

৪.২. সংস্কৃত সাহিত্যজগতের শাখা-প্রশাখায় লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের অবদান ২৪৩

৪.৩. লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের রচনায় পূর্বাচার্যদের প্রভাব ২৪৭

৪.৪. পরবর্তী সাহিত্যে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের রচনার প্রভাব ২৫০

**উপসংহার : ২৫৫-২৬২**

**নির্ঘণ্ট : ২৬৩-২৭৩**

**গ্রন্থপঞ্জি : ২৭৪-২৮৪**

# ভূমিকা

**অবতরণিকা** (Introduction) :

পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অতিপ্রাচীন। দীর্ঘ সময় ধরে নানাবিধ শ্রেণীর সাহিত্য এই ভাষায় রচিত হয়েছে। সাহিত্যকে সমাজের দর্পণ হিসেবে ধরা হয়। একটি সমাজের বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে ভালভাবে চিত্রিত হয়ে থাকে। সংস্কৃত সাহিত্য হল সেই দর্পণ যেখানে সংস্কৃতি-সম্পন্ন ভারতকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। ভারতে বসবাসকারী মানুষের ধর্ম, বেশভূষা, লোকাচার, নানাবিধ অভ্যাস, সংস্কৃতি সবই সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ ভারতীয় সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্য মুলত দুভাগে বিভক্ত- বৈদিক সাহিত্য ও লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হল প্রতি বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং ষড়্বেদাঙ্গ, পরিশিষ্ট ইত্যাদি গ্রন্থ। আবার লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গদ্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য, দর্শনশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ রয়েছে।

## সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ও আচার্য হলায়ুধের অবস্থান :

সমগ্র মানবজাতির সামাজিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাসের প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ আকরগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল বৃহদায়তন বৈদিক সাহিত্য। তবে এই অনন্যসাধারণ সাহিত্য বেদকে ঐতিহ্যগতভাবে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বলে মনে করা হয় না। এটি হল ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর, যা ঈশ্বরের মতই নিত্য এবং

অপৌরুষেয়।[১] বেদ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বৈদিক সাহিত্য ভারতীয় সভ্যতার উৎসস্বরূপ। ভারতীয়দের ধর্ম-কর্ম, রীতি-নীতি ও ধ্যান-ধারণার ওপর বৈদিক সাহিত্যের সর্বব্যাপী প্রভাব বিদ্যমান। বেদ শব্দটি বিদ্ ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হল জ্ঞান। এছাড়াও বিদ্ ধাতুর আরও তিনরকম অর্থ রয়েছে। যেমন – সত্তা, লাভ ও বিচার।[২] জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগে বেদশব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। বেদের লক্ষণ বিষয়ে আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, "প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।"[৩] অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করবার কোনও উপায় নেই, সেই অতীন্দ্রিয় পরম জ্ঞান বেদ থেকেই লব্ধ হয়। এখানেই বেদের বেদত্ব সিদ্ধ হয়।

ভারতীয় আচার্যদের মতে এই বেদ হল অনাদিকাল থেকে চলে আসা পরমজ্ঞান। জগৎসৃষ্টির পর ঋষিরা তাঁদের দিব্য অনুভূতি বা তপস্যার দ্বারা সেই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রাচীন ভারতে ঋষিদের দ্বারা দৃষ্ট বেদমন্ত্রগুলিকে শিষ্যরা শুনে শুনে মনে রাখতেন। সুতরাং শ্রবণযোগ্য সাহিত্য হওয়ায় বেদের অপর নাম হল শ্রুতি।

আকৃতিগত দৃষ্টিতে বেদ চারপ্রকার। যথা– ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ। তবে বিষয়বস্তুগত দিক দিয়ে বেদের দুটি ভাগ– মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের অপর নাম হল সংহিতা। ব্রাহ্মণ আবার তিনভাগে বিভক্ত, যথা– শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক

---

[১] অপৌরুষেযং বাক্যং বেদঃ, বিশ্বরূপ সাহা সম্পাদিত, অর্থ., পৃ. ২৮

[২] সত্তাযাং বিদ্যতে জ্ঞানে বেত্তি বিন্তে বিচারণে।
বিন্দতে বিন্দতি প্রাপ্তৌ শ্যন্লুক্শ্নম্শেষ্বিদং ক্রমাৎ।। সিদ্ধান্ত., ২য় খণ্ড. পৃ. ২৫৫

[৩] ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যভূমিকা।

এবং উপনিষদ। মন্ত্রভাগ পদ্যে রচিত, তবে যজুর্বেদের মধ্যে গদ্যমন্ত্রও আছে। মন্ত্রভাগের মধ্যে এক শ্রেণির মন্ত্রে শুধুমাত্র বিভিন্ন দেবতার স্তব করা হয়েছে এবং অপর শ্রেণির মন্ত্রে স্বর্গ, ধন, আয়ু, পুত্র প্রভৃতির প্রার্থনা করা হয়েছে। আচার্য শৌনকের মতে, প্রথম শ্রেণির মন্ত্র হল স্তুতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির মন্ত্র হল আশীঃ। আবার অনেকের মতে, ব্রাহ্মণের শেষ অংশ হল আরণ্যক এবং আরণ্যকের শেষ অংশ হল উপনিষদ। ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে রচিত। সুতরাং আকৃতিগত দিক থেকে বেদ চারপ্রকার হলেও বিষয়বস্তুগত দিক থেকে প্রতিটি বেদ আবার মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ ভেদে চারপ্রকার।

চারপ্রকার বেদের মধ্যে প্রাচীনতম হল ঋগ্বেদ। আর এই ঋগ্বেদই সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদের উৎস বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রথম অবস্থায় ঋক্, সাম ও যজুঃ- এই তিনটি বেদই ত্রয়ী নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন ধারা অনুসারে সংহিতা চার প্রকার হলেও বেদ মন্ত্রগুলি তিন প্রকারের হওয়ার কারণেও বেদকে ত্রয়ী বলা হয়ে থাকে।

সামবেদ গেয় বেদ বলে পরিচিত। এই বেদের অনেক শাখা বিদ্যমান। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে সামবেদের সহস্র শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে তিনটি শাখার নাম জানা যায়। যথা– কৌথুম, রাণায়নীয় ও জৈমিনীয়। পৃথক পৃথক যজ্ঞানুষ্ঠানে যে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের প্রয়োজন হয় এবং যে বিধিনিয়মগুলি পালন করতে হয় তাদের সমষ্টিই যজুর্বেদ-সংহিতা নামে পরিচিত। গদ্যাত্মক এই বেদের মধ্যে যজ্ঞসম্পাদনের বিধানগুলি পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ থেকে কেবলমাত্র যজুর্বেদের এক-চতুর্থাংশ মন্ত্রই গৃহীত হয়েছে আর বাকি সকল অংশই গদ্যময় ও প্রয়োগবিধির দ্বারা পরিপূর্ণ। যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মন্ত্রকে যজুঃ বলে। আচার্য যাস্ক তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে যজুঃ শব্দের নির্বচন

করেছেন– 'যজুর্যজতেঃ'।[৪] আবার অন্যভাবে বলা হয়, যে মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ করা হয় তাকে যজুঃ বলা হয়– 'ইজ্যতেঽনেনেতি যজুঃ।' আচার্য জৈমিনি তাঁর *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থে যজুঃ শব্দের লক্ষণে বলেছেন, 'শেষে যজুঃ শব্দঃ'।[৫] অর্থাৎ ঋক্ ও সাম ভিন্ন যা শেষ বা অবশিষ্ট তার নাম যজুঃ। যজুঃ গদ্য ও পদ্যময় মন্ত্র দ্বারা সন্নিবিষ্ট। *যজুর্বেদের* বহু শাখার প্রচলন ছিল। *বিষ্ণুপুরাণ* অনুসারে *যজুর্বেদের* সাতাশটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বেদের প্রধান দুটি ভাগ হল *কৃষ্ণযজুর্বেদ* ও *শুক্লযজুর্বেদ*। *কৃষ্ণযজুর্বেদ* *শুক্লযজুর্বেদ* অপেক্ষা প্রাচীন। *কৃষ্ণযজুর্বেদে* মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিশ্রিত হয়ে রয়েছে, অপরদিকে *শুক্লযজুর্বেদে* মন্ত্রভাগ থেকে ব্রাহ্মণভাগ পৃথক্ করা হয়েছে। *কৃষ্ণযজুর্বেদের* পাঁচটি শাখা প্রসিদ্ধ আর *বিষ্ণুপুরাণ* অনুসারে যদিও *শুক্লযজুর্বেদের* পঞ্চাশটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে সেগুলি অনুপলব্ধ। *শুক্লযজুর্বেদের* প্রধান দুটি শাখা হল- কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। বেদভাষ্যকার আচার্য হলায়ুধ সায়ণাচার্যের পূর্ববর্তী বেদভাষ্যকারদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই প্রথম *শুক্লযজুর্বেদের কাণ্ব*শাখার ওপর ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর রচিত ভাষ্যের নাম *ব্রাহ্মণসর্বস্ব।* সায়ণাচার্যের পরবর্তীকালেও এই শাখার ওপর ভাষ্য রচনা করেছিলেন অনন্তাচার্য ও আনন্দবোধ। কিন্তু হলায়ুধভট্টই এই শাখার ভাষ্যকারদের মধ্যে প্রাচীনতম। এই বিষয়ে *কর্মোপদেশিনী* নামে হলায়ুধের একটি গ্রন্থের কথা জানা যায়। তবে কেউ কেউ মনে করেন এটি *ব্রাহ্মণসর্বস্বেরই* অপর নাম।

বেদের অর্থবোধে ছয়টি বেদাঙ্গের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। এই ছয়টি বেদাঙ্গ হল- শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। বেদাঙ্গসমূহের মধ্যে ছন্দঃশাস্ত্রের রচয়িতা

---

[৪] যজুর্যজতেঃ, নি, ৭.১২

[৫] মী. সূ. ২.১.৩৭

হলেন পিঙ্গলমুনি। আচার্য পিঙ্গলের সূত্রগুলির ওপর হলায়ুধ একটি বৃত্তিগ্রন্থ রচনা করেন। এই বৃত্তির নাম হল *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি*।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত *রামায়ণ* ও *মহাভারত* ভারতীয় সাহিত্য ও সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদ্যাবধি ভারতীয় সমাজ এই দুটি মহাকাব্য রচনাকে উৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ সারির রচনারূপে স্বীকার করে। মানুষের জীবনও এই দুটি মহাকাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। *রামায়ণ* শিক্ষা দেয় রামের মতো আচরণ পালন করার এবং রাবণের মত আচরণ বর্জন করার। মম্মটাচার্য বলেছেন- 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবত্'।[৬] এই মহাকাব্য দুটির রচনা অন্যদের কাছে সাহিত্য রচনা করার প্রেরণা জোগায়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন রাজার রাজসভার সভাকবিরা আলঙ্কারিক মহাকাব্য রচনা করেন। সেইসঙ্গে তাঁরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক রাজাদের প্রশস্তিসূচক কাব্যও রচনা করেন। ইতিহাসাশ্রিত এই সমস্ত কাব্যকে ঐতিহাসিক কাব্য বলে সাহিত্য সমালোচকেরা নামকরণ করেছেন। আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত এমনই একটি ঐতিহাসিক কাব্যের নাম হল *কবিরহস্য*।

ধীরে ধীরে সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ ঘটতে থাকে। বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থকারদের দ্বারা এই ভাষাতেই দর্শনশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ প্রণীত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আছে গৌতমাচার্যের ন্যায়দর্শন, কণাদের বৈশেষিকদর্শন, কপিলমুনির সাংখ্যদর্শন, পতঞ্জলির যোগদর্শন, বাদরায়ণের বেদান্তদর্শন এবং জৈমিনির মীমাংসাদর্শন। পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য, শবরস্বামী প্রমুখ আচার্যগণ দর্শনশাস্ত্রসমূহের ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। আরও পরবর্তী সময়ে এই দর্শনশাস্ত্রগুলি অবলম্বনে নানা দার্শনিক প্রকরণ গ্রন্থ রচিত হয়।

---

[৬] কাব্য, প্রথম উল্লাস, কারিকা ২

মীমাংসাদর্শন অবলম্বনে আচার্য হলায়ুধ যে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন সেটির নাম হল *মীমাংসাসর্বস্ব*।

এই সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছে নানা ধরনের কাব্য ও নাটক। এই ভাষার কয়েকজন প্রথিতযশা কবি হলেন কালিদাস, ভাস, অশ্বঘোষ, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রমুখ। তাঁরা ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি।

সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করে অনেক ব্যাকরণগ্রন্থও রচিত হয়েছে। এই ভাষাতেই পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের সমস্ত নিয়ম পাওয়া যায়। এছাড়াও পতঞ্জলি, কাত্যায়ন প্রমুখ বৈয়াকরণ এই ভাষাকে আশ্রয় করেই তাঁদের ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। আচার্য হলায়ুধের লেখা *কবিরহস্য* ঐতিহাসিক কাব্যটির সঙ্গে ব্যাকরণশাস্ত্রের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এখানে নানা ধাতুর নানাবিধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একথা বলা যায় যে ব্যাকরণশাস্ত্রেও আচার্য হলায়ুধের অবদান আছে। তবে একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হলায়ুধের নামাঙ্কিত সকল গ্রন্থের রচয়িতা অভিন্ন হলায়ুধ কি না সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অপর একটি আলোচনার ক্ষেত্র হল কোষকাব্য। সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করেই অনেক জনপ্রিয় কোষকাব্যকার কোষগ্রন্থ রচনা করেছেন। ভারতবর্ষে কোষকাব্যের প্রারম্ভ ঘটে বৈদিক শব্দের সংগৃহীত রূপ *নিঘণ্টু* নামক কোষগ্রন্থের মধ্য দিয়ে। পরবর্তী সময়ে আরও অনেক জনপ্রিয় কোষগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছে। যেমন– অমরসিংহ কৃত *অমরকোষ।* অমরসিংহের মতো

হলায়ুধও ছিলেন একজন জনপ্রিয় কোষকাব্যকার। তাঁর রচিত কোষগ্রন্থের নাম হল *অভিধানরত্নমালা।*

আচার্য হলায়ুধের নাম শুধু বেদভাষ্যকাররূপেই নয়, বরং জ্যোতির্বিদ্, গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক হিসেবেও সমধিক প্রসিদ্ধ। *দ্বিজনয়ন* নামে জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে হলায়ুধের নাম জানা যায়। পিঙ্গলের *ছন্দঃসূত্রের* বৃত্তিতে আচার্য হলায়ুধের গণিতবিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলি ছাড়া আচার্য হলায়ুধরচিত আরও কতকগুলি গ্রন্থের নাম উপলব্ধ হয়। এগুলি হল- *বৈষ্ণবসর্বস্ব, শিবসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, দুর্গোত্সববিবেক, মত্স্যসূক্ততন্ত্র, ক্রিয়ানিঘণ্টু, হলায়ুধস্তোত্র, শ্রাদ্ধপদ্ধতিটীকা, নবগ্রহমন্ত্রব্যাখ্যা, সংবৎসরপ্রদীপ, সেক-শুভোদয়া* প্রভৃতি। তবে আচার্য হলায়ুধের ব্যক্তিপরিচয় নিয়ে নানাবিধ বিতর্ক থাকায় এই সমস্ত গ্রন্থের রচয়িতা এক এবং অভিন্ন নাও হতে পারে।

## গবেষণার বিষয়নির্ধারণ (Selection of the Topic) :

সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অথচ তাঁর সম্বন্ধে গবেষণায় গুরুত্ব তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। আচার্য হলায়ুধের গ্রন্থসমূহের বিষয়ের ব্যাপ্তি বিস্ময়কর। তাঁর নামাঙ্কিত সর্বস্ব গ্রন্থগুলির মৌলিকত্ব ও বিষয়বস্তু বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এছাড়া তিনি পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রের বৃত্তিকার হিসাবেও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আবার একটি অভিধানগ্রন্থ *অভিধানরত্নমালা* ও একটি ঐতিহাসিক কাব্য *কবিরহস্য* যা ব্যাকরণের আলোচনাতেও গুরুত্বপূর্ণ- এদের রচয়িতা এবং সর্বস্ব গ্রন্থগুলির রচয়িতা অভিন্ন কি না– এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন ও সংশয় আছে। এছাড়া আরও

অনেকগুলি গ্রন্থ আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত যাদের সম্বন্ধে তত বেশি তথ্য সহজলভ্য নয়। তাই উক্ত প্রশ্ন ও সংশয়সমূহের নিরসনের চেষ্টায় **'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা'** নামক বিষয় নির্বাচন করে একটি গবেষণাসন্দর্ভ প্রস্তুত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

## গবেষণাসন্দর্ভের প্রকল্প ও সম্ভাব্য অধ্যায়বিভাজন (Hypothesis & Chapterization) :

**'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা'** নামক গবেষণা-সন্দর্ভের মধ্যে ভূমিকা ও উপসংহার সহ মোট ছয়টি অধ্যায় রাখা হয়েছে। ভূমিকা অংশে আলোচনার সূত্রপাত হিসাবে বৈদিক সাহিত্য সমেত সংস্কৃত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে তার সঙ্গে আচার্য হলায়ুধভট্টের সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় হল **সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের পরিচয়।** এই অধ্যায়ে নানাবিধ গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য হলায়ুধের পরিচয় বিষয়ে সমস্যা ও নানাবিধ মত, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজাদের সঙ্গে হলায়ুধের সম্পর্ক, বঙ্গদেশের সেনবংশের সঙ্গে হলায়ুধের সম্পর্ক এবং হলায়ুধের বংশপরিচয়, পারিবারিক ও কর্মজীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করা হবে।

গবেষণা-সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত রচনাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।** এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত সমস্ত রচনার সম্ভাব্য সম্পূর্ণ তালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত যে সব গ্রন্থের কথা জানা গিয়েছে, তাদের

বিষয়বস্তুগত পর্যালোচনা করা হয়েছে। হলায়ুধের নামে প্রচলিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, *মীমাংসাসর্বস্ব*, *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* (*হলায়ুধবৃত্তি*), *পণ্ডিতসর্বস্ব*, *শিবসর্বস্ব*, *বৈষ্ণবসর্বস্ব*, *কবিরহস্য*, *অভিধানরত্নমালা*, *দ্বিজনয়ন*, *মৎস্যসূক্ততন্ত্র*, *সেক-শুভোদয়া*, *হলায়ুধস্তোত্র*, *দুর্গোৎসববিবেক*, *কর্মোপদেশিনী* ও *ক্রিয়ানিঘণ্টু*- এই সব গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব উপস্থাপন করা ছাড়াও নানা মতামত সমীক্ষার মাধ্যমে তাদের গ্রন্থকর্তৃত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

গবেষণাকর্মের তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধ রচিত নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের বিশেষ অধ্যয়ন**। এই অধ্যায়ে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, *মীমাংসাসর্বস্ব* ও *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*- তিনটি গ্রন্থের বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হবে। এখানে প্রথমে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়ে বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হবে। সেখানে বেদভাষ্যকার হলায়ুধ ও বেদভাষ্যরূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* স্বরূপগত আলোচনা, সর্বস্ব শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়বস্তু, পুরাণ-স্মৃতি-নিবন্ধের আকররূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, সংস্কারতত্ত্ব, হলায়ুধ ও গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যাপদ্ধতির তুলনামূলক অলোচনা, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* গৃহ্যসূত্রের প্রভাব, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* গুণবিষ্ণুর *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের* প্রভাব, *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* স্বরূপ, হলায়ুধের মতে বেদ অধ্যয়নের শর্তাবলি, বেদ অধ্যয়নের রীতি, *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ভাষ্যের রচনাশৈলী, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলির আলোচনা করা হবে।

*ব্রাহ্মণসর্বস্বের* আলোচনার পর এই অধ্যায়ে *মীমাংসাসর্বস্ব* বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন করা হবে। এখানে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ হল– *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়বস্তু, *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশেষ অধ্যয়ন এবং এই গ্রন্থের রচনাশৈলী পর্যালোচনা ইত্যাদি।

*মীমাংসাসর্বস্বের* আলোচনার পরেই এই অধ্যায়ে *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* বিষয়ে বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা করা হবে। এখানে যে সমস্ত বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হবে সেগুলি হল- বেদাঙ্গরূপে ছন্দঃশাস্ত্রের গুরুত্ব, ছন্দঃশাস্ত্রকার পিঙ্গল ও বৃত্তিকার হলায়ুধ, *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের* আলোচনা, *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* উপযোগিতা, *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তির* রচনাশৈলী ইত্যাদি।

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় হল **লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন**। সংস্কৃত সাহিত্য জগতের নানা শাখা-প্রশাখায় লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ আচার্য হলায়ুধের অবদান, তাঁর রচনায় পূর্বাচার্যদের প্রভাব এবং পরবর্তী সাহিত্যে তাঁর রচনার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলির বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ে করা হবে। পরিশেষে উপসংহারে প্রতি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার ও বর্তমান গবেষণার নূতন দিগ্‌দর্শন ও পরবর্তী গবেষণার সম্ভাব্য দিশা উপস্থাপনের মাধ্যমে গবেষণা-সন্দর্ভের পরিসমাপ্তি সূচিত হবে।

**সাহিত্য-পর্যালোচনা (Literature Review) :**

*ব্রাহ্মণসর্বস্বের* অনেকগুলি সংস্করণ যথা- সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের প্রকাশনায় দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থ, বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ মহাশয় সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব,* তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ মহাশয় সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* এবং নীলকমল

বিদ্যানিধি সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থ যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করা হয়েছে। আচার্য হলায়ুধভট্ট প্রণীত *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থটির ওপর গবেষণা-সন্দর্ভ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বেদবিষয়ক অধ্যাপিকা ডঃ মৌ দাশগুপ্ত মহাশয়ার আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত *সেক-শুভোদয়ার* বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা গবেষণাকার্যের প্রতি অনুপ্রেরণা দান করেছে। এর ফলে গবেষণাকর্মের অগ্রগতি ঘটেছে। ছন্দ বিষয়ে লেখা কিছু গবেষণাপ্রবন্ধ পাওয়া গেছে। সীতানাথ সামাধ্যায়ী সম্পাদিত *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থটি গবেষণাকার্যের সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। অধ্যাপক তপন শঙ্কর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার থেকে প্রকাশিত *Vedāṅga*s নামে একটি প্রবন্ধ-সংকলনে ছন্দোবিষয়ক কয়েকটি গবেষণা-নিবন্ধ রয়েছে, যেমন- পার্থসারথি শীল মহাশয়ের বৈদিক ছন্দের বৈশিষ্ট্যপ্রসূত বিজ্ঞান উন্মোচন', দিলীপ পণ্ডা মহাশয়ের 'ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য...', জগদীশ রপ্তানের 'বেদাঙ্গরূপে ছন্দের মহিমা অপার'- এইসব গবেষণা নিবন্ধগুলি ছন্দঃশাস্ত্রের সমীক্ষাত্মক আলোচনার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছন্দঃশাস্ত্রের এইসব গবেষণাধর্মী আলোচনা নির্মীয়মাণ গবেষণা-সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের একটি উপবিভাগ- *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* নামক অংশের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নে পাথেয় হয়েছে। বিহার ও ওড়িশার মুখপত্রে প্রকাশিত *মীমাংসাসর্বস্ব* (প্রথম তিনটি অধ্যায়) গ্রন্থটি গবেষণা-সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় সহায়ক হয়েছে। Archaeological Survey of India থেকে প্রকাশিত *Epigraphia Indica, Vol. XXV* গ্রন্থের 'Halayudhastotra from the Amaresvara temple' প্রবন্ধ থেকে হলায়ুধের ব্যক্তিপরিচিতির সংশয়গত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। International Journal for Research in Engineering Application &

Management (IJREAM, Vol. 05) পত্রিকাটিতে ডঃ সূপম মুখার্জীর '*Sanskrit Literature under The Patronage of The Sena Rulers in Bengal*' প্রবন্ধে আচার্য হলায়ুধ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যা গবেষণাকার্যের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছে। এইসব পূর্বকৃত গ্রন্থরাজি ও নিবন্ধ গবেষণা-সন্দর্ভের কার্যকে নতুন মাত্রা দান করেছে।

## গবেষণার অবকাশ (Research Gap) :

সংস্কৃত সাহিত্যের জগতে আচার্য হলায়ুধের রচনাবলির সামগ্রিক মূল্যায়নকে অবলম্বন করে ইতিপূর্বে সমীক্ষাত্মক আলোচনা বিশেষ কিছু হয়নি। তবে পৃথক পৃথক ভাবে হলায়ুধের কয়েকটি গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* একটি মূল্যবান সংস্করণ। *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থটির ওপর গবেষণা-সন্দর্ভ ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ববর্তী এইসব গবেষণামূলক কার্যের মধ্যে আচার্য হলায়ুধের ব্যক্তি পরিচিতি নিয়ে যে সংশয় জাগে তার কোনওরকম নিরসন করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়াও পূর্ববর্তী গবেষণা-সন্দর্ভগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যজগতে তাঁর কৃতি-বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় না। তাই আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে আচার্য হলায়ুধের ব্যক্তি পরিচিতির সংশয় দূরীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং আচার্য হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে।

## গবেষণা-কার্যের গুরুত্ব (Importance) :

**'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা'** নামক নির্মীয়মাণ গবেষণা-সন্দর্ভটিতে হলায়ুধ নামে একাধিক আচার্যের ব্যক্তিগত পরিচিতির

সমস্যা ও তার নিরসনের চেষ্টা করা হবে। গবেষণা-সন্দর্ভটিতে হলায়ুধ নামে ভিন্ন ভিন্ন যে সমস্ত আচার্য রয়েছেন তাঁদের পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কৃতিসমূহেরও পরিচয় দেওয়া হবে। গবেষণা-সন্দর্ভে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের রচয়িতা, যিনি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী রূপে পরিচিত সেই হলায়ুধভট্টের বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হবে। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টের রচনাসমূহের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নও আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভটির অন্যতম গুরুত্ব। হলায়ুধের নামে রচিত অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টেরই রচনা কি না– তারও সংশয় নিরসনের চেষ্টা করা হবে আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে। এই বঙ্গদেশীয় হলায়ুধ রচিত গ্রন্থগুলির বিশেষ অধ্যয়নের সময় নানা আঙ্গিকে গ্রন্থগুলির বিচার করা হবে, যা আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী সময়ে যাঁরা আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত অন্যান্য রচনাগুলি বিষয়ে গবেষণা করবেন তাঁদের নিকট আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভটি বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমরা আশাবাদী।

## গবেষণা-পদ্ধতি (Research Methodology) :

**'সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি: একটি সমীক্ষা'** শিরোনামে নির্মীয়মাণ গবেষণা-সন্দর্ভটি প্রস্তুত করার জন্যে পূর্বপ্রকাশিত নানাবিধ মুদ্রিত গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা একটি অনিবার্য বিষয়। সুতরাং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি ব্যবহারের জন্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য গ্রহণ করা হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গ্রন্থাগার- এই সমস্ত গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহালয়- তাই এই সমস্ত বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার

ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণ করা হবে। যে সমস্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকা সত্ত্বেও জীর্ণতার কারণে ব্যবহারের অনুপযুক্ত, অন্তর্জাল ব্যবহারের মাধ্যমে সেই গ্রন্থগুলির অনুসন্ধান করা হবে। অনুসন্ধানবিধি বিষয়ক গ্রন্থ অবলম্বনে গবেষণাপ্রকল্পটি রূপায়িত করার চেষ্টা করা হবে।

গবেষণা-সন্দর্ভটি বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপিতে প্রস্তুত করা হবে। এজন্যে সমকালীন চলিত বাংলা ভাষার বাগ্‌বিধি ও বানানবিধি অবলম্বন করা হবে। গবেষণাসন্দর্ভটি মুদ্রণের জন্যে মূল অংশে 'কালপুরুষ' font-এর ১৪ মাত্রাকৃতি ব্যবহার করা হবে। যেখানে ইংরেজী শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন হবে সেখানে 'Times New Roman'-এর ১৪ মাত্রাকৃতি ব্যবহার করা হবে। গবেষণা-সন্দর্ভে দুই পঙ্‌ক্তির মাঝখানে ১.৫ শূন্যস্থান রাখা হবে। সংস্কৃত শ্লোকগুলির উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা লিপিই ব্যবহার করা হবে। গবেষণা-সন্দর্ভটিতে সর্বত্রই সংস্কৃত উদ্ধৃতিতে 'ৎ' এর পরিবর্তে 'ত্' এর ব্যবহার করা হবে। তবে বাংলা বাক্যে 'ৎ'-ই ব্যবহার করা হবে। সমগ্র গবেষণা-সন্দর্ভটিতে উল্লেখপঞ্জি হিসেবে প্রতি পৃষ্ঠায় পাদটীকা ব্যবহার করা হবে। পাদটীকার ক্ষেত্রে বাংলা অক্ষরে ১২ এবং ইংরেজির ক্ষেত্রেও ১২ মাত্রাকৃতি ব্যবহৃত হবে। এছাড়া প্রতি পৃষ্ঠার ওপরে, নীচে এবং ডান পাশে ২.৫৪ সেন্টিমিটার শূন্যস্থান রাখা হবে। তবে বামপাশে বাঁধাই এর সুবিধার জন্য ৩.০০ সেন্টিমিটার জায়গা রাখা হবে। পাদটীকায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় গ্রন্থনাম সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হবে। পাঠের সাবলীলতা রক্ষার জন্যে সেই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থনামের বোধসৌকর্যার্থে পূর্ণনামের একটি সূচী প্রদান করা হবে। উপসংহারের পরে কয়েকটি নির্ঘণ্ট সন্নিবেশিত হবে। আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের শেষে গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী MLA (Eight Edition) ফরম্যাট-এ গ্রন্থপঞ্জি সংযোজিত করা হবে।

# সংকেতসূচি

| | |
|---|---|
| অষ্টা. = | অষ্টাধ্যায়ী |
| অথর্ব. = | অথর্ববেদ |
| অভি. = | অভিধানরত্নমালা |
| অভিজ্ঞান. = | অভিজ্ঞানশকুন্তল |
| অর্থ. = | অর্থসংগ্রহ |
| আ. য. সূ. = | আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্র |
| উ. ম. = | উবট মন্ত্রভাষ্য |
| ঐ. আ. = | ঐতরেয়ারণ্যক |
| ঐ. ব্রা. = | ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ |
| ঋ. প্রা. = | ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য |
| ঋগ্বেদ. = | ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা |
| ঋ. স. = | ঋগ্বেদ-সংহিতা |
| কাম. = | কামসূত্র |
| কাব্য. = | কাব্যপ্রকাশ |
| কাব্যা. = | কাব্যাদর্শ |
| কা. সূ. = | কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি |
| কাব্য. মী. = | কাব্যমীমাংসা |
| কবি. = | কবিরহস্য |

কূর্ম. = কূর্মপুরাণ

কৃত্য. = কৃত্যরত্নাকর

গীত. = গীতগোবিন্দ

গৃহস্থ্য. = গৃহস্থ্যরত্নাকর

চতুর্বর্গ. = চতুর্বর্গচিন্তামণি

ছন্দঃ. = ছন্দঃশাস্ত্র

ছা. ম. ভা. = ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য

ছা. ব্রা. = ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ

ছা. উ. = ছান্দোগ্যোপনিষদ

তত্ত্ব. = তত্ত্বপ্রদীপিকা

তৈ. উ. = তৈত্তিরীয় উপনিষদ

তৈ. স. = তৈত্তিরীয় সংহিতা

দে. ভা. = দেবী ভাগবত

ধাতু. = ধাতুপাঠ

নাট্য. = নাট্যশাস্ত্র

নি. = নিরুক্ত

পঞ্চ. = পঞ্চতন্ত্র

পরি. প্র. = পরিশিষ্টপ্রকাশ

পরিভাষা. = পরিভাষাপ্রকাশ

প্রবোধ. = প্রবোধচন্দ্রোদয়

পা. গৃ. = পারস্করগৃহ্যসূত্র

পা. শি. = পাণিনীয়শিক্ষা

প্রা. পৈ. = প্রাকৃতপৈঙ্গল

প্রা. ভা. কা ই. ত. স. = প্রাচীন ভারত কা ইতিহাস

পি. ছ. সূ. = পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র

বা. সং. = বাজসনেয়ি-সংহিতা

বামন. = বামনপুরাণ

বিবাদ. = বিবাদরত্নাকর

বে. ত. স. = বেদান্ততত্ত্বসমীক্ষা

বেদান্ত. = বেদান্তসূত্র

বৈ. সূ. = বৈতানসূত্র

ব্রা. স. = ব্রাহ্মণসর্বস্ব

ব্যাস. = ব্যাসসংহিতা

বৃহদ. = বৃহদ্দেবতা

ভা. সং. কো. = ভারতীয় সংস্কৃতিকোষ

মৎস্য. = মৎস্যপুরাণ

মনু. = মনুসংহিতা

মহাভা. = মহাভারত

মহা. = মহাভাষ্য

মেদিনী. = মেদিনীকোষ

মী. স. = মীমাংসাসর্বস্ব

মী. সূ. = মীমাংসাসূত্র

মী. ভা. = মীমাংসাভাষ্য

মী. স. = মীমাংসাসর্বস্ব

মুণ্ডক. = মুণ্ডকোপনিষদ

যাজ্ঞ. = যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

শ. ব্রা. = শতপথব্রাহ্মণ

শ্রাদ্ধ., = শ্রাদ্ধকৌমুদী

শ্রুত. = শ্রুতবোধ

শ্লোক. = শ্লোকবার্ত্তিক

সর্বা. = সর্বানুক্রমণী

স. স. র. = সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন

স. সা. বা. দা. = সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান

সা. দ. = সাহিত্যদর্পণ

সাংখ্য. = সাংখ্যকারিকা

সাম. ব্রা. = সামবিধানব্রাহ্মণ

সা. ব্রা. = সাংখ্যায়নব্রাহ্মণ

সিদ্ধান্ত. = সিদ্ধান্তকৌমুদী

সে. শু. = সেক-শুভোদয়া

স্কন্দ. = স্কন্দপুরাণ

হ. স্তো. = হলায়ুধ-স্তোত্র

হ. বৃ. = হলায়ুধ বৃত্তি

A. I. = Ancient India.

D. C. M. M. = Descriptive Catelogue of Manuscripts in Mithila.

E. I. = Epigraphia Indica.

H. D. = History of Dharmasastra.

H. S. L. = History of Sanskrit literature.

I. W. = Indian Wisdom

Kavi. = Kavirahasya

R. A. T. T. = Rashtrakutas and Their Times.

Seka. = Sekaśubhodayā

প্রথম অধ্যায়

# সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের পরিচয়

## ১.১. আচার্য হলায়ুধ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত :

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায় একাধিক রাজবংশ বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। কালক্রমে সেই সব রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের পতনও হয়েছিল। সেই রাজারা তাঁদের রাজত্বকালে সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের রাজসভায় জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটত। এরকমই একটি রাজবংশ ছিল দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশ, যাঁরা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতক পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে তাঁদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।[১] খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের শেষার্ধে রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম কৃষ্ণের রাজসভায় হলায়ুধ নামক একজন সভাকবি ছিলেন বলে কোনও গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট-বংশীয় রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের রাজসভার অন্যতম সভাকবি ছিলেন বলে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মতামত প্রকাশ করেছেন।[৩] এছাড়া আরও নানাবিধ তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হলায়ুধ ছিলেন রাষ্ট্রকূট-বংশের রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের রাজসভাকবি। তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর রচিত *কবিরহস্য* গ্রন্থ থেকে তাঁকে দক্ষিণ ভারতীয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

---

[১] প্রা. ভা. কা ই. ত. স., পৃ. ৬৯৪

[২] ভা. সং. কো., খণ্ড-১০, পৃ. ২৯৯

[৩] R. T. T., A. S. Altekar, p. 408.

হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট রাজবংশের রাজা প্রথম কৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন।[৪] সুতরাং তাঁর স্থিতিকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ বলে মনে করা হয়। আচার্য হলায়ুধভট্ট একটি অভিধান গ্রন্থও রচনা করেছেন, যাঁর নাম *অভিধানরত্নমালা।* তবে এই গ্রন্থটি *হলায়ুধকোষ* নামেই অধিক পরিচিত। এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে অমরসিংহ প্রণীত *অমরকোষের* উপর ভিত্তি করে রচিত।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী *কবিরহস্য* গ্রন্থটির সূত্র ধরে আচার্য হলায়ুধকে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর এটা প্রাসঙ্গিক বলেও মনে হয় কারণ এই গ্রন্থে রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের এবং রাষ্ট্রকূট রাজবংশের উল্লেখও রয়েছে। *কবিরহস্য* গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট রাজবংশের রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের নানাভাবে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু অন্য একটি দৃষ্টিকোণ আচার্য হলায়ুধকে একাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী এবং ধর্মাধ্যক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে। সুতরাং বলা যেতে পারে সংস্কৃত সাহিত্যজগতে অন্তত দুজন হলায়ুধ রয়েছেন এবং দুজনেই তাঁদের কৃতিসমূহের দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে রয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, *কবিরহস্য* গ্রন্থে কোন রাজা কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে? এর সমাধানের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে দেখা যায় রাষ্ট্রকূট রাজবংশের তিনজন রাজার নাম ছিল কৃষ্ণ। তাঁরা হলেন যথাক্রমে প্রথম কৃষ্ণ, দ্বিতীয় কৃষ্ণ ও তৃতীয় কৃষ্ণ। তবে হলায়ুধ কোন রাজা কৃষ্ণের উল্লেখ তাঁর *কবিরহস্য* গ্রন্থে করেছেন তার স্পষ্টতা পাওয়া যায়নি। যদি পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁকে প্রথম কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে আচার্য হলায়ুধের কাল দাঁড়ায় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক। কিন্তু অনেক পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক আচার্য হলায়ুধকে তৃতীয় কৃষ্ণের সঙ্গে

[৪] R. T. T., A. S. Altekar, p. 408.

সম্পর্কিত দশম শতকের উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক অনন্ত সদাশিব আলটেকর তাঁর *The Rashtrakutas and There Times* গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধকে তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবিরূপে উল্লেখ করেছেন।[৫] উল্লেখ্য ঐতিহাসিক অনন্ত সদাশিব আলটেকর তাঁর সমগ্র জীবন রাষ্ট্রকূট রাজবংশকে নিয়ে গবেষণা করে উৎসর্গ করেছেন। এছাড়া আরও অনেক ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত আচার্য হলায়ুধকে তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি রূপে উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আচার্য হলায়ুধভট্টকে প্রথম কৃষ্ণের তুলনায় তৃতীয় কৃষ্ণের যোগকে বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে হলায়ুধের বসবাস ছিল এমন মত এবং তার সপক্ষে যুক্তিও পাওয়া যায়। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর সম্পাদিত *কবিরহস্য* গ্রন্থে কবি হলায়ুধের বংশ ও ঐতিহ্য বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী গৌড়প্রদেশে আদিশূর নামে এক মহান রাজা ছিলেন। তিনি একটি মহান যজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন। এই যজ্ঞের জন্য তিনি কান্যকুব্জ (বর্তমানে কনৌজ) থেকে বেদে পারদর্শী পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আমন্ত্রণ জানান। তিনি চেয়েছিলেন তাঁরা পুরোহিত হিসাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করুন। এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ ছিলেন– ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভা, ছন্দরা এবং শ্রীহর্ষ। এঁদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ ছিলেন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ। তিনি শাণ্ডিল্য পরিবারের অন্তর্গত এবং তাঁর থেকেই বঙ্গদেশের ঠাকুরদের বংশধর। এই যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের সাফল্যের পর আদিশূর গৌড়প্রদেশে বসতি স্থাপনের জন্য ভট্টনারায়ণকে পাঁচটি গ্রাম প্রদান করেন। সেখানে থাকাকালীন ভট্টনারায়ণ তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এগুলি হল ১. *প্রয়োগরত্ন* ২. *গোভিলসূত্রভাষ্য* ৩.

[৫] R. T. T., A. S. Altekar, p. 408.

*কাশীমরণমুক্তিবিচার*।[৬] কিন্তু তাঁর বিখ্যাত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল *বেণীসংহার*, যা সংস্কৃত ভাষায় রচিত অন্যতম রূপক। *বেণীসংহার* ছয় অঙ্কবিশিষ্ট একটি নাটক। ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের হত্যা ও তাঁর রক্তে দ্রৌপদীর চুল ধুয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এবং দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ – এই নাটকের বিষয়বস্তু।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর দেখিয়েছেন আচার্য হলায়ুধ ছিলেন ভট্টনারায়ণের বংশের ষোড়শ বংশধর।[৭] আচার্য হলায়ুধ রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হল – ১. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ২. *মীমাংসাসর্বস্ব* ৩. *পণ্ডিতসর্বস্ব* ৪. *শিবসর্বস্ব* ৫. *বৈষ্ণবসর্বস্ব* ৬. *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* ৭. *কর্মোপদেশিনী* ৮. *দুর্গোত্সববিবেক* ৯. *মত্স্যসূক্ততন্ত্র* ১০. *দ্বিজনয়ন* ১১. *সেক-শুভোদয়া* ১২. *কবিরহস্য* ১৩. *অভিধানরত্নমালা* ১৪. *হলায়ুধস্তোত্র* ১৫. *ক্রিয়ানিঘণ্টু* ইত্যাদি।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতে আচার্য হলায়ুধভট্ট বঙ্গদেশের কবি। আবার তিনি পূর্বে প্রদত্ত নানা গ্রন্থসমেত *কবিরহস্য* গ্রন্থেরও রচয়িতা। কিন্তু এই মতবাদটির যাথার্থ্য বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। বরং *কবিরহস্য* গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি হলায়ুধের সম্বন্ধ অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর আরও বলেছেন যে, হলায়ুধ ছিলেন বঙ্গদেশের সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রধানমন্ত্রী। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজসভার প্রধানমন্ত্রী

---

[৬] কবি., প্রাক্কথন অংশ, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

[৭] তদেব

পদে নিযুক্ত ছিলেন আচার্য হলায়ুধভট্ট।[৮] লক্ষ্মণসেন ছিলেন বাংলার সেনবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। ১১৫৯ থেকে ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল বল্লালসেনের রাজত্বকাল।[৯] তাঁর পিতা বিজয়সেনের স্থিতিকাল ছিল ১০৯৫ থেকে ১১৫৯ খ্রীস্টাব্দ[১০] আর লক্ষ্মণসেনের স্থিতিকাল ছিল ১১৭৯ থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।[১১] সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আচার্য হলায়ুধভট্ট ছিলেন অন্যতম। কবি জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, শ্রীধরদাস, হলায়ুধ, উমাপতিধর প্রমুখ পণ্ডিতগণ লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। উজ্জ্বলদত্ত, মল্লিনাথ ও মেদিনীকার[১২] দ্বারা প্রায়শই তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁরা হলায়ুধের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ধরণীধর এবং বনমালী আচার্য হলায়ুধের পূর্বপুরুষ ছিলেন বলে জানা যায়।[১৩] ধরণীধর *ব্যাকরণসর্বস্ব* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবার তিনি *মনুভাষ্য*ও রচনা করেছেন।[১৪] বনমালীর ভাই *ভক্তিরত্নাকর* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং *দ্রব্যসিদ্ধিপ্রকরণরহস্য*[১৫] নামে অপর একটি গ্রন্থও তাঁর দ্বারা রচিত। ধরণীধরের প্রপৌত্র *নিঘণ্টু* নামে বৈদিক কোষগ্রন্থের ওপরও একটি টীকা রচনা করেন। তিনি ছিলেন বল্লালসেনের রাজসভার বিচারক।[১৬]

---

[৮] কবি., প্রাক্কথন অংশ, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

[৯] বাঙলার ইতিহাস, প্রভাসচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃ. ১৮২

[১০] তদেব., পৃ. ১৮৭

[১১] তদেব., পৃ. ১৯৩

[১২] কবি., Preface, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

[১৩] তদেব

[১৪] তদেব

[১৫] তদেব

[১৬] তদেব

পশুপতি ও ঈশান নামে হলায়ুধের দুই ভাই ছিল। তাঁরাও সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। পশুপতি যজুর্বেদের আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঈশান আইন বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[১৭] আচার্য পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও এই বংশেরই একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে করা হয়।[১৮] তিনি *রসগঙ্গাধর, ভামিনীবিলাস, রেখাগণিত* এবং আরও অন্যান্য কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা তাঁকে খ্যাতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ছিলেন পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের পুত্র। তিনিও *প্রযোগরত্নমালা, যুক্তিচিন্তামণি, বিষ্ণুভক্তিকল্পলতা, ভাষাবৃত্তি, একাক্ষরকোষ, হারলতা, হারাবলী, গোত্রপ্রবরদর্পণ* এবং আরও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পুরুষোত্তমের পুত্র ছিলেন বলরাম। তিনি *প্রবোধপ্রকাশ* নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[১৯] সুতরাং দেখা যাচ্ছে আচার্য হলায়ুধভট্ট যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তায় সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতে তাঁরা এই স্বনামধন্য বংশের বংশধর। তাঁর পিতা হরিকুমার ঠাকুরও সংস্কৃতের একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি *দক্ষিণার্চনপারিজাত* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এছাড়াও *হরতত্ত্বদীধিতি* ও *পুরুষচরণপদ্ধতি* গ্রন্থদুটিও তাঁর রচনা। তাঁর খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরও এই বংশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি *বিবাদচিন্তামণি* নামে একটি গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর ভাই মেঘরাজ ছিলেন মিথিলা বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ আইনবিষয়ক আধিকারিক। তাঁর

---

[১৭] কবি., প্রাক্কথন অংশ, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

[১৮] তদেব., পৃ. ৩

[১৯] তদেব., Preface, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

প্রচেষ্টাতেই সংস্কৃত ভাষা নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়েছিল। তিনি শিক্ষার মহান পৃষ্ঠপোষকরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।[২০]

তর্কতীর্থ মহাদেব শাস্ত্রী যোশী সম্পাদিত *ভারতীয় সংস্কৃতি কোষ* গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে কোনও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। একই ধরণের নামের কারণে হলায়ুধ সম্পর্কে তিনটি মত প্রচলিত রয়েছে।[২১] দ্বিতীয় মত অনুযায়ী আচার্য হলায়ুধভট্ট একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কালের মধ্যে ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান একজন ব্যাখ্যাকার ছিলেন। আচার্য হলায়ুধ বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ছিলেন বৎস্যমুনির বংশধর, ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের পুত্র ও রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। এছাড়াও তিনি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রিসভার বিচারক। পরে তিনি শ্বেতচ্ছত্রধারী উপাধিতে ভূষিত হন।[২২] পশুপতি ও ঈশান ছিলেন তাঁর দুই বড় ভাই ছিলেন। পশুপতি *শ্রাদ্ধকৃত্যপদ্ধতি* ও *পাকযজ্ঞপদ্ধতি* নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অপর ভাই ঈশান *দ্বিজাহ্নিকপদ্ধতি* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

আচার্য হলায়ুধের উপাধি ছিল আবসথিক, মহাধর্মাধ্যক্ষ এবং ধর্মাধিকারী। বঙ্গদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের লেখকেরা আচার্য হলায়ুধের আধিপত্য স্বীকার

---

[২০] কবি., প্রাক্কথন অংশ, শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

[২১] ভা. সং. কো., মহাদেব শাস্ত্রী জোশী সম্পাদিত, খণ্ড ১০ পৃ. ২৯৯-৩০০

[২২] তদেব

করেছেন। তিনি ছিলেন মহান কর্তৃত্ব ও সম্মানের অধিকারী। এ থেকে এটাও অনুমান করা যায় যে, তিনি হয়তো বাংলা অথবা মিথিলার বাসিন্দা ছিলেন।[২৩]

হলায়ুধ *শুক্লযজুর্বেদের* কাণ্বসংহিতার ওপর একটি ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর রচিত বেদভাষ্যের নাম হল *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*।[২৪] এই ভাষ্যগ্রন্থে তিনি একজন ব্রাহ্মণের নিয়মিত কর্মবিষয়ক প্রাতঃকাল থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানোর সময় পর্যন্ত সমস্ত স্তোত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যে স্তোত্র উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তার উদ্ধৃতি অর্থসহকারে উপস্থাপন করেছেন। তিনি *মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব* বা *শিবসর্বস্ব* এবং *পণ্ডিতসর্বস্ব* নামেও কয়েকটি সর্বস্ব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু আজ এইসব গ্রন্থের কোনও পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলা যায় যে, আচার্য হলায়ুধ কেবল বেদ এবং মীমাংসাশাস্ত্রেরই একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন।[২৫]

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উল্লিখিত দুটি তত্ত্ব সংস্কৃত কোষকাব্যের জগতে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রদান করে। আচার্য হলায়ুধকে বর্ণনা করার জন্য তাঁদের সংস্করণগুলিতে কয়েকটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়– প্রথমে হলায়ুধকে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্বেত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাঁকে বাৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম মতানুযায়ী তিনি *হলায়ুধকোষ* বা *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থটি রচনা করেছেন এবং অমরেশ্বর মন্দিরের *হলায়ুধ-স্তোত্র* সহ *কবিরহস্য* গ্রন্থ তিনিই রচনা

---

[২৩] ভা. সং. কো., মহাদেব শাস্ত্রী জোশী সম্পাদিত, খণ্ড ১০ পৃ. ২৯৯-৩০০

[২৪] তদেব

[২৫] তদেব

করেন। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তিনি  মীমাংসা, বেদ এবং ধর্মশাস্ত্রের একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব* এবং *বৈষ্ণবসর্বস্ব* গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেছেন| পূর্বের মতানুযায়ী *বৈষ্ণবসর্বস্ব* হলায়ুধ কর্তৃক রচিত নয় এবং সেখানে তাঁর পিতার নামের কোনও উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া পূর্বমতাবলম্বিরা ভট্টনারায়ণ থেকে শুরু করে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্যন্ত হলায়ুধের মহান বংশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

আবার কোথাও একই ধরনের প্রসঙ্গও দেখা যায়। উভয় মতানুযায়ী তিনি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতাদের নামের উল্লেখ রয়েছে একই রকম। তবে তাঁদের কৃতিসমূহের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। উভয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তিনি বাংলার অধিবাসী ছিলেন। যদিও পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁকে মৈথিল ব্রাহ্মণ বলেই বেশি জোর দেওয়া হয়। পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গিতে *অভিধানরত্নমালা* ও *কবিরহস্যের* নাম উল্লিখিত হয়নি, কিন্তু পূর্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে তা লক্ষ্য করা যায়। অধিকন্তু পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি এই মীমাংসা এবং ধর্মশাস্ত্রবিষয়ে পণ্ডিত হলায়ুধকে অভিধানকার হলায়ুধ থেকে পৃথক করে। আচার্য হলায়ুধ *অভিধানরত্নমালা* নামে একটি কোষগ্রন্থ এবং *কবিরহস্য* নামে একটি ধাতুকোষ রচনা করেন। এইসব গ্রন্থের এই দুজন ভিন্ন হলায়ুধকে তাঁর নামের সঙ্গে মিল দেখেই নানা তথ্য উপলব্ধ হয়েছে। পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গি অনুয়াযী আচার্য হলায়ুধের স্থিতিকাল অষ্টম-দশম শতাব্দী। তিনি রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন। আর এই সময় তিনি *কবিরহস্য* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে তিনি রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের প্রশংসা করেছেন।

এছাড়া আরও একটি মত প্রচলিত আছে যে আচার্য হলায়ুধ বিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে বর্তমান ছিলেন। এই মত অনুযায়ী তিনি ছিলেন সংকর্ষণের পুত্র। তিনি *শ্রাদ্ধকল্পসূত্রের* উপরে একটি ভাষ্য রচনা করেছেন– *শ্রাদ্ধকল্পসূত্র কাত্যায়ন।* এই গ্রন্থে তিনি কর্ক, কামধেনু, কল্পতরু, গোবিন্দরাজ প্রমুখ লেখক এবং তাঁদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।[২৬]

## ১.২. দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজবংশ ও আচার্য হলায়ুধ :

হলায়ুধের *কবিরহস্যে* রাষ্ট্রকূট রাজবংশের রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁকে কেন্দ্র করেই *কবিরহস্য* গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। হলায়ুধ তাঁর *কবিরহস্য* গ্রন্থে রাষ্ট্রকূট রাজাদের বর্ণনার পাশাপাশি এই রাজবংশের দক্ষিণাপথে ইত্যাদি কয়েকটি স্থানেরও নামোল্লেখ করেছেন।[২৭]

রাষ্ট্রকূট ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনকারী অন্যতম রাজবংশ ছিল। এই রাজবংশ ভারতবর্ষের বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণে রাজত্ব করত। এই রাষ্ট্রকূট রাজবংশ ভারতীয় উপমহাদেশের বেশ কিছু অংশ জুড়ে খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। এই রাজবংশের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের জন্য রাজবংশের শাসকদের খোদাই করা শিলালিপি এবং রাজবংশের দানপত্রগুলিই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। এই রাজবংশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপি হল–

১. ইলোরা এবং দন্তিদুর্গের তামার পাত।

---

[২৬] ভা. সং. কো., মহাদেব শাস্ত্রী জোশী সম্পাদিত, খণ্ড ১০ পৃ. ২৯৯-৩০০

[২৭] কবি., শ্লোক. ৫

২. প্রথম অমোঘবর্ষের সঞ্জন শিলালিপি।

৩. তৃতীয়কৃষ্ণের কোলহাপুর শিলালিপি।

৪. তৃতীয় গোবিন্দের রাধনপুর, বাণী, ডিন্ডোরি এবং বরোদা শিলালিপি।

৫. তৃতীয় ইন্দ্রের কামলাপুর শিলালিপি।

৬. চতুর্থ গোবিন্দের কাম্বে এবং সাংলি শিলালিপি।

এইসব শিলালিপিগুলিই ঐতিহাসিকদের নিকট রাষ্ট্রকূট রাজবংশের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে।

## ১.২.১. রাষ্ট্রকূট রাজবংশের উৎপত্তি :

রাষ্ট্রকূটরা বাদামি বা বাতাপির চালুক্যদের পরাজিত করে শাসনব্যবস্থায় আসীন হন। রাষ্ট্রকূট বংশের উৎপত্তির পশ্চাতে নানাবিধ কারণ রয়েছে। কিছু শিলালিপি অনুয়ায়ী তাঁরা রট্টবংশীয়।[২৮] ওয়ার্ধা তাম্রশাসনানুয়ায়ী রাষ্ট্রকূটরা রট্টা রাজকুমারীর সঙ্গে সম্পর্কিত।[২৯] রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের দেবলি এবং করহাদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, রাষ্ট্রকূটদের পূর্বপুরুষ ছিলেন তুঙ্গা এবং তাঁদের প্রথম রাজা ছিলেন রট্ট।[৩০] আর. জি. ভাণ্ডারকর যথার্থই বলেছেন যে তুঙ্গারাই ছিলেন রাষ্ট্রকূটদের আদিপুরুষ বা পূর্বপুরুষ। তুঙ্গার পুত্র ছিলেন কোট্টা। তাই তাঁর বংশকে রাষ্ট্রকূট বলা হয়ে থাকে।[৩১] তবে ইতিহাসে এই দুই শাসক সম্পর্কে কোনওরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সি. ভি.

---

[২৮] প্রা. ভা. কা ই. ত. সং., কৃষ্ণ চন্দ্র শ্রীবাস্তব সম্পাদিত, পৃ. ৬৮৪.

[২৯] তদেব

[৩০] তদেব

[৩১] তদেব

বৈদ্য রাষ্ট্রকূটদের মারাঠাদের পূর্বপুরুষ হিসেবে দেখিয়েছেন, যাঁদের মাতৃভাষা ছিল মারাঠি। কিন্তু এ. এস. আলটেকরের মতে তাঁদের ভাষা ছিল কন্নড়, মারাঠি নয়।[৩২] আলটেকর, নীলকান্ত শাস্ত্রী প্রমুখের মতে রাষ্ট্রকূট শব্দটি একটি স্থান বা উপাধিকে বোঝাত, কোনও গোষ্ঠী বা রাজবংশকে নয়। তবে সাধারণভাবে এই রাষ্ট্রকূট শব্দটির দ্বারা রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তাকেই বোঝানো হত।[৩৩]

## ১.২.২. রাষ্ট্রকূট শাসনব্যবস্থা :

দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাষ্ট্রকূট বংশের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রকূটরা কেবল রাজ্যবিস্তারেই মনোনিবেশ করেননি, একইসঙ্গে তাঁরা একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থারও প্রবর্তন করেছিলেন। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্থানে ছিলেন রাজা। তিনিই সমস্ত ক্ষমতার উৎস হিসাবে গণ্য হতেন। তিনি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করতেন। রাজসিংহাসনে আরোহণের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক রীতি মেনে সাধারণত জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই সিংহাসনে বসানো হত। কখনও কখনও কনিষ্ঠ পুত্রকেও উত্তরাধিকার মনোনীত করা হত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তৃতীয় গোবিন্দকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। যুবরাজ রাজাকে শাসনকার্যে সহযোগিতা করতেন। শাসনকার্যের দায়িত্বে থাকতেন মন্ত্রীরা। রাজ্যের অভিজাত ও ক্ষমতাশালী লোকেদের থেকেই মন্ত্রী নিয়োগ করা হত। প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রীর নাম থাকলেও তাঁরা নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন কিনা তা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে সামন্তরাজারাই শাসনের দায়-দায়িত্ব বহন করতেন। রাজার প্রত্যক্ষশাসিত অঞ্চলকে

---

[৩২] প্রা. ভা. কা ই. ত. সং., কৃষ্ণ চন্দ্র শ্রীবাস্তব সম্পাদিত, পৃ. ৬৮৪

[৩৩] তদেব

রাষ্ট্র বা বিষয়ে ভাগ করা হত। বিষয়গুলিকে ভুক্তিতে ভাগ করা হত এবং প্রায় ৫০-৬০টি গ্রাম নিয়ে এক একটি ভুক্তি গঠিত হত। ভূমিরাজস্বই ছিল এই রাজবংশের আয়ের প্রধান উৎস।

প্রাচীনকালে রাজ্যগুলি রাষ্ট্র নামে অনেক ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ছিল। একটি গ্রামের প্রধানকে যেমন গ্রামকূট বলা হত, ঠিক তেমনি একইভাবে রাষ্ট্রের প্রধানকে রাষ্ট্রকূট বলা হত। পরে এই কর্মকর্তারা একত্রিত হয়ে একটি দল গঠন করে। এর ফলে রাষ্ট্রকূট গোষ্ঠীর জন্ম হয়।[৩৪] তাঁদের মধ্যে পেশোয়া, প্রতিহার ইত্যাদির মতো কয়েকটি গোষ্ঠী ছিল। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে রথিক নামটি দেখা যায়।[৩৫] তাঁরাও রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং বলা যায়, রাষ্ট্রকূট একটি সরকারি পদের নাম।[৩৬] রাষ্ট্রকূটদের যাদববংশের সঙ্গে সম্পর্কের কথা প্রাচীনকালের শিলালিপিগুলি থেকেই জানা যায়। রাধনপুর শিলালিপিতে রাষ্ট্রকূট রাজা গোবিন্দকে যাদব বংশের রাজা কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৩৭] তাই রাষ্ট্রকূটদের ক্ষত্রিয় বলা যেতে পারে। ডঃ এ. এস. আলটেকর তাঁর *Rashtrakutas and their times* গ্রন্থে বলেছেন যে, রাষ্ট্রকূটরা মূলত কর্ণাটক থেকে কন্নড় ভাষা নিয়ে এসেছেন। লক্ষণীয় যে, প্রাক্তন নিজাম রাজ্যের বিদার জেলায় লাতুর নামে পরিচিত একটি কন্নড়

---

[৩৪] প্রা. ভা. কা ই. ত. সং., কৃষ্ণ চন্দ্র শ্রীবাস্তব সম্পাদিত, পৃ. ৬৮৪.

[৩৫] তদেব, পৃ. ৬৮৫

[৩৬] তদেব

[৩৭] তদেব

ভাষাভাষী অঞ্চল রয়েছে। তবে বেশ কিছু পণ্ডিত এই মতের বিরোধিতা করেন এবং তাঁরা রাষ্ট্রকূটদের মহারাষ্ট্রের আদিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৮]

## ১.২.৩. রাষ্ট্রকূট রাজবংশের শাসকদের পরিচয় :

রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রথম সারির কয়েকজন রাজা সফল শাসক হিসেবে তাঁদের পরিচিতি রাখতে ব্যর্থ হন। প্রথম সারির শাসকবর্গের মধ্যে ছিলেন– দন্তিবর্মণ, প্রথম ইন্দ্র, প্রথম গোবিন্দ, দ্বিতীয় ইন্দ্র প্রমুখ। ডঃ আলটেকরের মতে তাঁরা বেরারের কোথাও শাসন করেছেন।[৩৯] তবে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের বেশ কয়েকজন সফল শাসকও ছিলেন বলে জানা যায়।

## ১.২.৪. দন্তিদুর্গ :

দন্তিদুর্গ ছিলেন রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রথম সফল রাজা। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। কথিত আছে যে, তিনি মাহী, মহানদী ও রেবা নদীর তীরে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি কাঞ্চী, কলিঙ্গ, কোশল ও মালবের যুদ্ধেও জয়লাভ করেছিলেন।[৪০] তিনিই উজ্জয়িনীতে হিরণ্যগর্ভের অনুষ্ঠানও করেছিলেন।[৪১] ডঃ আলটেকর উল্লেখ করেছেন যে, দন্তিদুর্গ ছিলেন রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। চালুক্যদের সামন্ত থাকাকালীনই তিনি কিছু অংশ জয়লাভ করেছিলেন।[৪২] আরবদের পরাজিত করতে

---

[৩৮] A. I., Ed. V.D. Mahajan, p. 676

[৩৯] R. T. T., A.S. Altekar, p. 30

[৪০] A. I., Ed. V.D. Mahajan, p. 676

[৪১] Ibid.

[৪২] Ibid.

তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সঙ্গেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রায় ৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে একটি যুদ্ধ করেছিলেন, যেখানে আরবরা পরাজিত হয়েছিল এবং এর পরে তাঁরা আর কখনও গুজরাট আক্রমণ করার সাহস করেননি। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য তাঁকে পৃথিবীবল্লভ এবং খড়্গাবলোক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এমনকি তিনি পল্লব রাজবংশকে পরাজিত করতে সহযোগিতাও করেছিলেন।[৪৩] ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর দন্তিদুর্গের কর্মজীবনে প্রবেশ ঘটে। তিনি তৎকালীন চালুক্য সম্রাটের সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে যান। পরিবর্তে মালবের নন্দীপুরীর গুর্জর রাজ্য জয় করেন। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তিনি মধ্য ও দক্ষিণ গুজরাট, সমগ্র মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারের সর্বময় অধিকারী হয়ে ওঠেন। তৎকালীন চালুক্যরাজা দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ দন্তিদুর্গের বিরুদ্ধে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নেতৃত্ব দেন এবং পরাজিত হন। তিনি ৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষ নাগাদ সমগ্র মহারাষ্ট্র অধিগ্রহণ করেন এবং ৭৫০-৭৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর এবং পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ করেন। দন্তিদুর্গের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন প্রথম কৃষ্ণ।

## ১.২.৫. প্রথম কৃষ্ণ :

দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণ দন্তিদুর্গের কাছে পরাজিত হয়েও সরে দাঁড়াননি। তখন প্রথম কৃষ্ণ চালুক্য সাম্রাজ্য ত্যাগ করে কীর্তিবর্মণকে পরাজিত করেছিলেন।[৪৪] তিনি মহীশূরের গঙ্গাকে পরাজিত করেন এবং দক্ষিণ কোঙ্কন অঞ্চল জয় করেন। ফলস্বরূপ মধ্যপ্রদেশের মারাঠি ভাষাভাষী অংশটুকু প্রথম কৃষ্ণের অধীনে চলে আসে। তিনি স্থাপত্যশিল্পের

---

[৪৩] A. I., Ed. V.D. Mahajan, p. 676

[৪৪] Ibid. p. 678

একজন মহান অনুরাগী ছিলেন। তিনি ইলোরাতে ভগবান শিবের একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এটি আজও একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

## ১.২.৬. দ্বিতীয় গোবিন্দ :

প্রথম কৃষ্ণের স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ। তিনি প্রভূতবর্ষ বিক্রমাবলোক উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন।[৪৫] সিংহাসনে আসীন না থাকাকালীন তিনি ভেঙ্গির চালুক্যরাজকে পরাজিত করেছিলেন কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের পরই তিনি রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে বিলাসবহুল জীবনযাপন আরম্ভ করেছিলেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভাই ধ্রুবকে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রেখেছিলেন। ৭৭৩-৭৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধ্রুব সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৪৬] দ্বিতীয় গোবিন্দের পর ধ্রুব, তৃতীয় গোবিন্দ, প্রথম অমোঘবর্ষ, রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণ, তৃতীয় ইন্দ্র প্রমুখ রাজন্যবর্গ এই সাম্রাজ্যের শাসন কাঠামোকে অক্ষত অবস্থায় ধরে রেখেছিলেন।

## ১.২.৭. তৃতীয় কৃষ্ণ :

রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ। সিংহাসনলাভের পর তিনি চোল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এমনকি তিনি কাঞ্চী এবং তাঞ্জোর নগরও দখল করেছিলেন।[৪৭] রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে তাঁর বিশাল জয়ের জন্য তাঞ্জোরের বিজয়ী উপাধি দেওয়া হয়েছিল।[৪৮] রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ তাঁর সাম্রাজ্যকে

---

[৪৫] A. I., Ed. V.D. Mahajan, p. 676

[৪৬] R. T. T., Ed. A.S. Altekar, p. 52

[৪৭] A. I., Ed. V.D. Mahajan, p. 682

[৪৮] R. T. T., Ed. A.S. Altekar, p. 118

রামেশ্বরম্ পর্যন্ত বিস্তৃত করে গিয়েছিলেন যেখানে তিনি বিজয়স্তম্ভও নির্মাণ করেছিলেন।[৪৯] তিনি রামেশ্বরমের কাছে কৃষ্ণেশ্বর এবং গণ্ডমর্তণ্ডাদিত্যের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে খ্যাতির উজ্জ্বল পাহাড় হিসাবে তাঁর নাম আজও জ্বলজ্বল করে। তৃতীয় কৃষ্ণ বুন্দেলখণ্ড, মালব ও উজ্জয়িনী অভিমুখে অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে ভেঙ্গির সিংহাসনে বসিয়ে ভেঙ্গিকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।[৫০] কোল্লাগাল্লু থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, ৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তার পর তাঁর পুত্র খোট্টিঙ্গ রাষ্ট্রকূট বংশের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। সোমদেব তাঁর রচনা *যশস্তিলকে* উল্লেখ করেছেন যে তৃতীয় কৃষ্ণ ছিলেন একজন মহিমান্বিত রাজা, যিনি পাণ্ড্য, চোল, চের এবং সিংহলদের পরাজিত করেছিলেন। ডঃ এ. এস. আলটেকর তাঁর *Rashtrakutas and Their Times* গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, তৃতীয় কৃষ্ণ ছিলেন এই রাষ্ট্রকূট রাজবংশের শেষ সক্ষম রাজা। তাঁর পূর্বসূরিদের মধ্যে কেউই উপদ্বীপে এতটা আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি যতটা তিনি করতে পেরেছিলেন। এমনকি দ্বিতীয় গোবিন্দ পল্লব রাজার প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক অঞ্চলের অধীনে আনতে পারেননি বা ভেঙ্গির সিংহাসনে বসাতে পারেননি তার বন্ধু বা কোনও মনোনীত ব্যক্তিকে।[৫১] তিনি ছিলেন সমগ্র দাক্ষিণাত্যের প্রভু। তাঁর তুলনায় অন্য কোনও রাষ্ট্রকূট রাজা সমগ্র দাক্ষিণাত্যের অধিপতি ছিলেন না। আচার্য হলায়ুধকে তাঁর রচিত *কবিরহস্য* গ্রন্থে রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সঙ্গে রামের তুলনা করতেও দেখা গেছে। ডক্টর এ. এস. আলটেকর আরও উল্লেখ করেছেন যে, তৃতীয়

---

[৪৯] A. I., Ed. V.D. Mahajan, p. 682

[৫০] Ibid.

[৫১] Ibid., p. 683

কৃষ্ণ অবশ্যই একজন দক্ষ শাসক এবং একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন অন্যথায় এতটা কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব হত না।[৫২]

রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের পর তাঁর পুত্র খোট্টিঙ্গ রাষ্ট্রকূট বংশের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় কর্ক রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যকে কিছুকাল হলেও ধরে রেখেছিলেন। প্রায় দুই শতাব্দী এবং এক-চতুর্থাংশ সময়কালব্যাপী শাসন করা রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত বিনাশ হয় এবং মহাকালের নিয়মে এই রাজবংশ বিলুপ্তও হয়ে যায়। এইভাবে রাষ্ট্রকূট বংশের সূর্য অস্তমিত হয়েছিল।

## ১.২.৮ রাষ্ট্রকূট রাজত্বকালে সংস্কৃতচর্চা :

রাষ্ট্রকূট রাজারা অনেক কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁরা ছিলেন শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অনুরাগী। তাঁদের রাজত্বকালে অনেক সংস্কৃতভাষার কবিকে সভাকবি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেখানকার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবির নাম ও তাঁদের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল।

## ১.২.৯. মহাবীরাচার্য :

মহাবীরাচার্য *গণিতসারসংগ্রহ* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রকূট রাজা অমোঘবর্ষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। মহাবীরাচার্য কর্ণাটকের গুলবর্গা জেলার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বীজগণিত, পাটিগণিত এবং জ্যামিতির অনেকগুলি তত্ত্বের উদ্ভাবক ছিলেন মহাবীরাচার্য। এই গ্রন্থটি ছিল গণিতের প্রথম পাঠ্যগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে নয়টি অধ্যায় রয়েছে। এমনকি এই গ্রন্থটিতে পরমাণুর আকারের

---

[৫২] R. T. T., Ed. A. S. Altekar, p. 123

পরিমাপের এককও গণনা করা হয়। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলি হল– *জ্যোতিষপটল* ইত্যাদি।

## ১.২.১০. ত্রিবিক্রমভট্ট :

ত্রিবিক্রমভট্ট রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের রাজসভার একজন উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় *নলচম্পূ* নামে একটি চম্পূকাব্য রচনা করেছেন। চম্পূ হল কাব্যের এক প্রকারবিশেষ, যা গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত করে রচনা করা হয়। এই ধরণের কাব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে"।[৫৩] এছাড়াও ত্রিবিক্রমভট্ট *দময়ন্তীকথা, মদালসাচম্পূ* ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

## ১.২.১১. জিনসেন :

রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের রাজসভার কবি ছিলেন জিনসেন। জিনসেন ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক গুরু এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক রচনাবলি হল– *ধবল* এবং *জয়ধবল*। তাঁর এই গ্রন্থ রচনায় ধর্মতত্ত্ববিদ বীরসেন তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজার নামানুসারেই এই গ্রন্থগুলির নামকরণ করা হয়েছে।

## ১.২.১২. সোমদেবসূরি :

সোমদেবসূরি ছিলেন দ্বিতীয় অরিকেশরের রাজসভার কবি। তিনি রাষ্ট্রকূট রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি *যশস্তিলকচম্পূ, নীতিবাক্যামৃত*

[৫৩] সাহিত্য., বিশ্বনাথ কবিরাজ, ৬.৩৩৬

ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন। *যশস্তিলকচম্পূ* গ্রন্থটিতে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভোজনাদির বর্ণনা এবং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

## ১.২.১৩. পদ্মপাদ ও সুরেশ্বর :

রাষ্ট্রকূট রাজত্বকালে এঁরা ছিলেন দুই অদ্বিতীয় দার্শনিক। এঁদের সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া সম্ভবপর হয়নি।

## ১.২.১৪. পুষ্পদন্ত :

পুষ্পদন্ত রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের জগতে তাঁর অবদান হল– *মহাপুরাণ, নাগকুমারচরিত* এবং *যশোধরাচরিত*।

## ১.২.১৫. আচার্য হলায়ুধ :

গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু আচার্য হলায়ুধ ছিলেন রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের রাজসভার কবি। তিনি *অভিধানরত্নমালা* বা *হলায়ুধকোষ* নামে অভিধানগ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি *কবিরহস্য* এবং *ক্রিয়ানিঘণ্টু* নামে আরও দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে জানা যায়।

## ১.২.১৬. শাকটায়ন :

শাকটায়ন ছিলেন রাষ্ট্রকূট রাজা অঘোমবর্ষের রাজসভার কবি। তিনি *শব্দানুশাসন* এবং *অমোঘবৃত্তি* নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

## ১.২.১৭. ছাভুণ্ডরায় :

তিনি ছিলেন একজন মহান কবি। তাঁর রচিত *চরিতসভা* নামে একখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

## ১.২.১৮. অকলঙ্কভট্ট :

তিনি রাষ্ট্রকূট রাজবংশের সভাকবি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল– *রাজবর্থিকা, ন্যায়বিনিশ্চর্য, অশতশতী* এবং *লঘিয়াস্ত্রয়।*

## ১.২.১৯. উগ্রাদিত্য :

উগ্রাদিত্য *কল্যাণকরকা* নামে একটি ঔষধি পাঠ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে আমিষভোজী খাবারের কুফল এবং তার পরিহার উপদিষ্ট হয়েছে।

এছাড়াও আরও অনেক খ্যাতিসম্পন্ন কবির নাম রাষ্ট্রকূট রাজাদের নামের সঙ্গে যুক্ত আছে। মানিক্যনন্দী, মল্লবাদী এবং প্রভাচন্দ্র তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত কবিরা ছিলেন রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের রত্নস্বরূপ। এই সময়কার গ্রন্থগুলি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এইসব গ্রন্থগুলি গণিত, চিকিৎসা, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিসাবে পরিগণিত হয়।

## ১.৩. দাক্ষিণাত্যের হলায়ুধের ব্যক্তিগত পরিচিতি ও কাল :

ডঃ Aufrecht-এর মত অনুয়ায়ী আচার্য হলায়ুধ ষোলটিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন।[54] তাঁর নামাঙ্কিত গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিভাগের অন্তর্গত। একাধারে আচার্য হলায়ুধকে একজন বিখ্যাত কোষকাব্যকার এবং সংস্কৃত সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত কবি হিসাবে দেখা যায়। *হলায়ুধকোষ* বা *অভিধানরত্নমালার* জন্য আচার্য হলায়ুধের নাম অধিক পরিচিত। এই *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থটিতে একটি নির্দিষ্ট শব্দের জন্য ভাষায় বিদ্যমান সমস্ত শব্দই পরিবেশন করা হয়েছে। আবার হলায়ুধকে একজন সংস্কৃত কবি হিসাবেও দেখা যায়। কারণ তাঁর রচিত *কবিরহস্য* গ্রন্থের দ্বারা তিনি কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তবে *কবিরহস্য* গ্রন্থ *অভিধানরত্নমালা* র মতো জনপ্রিয় গ্রন্থ নয়।

*হলায়ুধস্তোত্র* নামক একটি স্তোত্রসাহিত্য থেকে নিশ্চিতরূপে একথা বলা যায় যে, লেখক হলায়ুধ ছিলেন শিবের উপাসক। অমরেশ্বর মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ এই স্তোত্রে উল্লিখিত কাল হল ১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দ,[৫৫] সুতরাং এর রচয়িতা অবশ্যই একাদশ শতকের পূর্ববর্তী। তাই এই হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন না যিনি *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, *পণ্ডিতসর্বস্ব*, *মীমাংসাসর্বস্ব* ইত্যাদি বেশ কয়েকটি সর্বস্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

তেলেগু কবি পালকুরিকি সোমনাথ যিনি ১১৯০ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি নবগ্রামের অধিবাসী একজন হলায়ুধের নাম উল্লেখ করেছেন। অমরেশ্বর মন্দিরের

---

[৫৪] E. I., Vol. xxv., P. 173.

[৫৫] Ibid., p. 174.

স্তোত্রের শেষ শ্লোকটি স্পষ্টভাবে এর রচয়িতাকে নবগ্রাম গ্রামের বাসিন্দা বলে উল্লেখ করে।[৫৬] তাই নিশ্চিতভাবে স্তোত্রের লেখককে হলায়ুধ রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে যদি সোমনাথ হলায়ুধকে শিবের ভক্ত হিসাবে উল্লেখ করেন। শ্লোকটি হল–

"দ্বিজো দক্ষিণরাঢ়ীয়ো নবগ্রামবিনির্গতঃ।

হলায়ুধবুধশম্ভোরিমাং স্তুতিমরীরশ্চৎ"।।[৫৭]

ডঃ Aufrecht হলায়ুধের যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল *অভিধানরত্নমালা*। এই গ্রন্থের ২৫ স্তবকে বিষ্ণুর বেশ কয়েকটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মধ্যে অন্যতম হল শম্ভু।[৫৮] হলায়ুধ ছাড়া অন্য কেউ বিষ্ণুর সমার্থক শব্দরূপে 'শম্ভু' পদের উল্লেখ করেননি। সুতরাং *অভিধানরত্নমালা* এবং *হলায়ুধ-স্তোত্রের* প্রণেতার মধ্যে একই ব্যক্তির পরিচয় অনুমান করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়।

ভারততত্ত্ববিদ Aufrecht আরও বলেছেন যে, অভিধানকার হলায়ুধকে খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোনও এক সময়ের ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দেখা যায় যে, *কবিরহস্যের* শেষ শ্লোকটিতে কবি হলায়ুধ নিজেকে অভিধানকার হলায়ুধ হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং *কবিরহস্য* ও *অভিধানরত্নমালার* গ্রন্থকারকে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত। *কবিরহস্যের* শেষ শ্লোকটি হল –

"ইতি সমাপ্তমবাপ্তগুণোদযং কবিরহস্যমিদং রসিকপ্রিযম্।

---

[৫৬] E. I., Vol. xxv., p. 182, হলায়ুধ স্তোত্র, শ্লোক ৬৪

[৫৭] Ibid.

[৫৮] অভিধান., শ্লোক- ২৫

সদভিধাননিধানহলায়ুধদ্বিজবরস্য কৃতিঃ সুকৃতাত্মনঃ"।।[৫৯]

হলায়ুধ রচিত *কবিরহস্য* গ্রন্থটি কাব্যিক শৈলীতে রচিত। ভারততত্ত্ববিদ কিথ মহোদয় হলায়ুধকে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক হিসাবে ধরে নিয়ে *কবিরহস্যের* রচয়িতা হলায়ুধের স্থিতিকাল নির্ধারণ করেছেন।[৬০] তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, *হলায়ুধস্তোত্রের* রচয়িতা আচার্য হলায়ুধই, যিনি *কবিরহস্য* এবং *অভিধানরত্নমালা* উভয় গ্রন্থেরই রচয়িতা এবং তাঁর কাল দশম শতাব্দীর শেষার্ধ। অপর পক্ষে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি বা মহাধর্মাধিকারী রূপে যিনি প্রসিদ্ধ তাঁর কাল একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

## ১.৪. বঙ্গদেশের ইতিহাসে সেনরাজবংশ ও আচার্য হলায়ুধ :

বঙ্গদেশের ইতিহাসে পাল রাজবংশের অবসানের পর পর খিস্টীয় দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে সেন রাজবংশের সূচনা হয়। ধারণা করা হয় তাঁরা এদেশে ছিলেন বহিরাগত। সেন রাজাদের পূর্বপুরুষদের আদি বাসভূমি ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটে। বঙ্গদেশে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হেমন্তসেন। তিনি শেষ বয়সে কর্ণাট থেকে এসে রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি পালরাজ রামপালের অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। সেনবংশের শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হেমন্তসেন হলেও তাঁর পুত্র বিজয়সেনের সময়েই বাংলায় সেনবংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেনবংশের অন্যতম শাসক বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন বলে মনে করা হলেও তা সর্বজনস্বীকৃত নয়। সেনবংশের সর্বশেষ শাসক

---

[৫৯] কবি., শ্লোক- ২৭২

[৬০] E. I., Vol. xxv., p. 174.

লক্ষ্মণসেন ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে নদীয়া ত্যাগ করেন এবং বঙ্গদেশে সেনবংশের শাসনের পতন হয়।

## ১.৪.১. বিজয়সেন :

বঙ্গদেশে বিজয়সেনের সময়েই সেনবংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। বিজয়সেন সম্ভবত পালরাজা রামপালের রাজত্বকালে রাঢ় অঞ্চলে প্রথমে সামন্তরাজা ছিলেন। বিজয়সেন পালরাজা রামপালকে বরেন্দ্র ভূমি উদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। এই সাহায্যের প্রতিদানে তিনি রাঢ়ে স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করেন। পরবর্তীকালে বিজয়সেন প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করে সেনদের ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে একটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত করেন। এভাবে বিজয়সেন তাঁর সুদীর্ঘ ৬২ বছরের রাজত্বকালে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে একক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। বিজয়সেন একজন প্রতিভাবান রাজা ছিলেন। সামান্য একজন সামন্তরাজা হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি নিজ প্রতিভাবলে বঙ্গদেশের সার্বভৌম রাজার স্থান অধিকার করেছিলেন এবং প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে নিজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়া পালবংশের শাসনাবসানে বাংলায় যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তা থেকে তিনি বঙ্গদেশ এবং তার অধিবাসীকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন যাঁর সাহস ছিল অপরিসীম এবং সামরিক দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। তিনি পরমেশ্বর ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। বিজয়সেন শৈব ছিলেন এবং বৈদিক ধর্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা করতেন এবং

তাঁদের অকাতরে দান করতেন। কবি উমাপতিধর বিজয়সেনের চারিত্রিক গুণাবলির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

## ১.৪.২. বল্লালসেন :

বিজয়সেনের মৃত্যুর পর আনুমানিক ১১৬০ সালে তার পুত্র বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্যজয়ের চেয়ে দেশের ভেতরে উন্নয়ন, নতুন প্রথা চালু ও সংস্কারের কাজে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। তবে তিনি গোবিন্দপালকে পরাজিত করে মগধের পূর্বাঞ্চল অধিকার করেন। কথিত আছে যে বল্লালসেন তাঁর পিতার রাজত্বকালে মিথিলা জয় করেন। বল্লালসেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তিনি *আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর* ও *অদ্ভূতসাগর* নামে চারটি গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা বল্লালসেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

## ১.৪.৩. লক্ষ্মণসেন :

বল্লালসেন ও রমাদেবীর পুত্র লক্ষ্মণসেন ১১৭৯ সালে প্রায় ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণসেন গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ ও কাশীতে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ার খিলজির আক্রমণকালে তিনি আশি বছরের বৃদ্ধ ছিলেন। গৌড় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেই পুরোপুরি সেন রাজাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। মগধকে রক্ষা করার জন্যে এবং বঙ্গদেশকে আগলে রাখার মানসে লক্ষ্মণসেন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় না। তবে লক্ষ্মণসেন নিজ সাম্রাজ্যকে বাইরের শত্রুদের হাত থেকে খুব

একটা সুরক্ষিত রাখতে পারেননি। তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে তিনি বার্ধক্যের কারণে বেশ দুর্বলও হয়ে পড়েছিলেন।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে সম্ভবত ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণসেন তখন নদীয়ায় অবস্থান করেছিলেন। দুর্বল লক্ষ্মণসেন কোনও প্রতিরোধ না করে নদীপথে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে চলে যান। এর ফলে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ বখতিয়ার খিলজি অধিকার করেন এবং লক্ষ্মণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বঙ্গদেশে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মণসেনের নদীয়াত্যাগের মাধ্যমেই বঙ্গদেশে হিন্দু শাসনের অবসান হয়েছিল বলে ধরা হলেও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে লক্ষ্মণসেন আরও কয়েক বছর রাজত্ব করেন।

লক্ষ্মণসেন একজন বিদ্বান ও কবি ছিলেন। তিনি বল্লালসেনের অসমাপ্ত *অদ্ভূতসাগর* সমাপ্ত করেছিলেন। তাঁর রাজসভায় জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ঘটেছিল। ভারতপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আচার্য হলায়ুধ তাঁর মহামাত্য, মহাধর্মাধ্যক্ষ ও মহাধর্মাধিকারী ছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের পিতা ও পিতামহ শৈবধর্মের অনুরাগী হলেও তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পূর্বসূরিদের পরমমাহেশ্বর উপাধির পরিবর্তে তিনি পরমবৈষ্ণব উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজসভায় ভারতবিখ্যাত বৈষ্ণব কবি জয়দেবের অবস্থান ছিল। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও কৌলীন্য প্রথার প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল এবং কৌলীন্য প্রথা বিস্তারে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর এই ধরণের মনোভাব সমাজের অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার করে। তবে লক্ষ্মণসেনের দানশীলতা ও ঔদার্য মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিনকে আকৃষ্ট করেছিল।

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন কিছুকাল পূর্ববঙ্গ শাসন করেন। সেন রাজাদের শাসনকালে সর্বক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সমাজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেখা দেয় অস্থিরতা। অনেকের মতে, ধর্ম সম্পর্কে কট্টর মনোভাব সেনদের পতন ত্বরান্বিত করে এবং এরই সুযোগ নেয় মুসলমানেরা।

## ১.৪.৪. সেনযুগের সাহিত্যচর্চা :

সেন রাজাদের আমলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের লক্ষণীয় অগ্রগতি ঘটেছিল। সেন রাজারা কেবল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, তাঁদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যচর্চাও করতেন। আগেই বলা হয়েছে রাজা বল্লালসেন রচিত চারটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল– *দানসাগর, অদ্ভূতসাগর, আচারসাগর* ও *প্রতিষ্ঠাসাগর*। এই গ্রন্থগুলিতে শ্রুতি ও স্মৃতি অনুমোদিত আচার-অনুষ্ঠানের আলোচনা ও নির্দেশিকা লিপিবদ্ধ রয়েছে। *দানসাগরের* বিষয়বস্তু হল– দানকর্মের গুণাগুণ। অন্যদিকে *অদ্ভূতসাগরে* গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানজনিত শুভাশুভ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা আলোচনা করা হয়েছে। কবি শ্রীধরদাসের *সদুক্তিকর্ণামৃত* গ্রন্থে রাজা বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন রচিত বহু শ্লোক পরিবেশিত হয়েছে। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ও মন্ত্রী হলায়ুধ পাঁচটি সর্বস্ব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলি হল– *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব* এবং *শৈবসর্বস্ব*। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থটিই অধুনা উপলব্ধ এবং *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থটির কিছুটা অংশ বিহার ও ওড়িশার মুখপত্রে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের বৈদিক আচার ও স্মার্ত অনুশাসন যথাযথ অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সেনযুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জয়দেব। তাঁর অতি জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থটি হল *গীতগোবিন্দ*। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে কেন্দ্র করে রচিত *গীতগোবিন্দ* মধ্যযুগে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের একটি সার্থক সৃষ্টিরূপে বিবেচিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় চল্লিশজন টীকাকার এই কাব্যের ওপর ভাষ্য রচনা করেছেন। তবে *গীতগোবিন্দ* একটি কাব্যগুণসম্পন্ন রচনা নাকি একটি সার্থক গীতিনাট্য সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মানবিকগুণসম্পন্ন দুটি নারী-পুরুষের প্রেম কাহিনীর সঙ্গে অতিমানবিক ও ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় এই কাব্যকে অনন্যতা প্রদান করেছে। সেনযুগের অন্যান্য সাহিত্যকারদের মধ্যে ছিলেন ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্ধন ও শরণ। ধোয়ী কবি কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের অনুকরণে রচনা করেছিলেন *পবনদূত* কাব্য। উমাপতিধরের বিখ্যাত সৃষ্টি বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি, যা রাজশাহীর প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ করা আছে। আচার্য গোবর্ধনের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল *আর্যাসপ্তশতী*।

## ১.৪.৫. লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় সংস্কৃতচর্চা :

বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ভারতবর্ষ যে সাহিত্যরূপ পুষ্পপাত্র উপহার দিয়েছে তা বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্যের কুসুমসম্ভারেই পরিপূর্ণ। হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী এবং গান্ধার থেকে কামরূপ পর্যন্ত এই বিশাল দেশের বহুবিচিত্র মননশক্তি স্ফূর্তিলাভ করেছিল সংস্কৃত সাহিত্যের অবিমুক্ত ক্ষেত্রে। যুগে যুগে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থানপতনের মধ্য দিয়েই এই ভাষার মন্দাকিনীধারা কখনও ফল্গুধারার মতো, আবার কখনও কুলপ্লাবিনী নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে চলে এসেছে বর্তমানের বেলাভূমিতে।

বঙ্গদেশের অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করেছিল সামগ্রিক ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ ও সার্থক রূপায়ণে।

পিতা বল্লালসেনের যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছিলেন রাজা লক্ষ্মণসেন। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে বঙ্গদেশের রাজসভা প্রতিভাবান পণ্ডিতদের শাস্ত্রচর্চায় এবং কীর্তিমান কবিদের কাব্যরচনায় অপূর্ব মহত্ব লাভ করেছিল। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অনুবর্তনে কলারসিক সহৃদয় রাজা লক্ষ্মণসেনেরও ছিল 'পঞ্চরত্নসভা'। জয়দেব গোস্বামী, গোবর্ধনাচার্য, শরণ, ধোয়ী ও উমাপতিধর– এই পঞ্চপণ্ডিতের নাম পঞ্চরত্নরূপে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নবদ্বীপে রাজসভার প্রবেশপথে শ্লোকাকারে উৎকীর্ণ দেখেছিলেন। উক্ত শ্লোকটি হল–

"গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।

কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ।।"[৬১]

*পবনদূত*-এর কবি ধোয়ীকে জয়দেব কবিক্ষ্মাপতি অর্থাৎ কবিদের মধ্যে রাজা এই বিশেষণে ভূষিত করেছেন। রাজসভায় আচার্য কবির সম্মান লাভ করেছিলেন বলে তিনি নিজেই *পবনদূত*-এর শেষের দিকে বলেছেন- "সদসি কবিতাচার্যকং ভূভুজাং মে"। স্বয়ং জয়দেব তাঁর অমরকাব্য গীতগোবিন্দ-এর চতুর্থ শ্লোকে এই পাঁচ জনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন–

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং

জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরহদ্রুতে।

---

[৬১] Subhasitavali of Vallabha deva, Ed.P.Peterson. Bombay 1886., Introduction.

শৃংগারোত্তরসং প্রমেয়বচনৈরাচার্য গোবর্ধন

স্পর্ধী কোপিন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ।।"[৬২]

শ্লোকের অর্থ হল– উমাপতিধর বাক্যকে বড়ই পল্লবিত করেন। দুরূহ পদের রচনায় শরণ হলেন সিদ্ধহস্ত। শৃঙ্গাররসাশ্রিত কাব্যের সৎ ও সুমিত রচনায় গোবর্ধন হলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কবিরাজ ধোয়ী শ্রুতিধর বলে বিশ্রুত। আর জয়দেব বিশুদ্ধ সন্দর্ভ অর্থাৎ নির্দোষ কাব্যরচনায় নিপুণ।

এদের মধ্যে গীতগোবিন্দ-এর পদকর্তারূপে জয়দেবই সর্বাধিক পরিচিত এবং তাঁর কাব্যই সর্বাধিক পঠিত হয়ে থাকে। কবিকুলপতি কালিদাসের পর একমাত্র তিনিই লাভ করেন সর্বভারতীয় খ্যাতি। তাঁর পদাবলীর লালিত্য, ছন্দের বৈচিত্র্য, শব্দের মাধুর্য ও কল্পনার সৌন্দর্য আজও সহৃদয়ের মনকে মুগ্ধ করে তোলে। জয়দেবরচিত *গীতগোবিন্দ*-এর শ্লোকাবলীতে কামের আবরণে বিশুদ্ধ প্রেমের মোহই প্রকাশলাভ করেছে।

এই পাঁচজন গুণিজন ছাড়া গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু আচার্য হলায়ুধ ছিলেন সেই যুগের অন্যতম যুগন্ধর পণ্ডিত এবং রাজসভায় সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে ও ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠায় অদ্বিতীয় এই কবিপণ্ডিত ছিলেন রাজার বাল্যসুহৃদ, মন্ত্রী ও মহাধর্মাধ্যক্ষ। বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ধনঞ্জয় ছিলেন তাঁর পিতা এবং তাঁর মাতা ছিলেন উজ্জ্বলা। হলায়ুধের দুই অগ্রজ ঈশান ও পশুপতি ছিলেন মহাপণ্ডিত। ঈশান *আহ্নিকপদ্ধতি* নামে একটি গ্রন্থ এবং পশুপতি *শ্রাদ্ধপদ্ধতি* ও *পাকযজ্ঞ* নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়।

---

[৬২] গীত., ১.৪.

শ্লোকরচনাতেও হলায়ুধের নৈপুণ্য অতুলনীয়। তিনি নিজে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব* এবং *পণ্ডিতসর্বস্ব* নামে গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেছেন। নৃপতিগণের নারায়ণস্বরূপ লক্ষ্মণসেনদেব তাঁকে বাল্যে রাজপণ্ডিতপদে স্থাপন করেন, নবযৌবনে চন্দ্রের মত উজ্জ্বল শ্বেতচ্ছত্রমণ্ডিত মহামন্ত্রিপদ দান করেন এবং পরিশেষে প্রৌঢ়বয়সে মহাধর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। নিয়ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ফলে তাঁর গৃহ পবিত্র হয়ে উঠেছিল –

"পাত্রং দারুময়ং ক্বচিদ্বিজয়তে হৈমং ক্বচিদ্ভাজনং
কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দুধবলং কৃষ্ণাজিনং ক্বাপি চ।
ধুমঃ ক্বাপি বষট্কৃতাহুতিকৃতো ধূমঃ পরঃ কাপ্যভূ
দগ্নেঃ কর্মং ফলং চ তস্য যুগপজ্জাগর্তি যন্মন্দিরে[৬৩]"।।

অর্থাৎ কোথাও কাঠের যজ্ঞপাত্র, কোথাও বা সোনার বাসনপত্র ছড়িয়ে আছে। একদিকে ইন্দুশুভ্র পট্টবস্ত্র, অন্যদিকে কৃষ্ণমৃগচর্ম। কোনও স্থান ধূপের গন্ধে সুরভিত, আবার কোনও স্থান বষট্কারধ্বনির সঙ্গে প্রদত্ত আহুতির ধূমে প্রধূমিত। এইভাবেই তাঁর নিজের গৃহে অগ্নি সবসময় জাজ্বল্যমান। এইসব কারণেই তাঁর যশোগরিমা ছড়িয়ে পড়েছে দিক থেকে দিগন্তে।

## ১.৫. বঙ্গদেশীয় হলায়ুধের ব্যক্তিগত পরিচিতি ও কাল :

আচার্য হলায়ুধভট্ট একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রকার।[৬৪] আচার্য হলায়ুধভট্ট স্বকীয় গুণাবলী এবং সামাজিক মর্যাদায় অত্যন্ত উন্নত ছিলেন বলে

[৬৩] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ৩

[৬৪] কবি., প্রাক্কথন অংশ, হলায়ুধভট্ট, শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা)।

সমাজ ও ধর্মরক্ষায় সুকঠিন দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর অদম্য প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম সেই সময় রক্ষা পেয়েছিল। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহ প্রদান করেছে। তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিশারদ এবং তাঁর জ্ঞান বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত ছিল।

হলায়ুধ শিক্ষা ও অর্থবিষয়ে সমৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ ধর্মীয় আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। তাই তাঁদের আর্থিক ঐশ্বর্য তো ছিলই, তদপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় এবং ব্রাহ্মণ্য আচার ও রীতিনীতিতেও তাঁদের পরিবার ছিল অগ্রণী। তিনি ছিলেন বাৎস্যগোত্রীয় ধর্মাধ্যক্ষ ও শ্বেতছত্রধারী।[৬৫] হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি ও ঈশান শ্রাদ্ধ, আহ্নিক প্রভৃতি বিষয়ে দুখানি মূল্যবান পদ্ধতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। পশুপতি *শ্রাদ্ধপদ্ধতি* ব্যতীত পাকযজ্ঞ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। হলায়ুধের গ্রন্থগুলির মধ্যে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* পণ্ডিতসমাজে অত্যন্ত সুপরিচিত। এছাড়াও তিনি রচনা করেছেন *মীমাংসাসর্বস্ব*, *বৈষ্ণবসর্বস্ব*, *শৈবসর্বস্ব* ও *পণ্ডিতসর্বস্ব।* তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তখনকার বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের নিকট থেকে হলায়ুধ প্রভূত সম্মান ও আতিথেয়তা লাভ করেছেন। লক্ষ্মণসেন তাঁকে যৌবনে মহামাত্য ও প্রৌঢ়বয়সে ধর্মাধিকারী পদে নিযুক্ত করেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বৈদিক পণ্ডিতেরা সম্পূর্ণভাবে শাস্ত্রের প্রকৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, হলায়ুধের সময়ে দেশে বেদ অধ্যয়নের প্রচলন থাকলেও তার মধ্যে দোষ দেখা যায়। সেই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বেদচর্চা কমে গিয়েছিল। একাদশ শতাব্দীতে

---

[৬৫] ভা. সং. কো., মহাদেব শাস্ত্রী জোশী সম্পাদিত, খণ্ড ১০ পৃ. ২৯৯

কৃষ্ণমিশ্র *প্রবোধচন্দ্রোদয়* গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন, উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসীগণ বেদ পরিত্যাগ করেছেন।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী যে সময়ে হলায়ুধ *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থ রচনা করেছেন তখন বঙ্গদেশে পালযুগ শেষ হয়ে সেনযুগের শাসন চলছে। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু সেন রাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মের মধ্যে বিভ্রান্তি উপস্থিত হচ্ছে দেখে তিনি হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* রচনা করেন। এর দ্বারা প্রবর্তিত রীতি অনুসরণ করলেই ধর্মের সমস্ত মূল উৎস অবগত হওয়া যাবে- এই ছিল তাঁর আশা। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বেদের মধ্যে হিন্দুধর্মের মূল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই বেদের অর্থবোধ হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছেন। এই দিক থেকে আচার্য হলায়ুধভট্ট একজন অনন্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করেছেন।

বেদভাষ্যকার আচার্য হলায়ুধভট্ট সায়ণাচার্যের পূর্ববর্তী বেদভাষ্যকারদের মধ্যে অন্যতম। তিনিই প্রথম *শুক্লযজুর্বেদের* কাণ্বশাখার ওপর ভাষ্য রচনা করেন। তাঁর রচিত বেদভাষ্যের নাম *ব্রাহ্মণসর্বস্ব।* সায়ণাচার্যের পরবর্তীকালেও এই শাখার উপর ভাষ্য রচনা করেছিলেন অনন্তাচার্য ও আনন্দবোধ। কিন্তু হলায়ুধভট্টই এই শাখার ভাষ্যকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। আচার্য হলায়ুধ শুধু বেদভাষ্যকাররূপেই নন, তিনি জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক হিসেবেও সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর স্থিতিকাল আনুমানিক একাদশ শতাব্দী।[৬৬]

আচার্য হলায়ুধ তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের প্রারম্ভেই নিজের পরিচয় প্রদান করেছেন। এই গ্রন্থে 'গ্রন্থকৃৎপরিচয়ঃ' নামে একটি অংশের উল্লেখ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা সংস্কৃত

---

[৬৬] কবি., ভূমিকা অংশ, শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর(সম্পা)।

সাহিত্যের অন্য কোথাও এইরকম ভাবে 'গ্রন্থকৃৎপরিচয়ঃ' বলে উল্লেখ করে কোনও গ্রন্থকার তাঁর নিজ পরিচয় প্রদান করেছেন এমনটা পরিলক্ষিত হয় না।

*ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থ থেকে হলায়ুধের যে পরিচয় জানা যায় তা নিম্নে আলোচিত হল। আচার্য হলায়ুধ বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁর পিতার নাম ছিল ধনঞ্জয় ও মাতার নাম ষণ্ডী।[৬৭] তাঁদের পরিবার আর্থিকভাবে বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল। তাঁর পিতা আচারনিষ্ঠ ও বিদ্বান যাজ্ঞিক ছিলেন। তাঁর মাতাও যম-নিয়ম-ধৈর্য্যাদিগুণসম্পন্না ছিলেন। গুণগ্রাহী মহারাজ লক্ষ্মণসেন যেমন হলায়ুধকে নিজসভায় নিয়ে এসে মর্যাদার সঙ্গে মহামাত্যের পদে বসিয়েছিলেন, তেমনি তাঁকে আশাতিরিক্তভাবে পুরস্কৃত করে তাঁর সম্পদবৃদ্ধি করেছিলেন। বলা হয়েছে- "স্তেনে যস্য মনীষিতাধিকপুরস্কারোত্তরাং সম্পদম্'।[৬৮] তাঁর রচিত একটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে, বাল্যকালেই হলায়ুধ রাজপণ্ডিত পদ লাভ করেছিলেন।

"বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসক্তমহামহত্তকপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমাল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতির্ধর্মাধিকারং দদৌ।।"[৬৯]

যৌবনে তিনি মহামহত্তক পদ এবং প্রৌঢ়বয়সে ধর্মাধিকারীর পদ পেয়েছিলেন। তাঁর পত্নীও প্রকৃত সহধর্মিণীর মতো স্বামীর যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানে ও শাস্ত্রাচাররক্ষায় তৎপর, ব্রতনিরত ও আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

---

[৬৭] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স. পৃ. ২

[৬৮] তদেব

[৬৯] তদেব

*পরিচয়ব্যপদেশ* নামক অপর একটি গ্রন্থের শ্লোক থেকে জানা যায় যে, হলায়ুধ *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ছাড়াও *বৈষ্ণবসর্বস্ব, শিবসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এছাড়া *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থখানিও তাঁর মীমাংসা সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় প্রদানে সার্থক ভূমিকা নেয়।

## ১.৬. বঙ্গদেশীয় হলায়ুধের পারিবারিক জীবন :

হলায়ুধ একটি বিত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে পরিবার বস্তুগত সমৃদ্ধির অধিকারের থেকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ্যরীতিতে অধিক গর্বিত ছিলেন। তাঁর পিতা ধনঞ্জয়, যাঁকে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে পবিত্র আগুনে উৎসর্গীকৃত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে,[৭০] তিনি যজ্ঞের ঘাস ও ষাঁড়ের মূল্যকে রত্ন এবং হাতি ইত্যাদির থেকে বেশি মূল্যবান বলে মনে করতেন।[৭১] হলায়ুধের বাসস্থানকে ধর্মীয় কঠোরতা এবং বস্তুগত সমৃদ্ধির লক্ষণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বাসভবনে ছিল কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্রপাতি ও সোনার পাত্র, হরিণের চামড়া ও মূল্যবান পোশাক, যজ্ঞের ধোঁয়া এবং জ্বলন্ত ধূপের সুবাস। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে – "পাত্রং দারুময়ং ক্বচিদ্ বিজযতে।"[৭২]

হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতিকে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে আবসথিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৭৩] হলায়ুধ নিজেকেও বারবার আবসথিক বলেছেন।[৭৪] এই আবসথিক পারিভাষিক শব্দটি কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যিনি গৃহে যজ্ঞাগ্নি রাখেন এবং প্রত্যহ অগ্নি প্রজ্বলন করেন। অগ্ন্যালয়ে যেখানে হলায়ুধ বলিদান

---

[৭০] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, যস্মিন্ জুহুতি জাতবেদসি হবির্ব্যোসাঙ্গনব্যাপিভিঃ, ব্রা. স. পৃ. ১

[৭১] তদেব., বাঞ্ছাতিক্রমসম্ভূতেঽপি বিভবে জ্যোতির্জটাখান্ মণীন্;

[৭২] তদেব., পৃ. ৩

[৭৩] তদেব., পাকযজ্ঞপদ্ধতিশ্চ সনিবন্ধাঽস্মজ্জ্যেষ্ঠাবসথিক-পশুপতিকৃতা; পৃ. ৩০৪

[৭৪] ইত্যাবসথিক-ধর্মাধ্যক্ষ-হলায়ুধকৃতৌ ব্রাহ্মণসর্বস্বে; তদেব

করতেন এবং যজ্ঞের সরঞ্জামগুলি কার্যসম্পাদনে ব্যবহার করতেন, ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকগুলিতে সেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হলায়ুধ দিনে তিনবার পবিত্র অগ্নিকে যথাযথভাবে উৎসর্গ করে উজ্জীবিত রাখতেন যাতে সেই অগ্নি থেকে সক্রিয় অবস্থায় প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হয়।[৭৫] পশুপতি এবং হলায়ুধ ছিলেন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। তাঁদের পিতা ধনঞ্জয়ও একজন নিয়মিত যজ্ঞকারী ছিলেন। হলায়ুধের পরিবার, যাঁরা অন্তত দুই প্রজন্ম ধরে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা উপভোগ করেছিলেন, তাঁরা কঠোরভাবে বৈদিক রীতিনীতি বা আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেছিলেন। পরিবারের সদস্যরাও তাঁদের সাহিত্যকর্মের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি এবং ঈশান *শ্রাদ্ধপদ্ধতি* এবং *আহ্নিকপদ্ধতি* লিখেছেন।[৭৬] পশুপতি পাকযজ্ঞের উপরে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই গ্রন্থ এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে হলায়ুধ পাকযজ্ঞের উপরে আর কোনও গ্রন্থ লেখার চেষ্টাই করেননি।[৭৭]

হলায়ুধ বাংলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈদিক অধ্যয়নের পদ্ধতিতে সংস্কার প্রবর্তনের লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে পরবর্তী কালে উদ্যমের অভাবে এই অঞ্চলে বৈদিক শিক্ষা প্রবর্তন ও হলায়ুধের পরিশ্রম সত্ত্বেও পরিণামস্বরূপ কোনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান কঠিন হয়ে পড়ে। যেহেতু বাংলার অনেক ব্রাহ্মণ তাঁদের বৈদিক অধ্যয়নকে যথাযথভাবে বিচার করতে পারছিলেন না তাই হলায়ুধ দুর্বল ছাত্রদের জন্য পাঠ্যক্রম

---

[৭৫] আবসথ্য আবসথায। বৈ. সূ., ৬.৫; It probably means one who regularly performs all the Grihya rites, P.V. Kane, H. D., Vol. 1, p.299.

[৭৬] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ভ্রাতা পদ্ধতিমগ্রজঃ পশুপতিঃ শ্রাদ্ধাদিকৃত্যে ব্যধাদীশানঃ কৃতবান্ দ্বিজাহ্নিকবিধৌ জ্যেষ্ঠোঽপরঃ পদ্ধতিম্। ব্রা. স. পৃ. ৫

[৭৭] পাকযজ্ঞপদ্ধতিশ্চ সনিবন্ধাঽস্মজ্জ্যেষ্ঠাবসথিক-পশুপতি-কৃতাঽস্ত্যেব। সৈব লোকেঽতিপ্রসিদ্ধ। অতোঽস্মাভিরস্মিন বিষযে পদ্ধতির্ন কৃতা। তদেব., পৃ. ৩০৪

সংকীর্ণ করেছিলেন।[৭৮] তবে তিনি তাঁদের জন্য বেদের পুরনো পাঠ্যক্রম ধরে রেখেছিলেন যাঁদের অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলি অর্জন করার ক্ষমতা ছিল।[৭৯]

কিন্তু একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে সমগ্র বেদের অধ্যয়নের অনুশীলন বঙ্গদেশে কোথাও প্রচলিত নেই। হলায়ুধের পর্যবেক্ষণের একটি বিশ্লেষণ ঈঙ্গিত করে যে কিছু লোক অন্তত তাঁর সময়ে দেশের পাশ্চাত্ত্য এবং দাক্ষিণাত্য অংশে বেদ মুখস্থ করতেন। হৃদয় দিয়ে বেদপাঠ শেখা এখানে সম্পুর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে। বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র, যাঁরা হলায়ুধের সময়ে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ পরীক্ষা করতেন তাঁরা এখন এই অনুশীলনটি ত্যাগ করেছেন। একই সময়ে বেদাধ্যয়ন এবং অর্থবোধের জন্য হলায়ুধের নতুন নির্দেশগুলি এই ফলাফলের জন্য কোনওভাবে দায়ী ছিল কিনা তা জানা যায়নি।

## ১.৭. বঙ্গদেশীয় হলায়ুধের কর্মজীবন :

ব্যক্তিগত জীবনে সমৃদ্ধি, সামাজিক উচ্চাবস্থান এবং পাণ্ডিত্যের জন্য আচার্য হলায়ুধভট্ট সভাকবি হওয়ার জন্যে উপযুক্ত ছিলেন। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁকে এই উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছিল। হলায়ুধ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন পণ্ডিত।[৮০] তিনি বিশেষভাবে বেদ, পুরাণ, মীমাংসা এবং ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, যা তাঁর রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের আলোচনায় প্রমাণিত

---

[৭৮] তদ্বরং সন্ধান্নানাদি আহ্নিকগর্ভাধানাদি সংস্কারাগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্ত মন্ত্রভাগ এবাধ্যেতুং যুজ্যতে। দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ১০

[৭৯] যোঽতিতীক্ষ্ণবুদ্ধিত্বাদল্পসময়েনৈষ বেদত্রযমভ্যস্যতি তেন তদভ্যাসানন্তরমেব সমাবর্তনং কর্তব্যম্। তদেব., পৃ. ২৪৫

[৮০] শব্দব্রহ্ম করোদরামলকবৎ, তদেব., পৃ. ২

হয়েছে। তিনি শাসক রাজার একজন প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং তাঁর কাছ থেকে একের পর এক নানাবিধ কার্যভার গ্রহণ করেন যা তাঁর বিভিন্ন বয়সের উপযোগী বিভিন্ন মাত্রার সম্মান ও দায়িত্ব জ্ঞাপন করে।[৮১] তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি একজন রাজপণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হন। হলায়ুধকে তাঁর যৌবনে মহাধর্মাধ্যক্ষের সম্মানজনক পদ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে তাঁকে ধর্মাধিকারীর অধিকার বা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই পদ ছিল তাঁর জীবনের সব থেকে বড় প্রাপ্তি। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বলা হয়েছে– "বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল..."[৮২]

এখানে উল্লেখ করা ছাড়াও ধর্মাধিকারী হিসাবে শেষ বৃত্তি *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* বিভিন্ন স্থানে আচার্য হলায়ুধভট্ট উল্লেখ করেছেন। ধর্মাধ্যক্ষ, মহাধর্মাধ্যক্ষ, গৌড়বসুধাধীশধর্মাধ্যক্ষ, গৌড়েন্দ্র, ধর্মকোষাধিকারী, ধর্মাধিকৃত এবং গৌড়েন্দ্রমহাধর্মাধিকারী- এইসব ছিল আচার্য হলায়ুধের প্রাপ্ত রাজ-উপাধি। হলায়ুধের পিতা ধনঞ্জয়কেও ধর্মাধ্যক্ষ এবং মহাধর্মাধিকারী বলা হয়। তাঁদের প্রেক্ষাপটে এই সমস্ত উপাধি বিচারকের পদের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে রাষ্ট্রের ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়। ধর্মাধিকারী শব্দটি কালিদাসের প্রণীত *অভিজ্ঞানশকুন্তলা* নাটকেও দেখা যায়। সেখানে দুষ্যন্ত আশ্রমকন্যাদের কাছে নিজেকে ধর্মাধিকারী পদে নিযুক্ত বলে পরিচয় দেন।[৮৩] পবিত্র তপোবনকে ধর্মীয় ও আচার-অনুষ্ঠান বিষয়ে বাধামুক্ত হিসাবে

---

[৮১] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত., বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংসুবিম্বজ্জ্বল..., ব্রা. স., পৃ. ২

[৮২] তদেব

[৮৩] যঃ খলু পৌরবেণ রাজ্ঞা ধর্মাধিকারে নিযুক্তঃ সোঽহমবিঘ্নক্রিযোপলম্ভায ধর্মারণ্যমিদমাযাতঃ, অভিজ্ঞান. প্রথম অঙ্ক.

নিশ্চিত করা তাঁর একটি অন্যতম দায়িত্ব ছিল।[৮৪] এইভাবে ধর্মাধিকারী পদটি ছিল রাজ্যের ধর্ম অধিদপ্তরের সমতুল্য। তাঁদের কাজ ছিল রাজাকে তাঁর ধর্মীয় উদ্যোগে সর্বদা সহযোগিতা করা। এপিগ্রাফিক রেকর্ড থেকে জানতে পারা যায় যে, ধর্মাধিকার বিভাগকেই রাজার দ্বারা প্রদত্ত ধর্মীয় অনুদান বণ্টন করতে হত। 'কমৌলো' অনুদানে বৈদ্যদেব বলেছেন যে, ধর্মাধিকারের দায়িত্বে থাকা রাজা কোবিদ গোনন্দনের পরামর্শেই একমাত্র অনুদান দিতে পেরেছিলেন। রাজার এই ধর্মাধিকার বিভাগের প্রকৃতি ও পরিধি নারায়ণ উপাধ্যায়ের একটি বিবৃতি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। পরিশিষ্ট প্রকাশের (আনুমানিক ১২০০ শতক) একটি সূচনামূলক শ্লোকে বলা হয়েছে, নারায়ণের পিতা গোণা ধর্মাধিকারীর পদে নিযুক্ত থাকাকালীন ব্রাহ্মণদের গৃহে প্রভূত সমৃদ্ধি ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে, ধর্মাধিকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ব্রাহ্মণদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে অনুদান প্রদান করা।[৮৫] সম্ভবত এই কারণেই হলায়ুধ একবার নিজেকে ধর্মকোষাধিকারী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। ধর্মকোষাধিকারী হলেন ধর্মীয় প্রকৃতির দাতব্য উদ্যোগের জন্য রাজকীয় তহবিলের দায়িত্বে থাকা একজন আধিকারিক।[৮৬]

---

[৮৪] এতস্মৈ মুদিতো দ্বিজাতিপত্তয়ে ধর্মাধিকারার্পিত। শ্রীগোনন্দনকোবিদৈকবচনাৎ প্রাদাদিদং শাসনম্।। কমৌলি গ্রান্ট, ১.৬৮; E. I., xvii, p. 323

[৮৫] যস্মিন কৃষ্ণাপদৈকলীনহৃদয়ে ধর্মাধিকারাস্পদং। বিভ্রাণে দ্বিজমন্দিরারাযধিবসন্তির্ভূর্তদোষাঃ শ্রিয়ঃ।। পরি. প্র., কর্ম-প্রদীপ।

[৮৬] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, শ্রীমতোঽবন্তিনাথস্য বিক্রমার্কস্য ভূপতেঃ। ধর্মাধ্যক্ষো হরিস্বামী ব্যাখ্যচ্ছাতপথী শ্রুতিম্।। হলাযুধেন গৌড়েন্দ্র-ধর্মকোশাধিকারিণা। এতৎ পুরুষসূক্তস্য ব্যাখ্যানং প্রতিপাদ্যতে।। ব্রা. স., পৃ. ১৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

# আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত রচনাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

## ২.১. আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত গ্রন্থসমূহ :

পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যা সম্পর্কে *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* আচার্য হলায়ুধভট্ট বলেছেন, বিষ্ণুর উপাসনায় একই সূক্তের প্রয়োগ *বৈষ্ণবসর্বস্বে* বিশদভাবে আলোচিত একটি বিষয়। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে– "এষা যদ্যপি বৈষ্ণবসর্বস্ব এব তৎ তৎ বিশেষেণ প্রতিপাদিতা তথাপি পুরুষসূক্তস্য আকারপ্রসঙ্গাদেতর্দীয়মাহাত্ম্যং পুনরিহাপি কিঞ্চিৎ অভিধীয়তে।"[১]

আচার্য রঘুনন্দনের *স্মৃতিতত্ত্বে শৈবসর্বস্ব* ও *পণ্ডিতসর্বস্বের* নাম উদ্ধৃত হয়েছে। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে হলায়ুধের *পণ্ডিতসর্বস্বের* সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি রয়েছে এবং একই শিরোনামের অর্থাৎ *পণ্ডিতসর্বস্ব* নামে একটি অজ্ঞাত লেখকের রচনাও সেখানে পাওয়া যায়। মিথিলার পাণ্ডুলিপির তালিকাতে হলায়ুধরচিত *প্রায়শ্চিত্তসর্বস্বের* ১৪৫ ফোলিয়োতে একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপিটির পুষ্পিকাতে নির্দেশ রয়েছে যে, গ্রন্থটির রচয়িতা ও *পণ্ডিতসর্বস্বের* রচয়িতা একই ব্যক্তি। পুষ্পিকাতে উল্লেখ রয়েছে– "ইতি পণ্ডিতসর্বস্বং পুস্তকং পাদোনং সমাপ্তম্।"[২]

এই সর্বস্ব গ্রন্থগুলি ছাড়াও রঘুনন্দন আচার্য হলায়ুধের *সংবৎসরপ্রদীপ* নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটির উল্লেখ বঙ্গদেশের আরও কিছু স্মৃতিনিবন্ধক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তবে আচার্য হলায়ুধই *সংবৎসরপ্রদীপের* রচয়িতা কিনা সেই প্রশ্নটি

---

[১] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ১৩২

[২] Descriptive Catalogue of Manuscripts in Mithila, Vol.I. p.325, No.283.

বারবার মনের কোণে দানা বাঁধে, যার সমাধান আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেননি। আচার্য রঘুনন্দন *সংবৎসরপ্রদীপের* অজ্ঞাত পাণ্ডুলিপিটিরও উল্লেখ করেছেন। এই পাণ্ডুলিপি বহুদিন আগে *দ্বিজনয়ন* নামে লক্ষ করা গেছে। এই পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব এই সত্যে নিহিত যে এটির শুরুতে রচয়িতা হিসাবে হলায়ুধের নাম সহ একটি অতিরিক্ত শ্লোক রয়েছে। ঠিক একই শ্লোক হলায়ুধ রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের ২৭ সংখ্যক প্রারম্ভিক শ্লোক হিসেবেও সামান্য ভিন্ন আকারে রয়েছে।[৩] *সংবৎসরপ্রদীপ* এবং *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* উভয়ক্ষেত্রেই এই সাধারণ শ্লোকের উপস্থিতি দ্বারা রঘুনন্দনের মন্তব্যের যথার্থতা অন্বেষণ করা সম্ভবপর হয়।

দুটি গ্রন্থের প্রকৃতি অন্তত একটি দিক থেকে কিছুটা একই রকম। বলা হয়েছে যে, দুটি গ্রন্থেই নিবন্ধকারের নামের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং দুটি গ্রন্থই সম্ভবত একজন লেখকের লেখনী থেকেই এসেছে। হলায়ুধ ছিলেন লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ।[৪] বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *কৃত্যমহার্ণব* গ্রন্থে একজন হলায়ুধের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সেই হলায়ুধের উপাধি ছিল ধর্মাধিকরণি।[৫] এই একই উদ্ধৃতি *সংবৎসরপ্রদীপেও* পাওয়া যায়। হলায়ুধের রচনার অনুসন্ধানের সময় অন্য একজনের পাণ্ডুলিপিতে ভাষ্যকার হলায়ুধের নামটি পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ স্থানের অধিকারী একাধিক আচার্য হলায়ুধের পরিচয় প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে হলায়ুধ নামক

---

[৩] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা স., সূক্ষ্মাববোধকভট্টবিকাশকারি নিস্তারকং কিমপি..., পৃ. ৫

[৪] তদেব., পৃ. ২

[৫] হলাযুধধর্মাধিকরণিকাস্তু মলমাসে যথোক্তগজচ্ছাযা ভবতীত্যাহু...Asiatic Society Ms. No. I F46, fol.13.

আচার্যের নামাঙ্কিত সমস্ত উপলব্ধ ও উল্লিখিত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হবে। সেই সঙ্গে এই কৃতিসমূহের গ্রন্থকর্তৃত্বের বিষয়েও যত্নপূর্বক আলোকপাত করা হবে। ভারততত্ত্ববিদ Aufrechet-এর মতানুয়ায়ী আচার্য হলায়ুধ কর্তৃক ষোলটিরও বেশি গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[৬] তাঁর মত যথার্থ হিসাবে ধরে নিলেও বর্তমান গবেষণাকার্যে সেই সমস্ত গ্রন্থের মুদ্রিত ও প্রকাশিত রূপ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থাগারে এবং অপর কয়েকটি অন্তর্জালে উপলব্ধ। অন্যান্য গ্রন্থগুলির নাম বিভিন্ন শাস্ত্র ও গবেষণাগ্রন্থে উল্লিখিত। এই উপলব্ধ ও উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে এখানে হলায়ুধের নামাঙ্কিত গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু, গ্রন্থকর্তৃত্ব ও রচনাকাল বিষয়ে যথাসাধ্য পর্যালোচনা করা হবে।

## ২.২. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* :

*শুক্লযজুর্বেদে*র কাণ্বশাখার ওপর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামে একটি ভাষ্যের রচয়িতা হলেন হলায়ুধ। পরবর্তীকালেও এই শাখার ওপর ভাষ্য রচনা করেছিলেন সায়ণাচার্য, অনন্তাচার্য ও আনন্দবোধ। কিন্তু হলায়ুধভট্টই এই শাখার ভাষ্যকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। হলায়ুধ তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে কাণ্বশাখীয় বাজসনেয়ীদের গার্হস্থ্যকর্মের উপযোগী প্রায় তিন শতাধিক মন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থকার প্রথমেই কোন মন্ত্রের প্রয়োগ কোন অনুষ্ঠানে করা হয় তার একটি সূচী প্রদান করেছেন। সেখানে দন্তধাবন থেকে শুরু করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত মোট চল্লিশ ধরণের কর্মের নাম রয়েছে। কর্মানুষ্ঠানগুলির মধ্যে যেখানে সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয়দের একই মন্ত্র পাঠ করা হয়, সেখানে পূর্বাচার্য

৬ E. I., Vol. XXV, p. 173

গুণবিষ্ণু ও হলায়ুধের ব্যাখ্যাপদ্ধতি প্রায় অনুরূপই বলা চলে।[৭] হলায়ুধ সহজভাবেই মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন- একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর ব্যাখ্যা পদ্ধতি পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে এবং স্মৃতি-নিবন্ধের মতো কর্মনুষ্ঠানসম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রয়োগে পরিপূর্ণ।

*ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে যে হলায়ুধকে চিহ্নিত করা যায়। তিনি ছিলেন বঙ্গাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী ও প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত। মহারাজ আদিশূর যাগযজ্ঞ করবার জন্য কাণ্বকুব্জ থেকে যে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন, তাঁদের মধ্যে ভট্টনারায়ণের বংশধর আচার্য হলায়ুধভট্ট ছিলেন অন্যতম।[৮]

শাস্ত্রানুসারে বলা হয়, বেদের জ্ঞান না থাকলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়ে যায়। বেদমন্ত্রের অর্থ, ছন্দ, ঋষি, দেবতা, বিনিয়োগ ইত্যাদির সম্যক্ জ্ঞান লাভ না হলে বেদ পাঠের কোনও বিশেষ কার্যকারিতা নেই। বেদের জ্ঞান মনোগত ও জ্ঞানগত না হলে কেবলমাত্র বাহ্য ধর্মে কোনও উপকার নেই। তৎকালীন বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেরা বেদবিষয়ে প্রায়ই অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা বৈদিক ধর্মের প্রকৃত মর্মবিষয়ে অবগত ছিলেন না। সেই সময় শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়াসমূহ সজ্ঞানে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তার দ্বারা কোনও উপকার সাধনই হত না। এই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে গ্রন্থকার তাঁর প্রণীত গ্রন্থকে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নাম দিয়ে জনসমাজে প্রচার করেন। বাস্তবিক পক্ষেও এটি ব্রাহ্মণগণের সর্বস্ব। অন্যভাবে বলা যায়, যে গ্রন্থে ব্রাহ্মণের সর্বস্ব ধন, সদাচার, স্বাধ্যায়, সন্ধ্যাবন্দনাদি বর্ণনা করে সেই পরম পথ লাভের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে– তাই হল *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*।

---

৭ ছা. ম. ভা, ভূমিকা অংশ, পৃ. XXXI & XXXIII.

৮ কবি., হলায়ুধভট্ট, শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রাক্কথন অংশ

প্রতিদিন প্রতিকর্মে আধ্যাত্মিক উন্নতিকে লক্ষ রেখে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় কোন কোন আচার-অনুষ্ঠান কি কি কারণে করতে হবে, প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনাদির সময়ে কি কি শুভ ইচ্ছা করতে করতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম – এই পঞ্চতন্মাত্রের সারভূত জীবকে জলের সাথে, তেজের সাথে, বায়ুর সাথে, আকাশের গ্রহদের সাথে – এককথায় নিজের উপাদান কারণসমূহে সহানুভূতি বিস্তৃত করে তাঁদের সঙ্গে একীভূত হয়ে কিরূপে পরমাত্মায় মনকে নিয়োজিত করতে হবে এবং গায়ত্রী, পুরুষসূক্ত, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, বলি, বৈশ্বানর ইত্যাদি স্বাধ্যায় ও কর্মযোগে কিরূপে সেই ব্রহ্মের দেব, পিতৃ ও ঋষি লোকের সামীপ্য লাভ করতে পারা যায় এবং জন্ম থেকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্যন্ত জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি যে সমস্ত দশবিধ সংস্কারে জীবের দেহ ও মন পবিত্র করতে হবে, সংক্ষেপে ধর্মজীবনের জন্য যা কিছু আর্যের অনুষ্ঠাতব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে, এই গ্রন্থে এইসব বিষয়সমূহই যুক্তি, প্রমাণ, বিধি ও ব্যাখ্যার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ পাঠ করলে আর্যধর্মের উপর লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমুন্মীলিত হবে, লোকে আর্যধর্মের রহস্য বিষয়ে অবগত হতে পারবে এবং ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞান ও স্ব স্ব ধর্ম প্রতিপালনে সম্যক সমোৎসুক হবেন।

এই গ্রন্থে ঋক্, সাম, যজু সকল বেদেরই মন্ত্রভাগ ব্যাখ্যাত রয়েছে। তবে যজনকার্যে যজুর্বেদের মন্ত্রই অধিক প্রয়োগ হয় একারণে ক্রিয়া-কাণ্ড ব্যাখ্যার স্থলে যজুর্বেদের মন্ত্রই ব্যাখ্যাত হয়েছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বেদ ব্যাখ্যা বিষয়ে হলায়ুধের মতো ভাষ্যকার খুবই বিরল।

এই অংশে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। এই গ্রন্থের প্রথমেই গ্রন্থারম্ভ প্রয়োজন আলোচিত হয়েছে। তারপর বেদ অধ্যয়নের প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়েছে[৯]। বেদমন্ত্রের অর্থজ্ঞানের ফল, ঋষি, ছন্দ, দেবতা প্রভৃতি জানার ফল, দন্তধাবনকর্ম, প্রাতঃস্নান, প্রাতঃসন্ধ্যা– এগুলি পরপর আলোচিত হয়েছে। এরপর প্রাণায়ামের মাহাত্ম্য বিস্তারিতভাবে কথিত হয়েছে। প্রাণায়ামের গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যান এবং তারপরে জপ্যগায়ত্রীর ব্যাখ্যান উপস্থাপিত হয়েছে। স্নানমন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা, অঘমর্ষণ সূক্তের মাহাত্ম্য ও ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত হয়েছে। ব্রহ্মযজ্ঞক্রিয়ার মন্ত্রসমূহ, তর্পণের মন্ত্রসমূহও বলা হয়েছে। আদিত্যাদি গ্রহগণের পূজামন্ত্র, পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যা, ত্র্যম্বক মন্ত্র ও চণ্ডীমন্ত্রের ব্যাখ্যা, নিরগ্নির বৈশ্বদেবযজ্ঞের মন্ত্রসমূহের উল্লেখ রয়েছে। পার্বণাদি শ্রাদ্ধের মন্ত্রব্যাখ্যা, ভোজনমন্ত্র, সায়ংসন্ধ্যা, শয়ন ও গর্ভাধানবিধির মন্ত্রসমূহ, পূংসবন ও সীমন্তোন্নয়নের মন্ত্রসকল, সোষ্যন্তিকর্মের, জাতকর্মের, নামকরণের, নিষ্ক্রমণের ও অন্নপ্রাশনের মন্ত্রসমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। তারপর চূড়াকরণের, উপনয়নের, সমাবর্ত্তনের ও বিবাহের মন্ত্রসমূহ প্রদত্ত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এরপর আবসথ্যাগ্নির আধানমন্ত্র, মণিকাধানমন্ত্র, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞবিধির মন্ত্র ও পক্ষাদিকর্মের মন্ত্রসমূহ কথিত হয়েছে। আচার্য হলায়ুধভট্ট এখানে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পশুপতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পশুপতি *পাকযজ্ঞপদ্ধতি* গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে আচার্য হলায়ুধভট্ট পাকযজ্ঞ বিষয়ক কোনও গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হননি– একথা আচার্য হলায়ুধভট্ট স্বয়ং বলেছেন-

"নিবন্ধেন সমেতাং যৎ পাকযজ্ঞস্য পদ্ধতিম্।
জ্যেষ্ঠঃ পশুপতিশ্চক্রে তেনাস্মাভির্ন সা কৃতা।।

[৯] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ১১

অন্ত্যেষ্টিকর্মণো মন্ত্রা ব্যাখ্যাতাঃ খ্যাতকীর্তিনা।"[১০]

এই শ্লোকে তিনি এও বলেছেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পশুপতি যেহেতু *পাকযজ্ঞপদ্ধতি* গ্রন্থে অন্ত্যেষ্টিকর্মের মন্ত্রসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন তাই তিনি সেই মন্ত্রগুলিরও ব্যাখ্যা করেননি। অন্ত্যেষ্টিকর্মের এই মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা *পাকযজ্ঞপদ্ধতি* গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। আর তাই আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে দন্তধাবন থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যেষ্টি কর্মের পূর্ব পর্যন্ত যে মন্ত্রসমূহ শাস্ত্রে উল্লেখিত রয়েছে, সেই সমস্ত মন্ত্রগুলিরই ব্যাখ্যা তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে করেছেন।

*ব্রাহ্মণসর্বস্বের* রচয়িতা হলায়ুধভট্টই একমাত্র ব্যক্তি যিনি গ্রন্থরচনার প্রাক্কালে গ্রন্থের বিষয়সূচীও আলোচনা করেছেন এবং এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু নির্বাচন, পরিধি নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করেছেন। আচার্য হলায়ুধভট্টই সর্বপ্রথম এই সমস্ত অনালোচিত বিষয়গুলিকে নিয়ে গ্রন্থরচনায় অগ্রসর হয়েছেন।

## ২.৩. *মীমাংসাসর্বস্ব* :

আচার্য হলায়ুধ কর্তৃক রচিত সর্বস্ব গ্রন্থগুলির মধ্যে অপর একটি হল *মীমাংসাসর্বস্ব*। তবে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি বিহার ও উড়িষ্যার অনুসন্ধান সমিতির মুখপত্রে *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থখানি আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সমিতির মুখপত্রের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খণ্ডে *মীমাংসাসর্বস্বের* কিছুটা অংশ প্রকাশিত হয়েছে।[১১] এখানে জৈমিনিরচিত *মীমাংসাসূত্রের* প্রথম তিনটি অধ্যায়ের আলোচনা-সম্বলিত হলায়ুধের এই গ্রন্থ *মীমাংসাশাস্ত্রসর্বস্ব* নামে আংশিকরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

---

[১০] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ৭

[১১] The journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol.XVII, 1931, Parts.II-III

জৈমিনিরচিত *মীমাংসাসূত্রে* দ্বাদশ সংখ্যক অধ্যায় রয়েছে। সেখানে 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা'- এই সূত্রটি দিয়ে গ্রন্থটির আরম্ভ হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের পরে ৪টি অধ্যায় যা সঙ্কর্ষকাণ্ড হিসেবে পরিচিত। অনেকে এই চারটি অধ্যায়কেও *মীমাংসাসূত্রের* সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন। কিন্তু আচার্য শবরস্বামী এই চার অধ্যায়ের ওপর কোনও ভাষ্য রচনা করেননি। সুতরাং এই চারটি অধ্যায়ের রচয়িতা আচার্য জৈমিনি কিনা এই নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। *মীমাংসাসূত্রের* দ্বাদশ অধ্যায়ের বিষয়সমূহ হল- ১. বিধিপ্রামাণ্য; ২. বিধিনিহিত কর্মসমূহের ভেদ; ৩. বিহিত কর্মসমূহের অঙ্গাঙ্গিভাব; ৪. ক্রতুপ্রযুক্ত অনুষ্ঠেয় এবং পুরুষার্থপ্রযুক্ত অনুষ্ঠেয় কর্মসমূহের পরিমাণ; ৫. কর্মানুষ্ঠানের ক্রম; ৬. অধিকার অর্থাৎ যজ্ঞকারী পুরুষের যোগ্যতা; ৭. প্রকৃতিযাগে উপদিষ্ট অঙ্গসমূহের বিকৃতিযাগে সামান্যাতিদেশ; ৮. প্রকৃতিযাগে উপদিষ্ট অঙ্গসমূহের বিকৃতিযাগে দ্রব্যদেবতাদি দ্বারা বিশেষাতিদেশ; ৯. ঊহ ১০. বাধ ১১. তন্ত্র এবং ১২. প্রসঙ্গ। জৈমিনিরচিত *মীমাংসাসূত্রের* এই দ্বাদশ অধ্যায়কে অনুসরণ করে হলায়ুধের *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। তবে *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থটির কেবলমাত্র প্রথম তিনটি অধ্যায়ই অধুনা উপলব্ধ- একথা আগেই বলা হয়েছে। *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটির মতই *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থটিও কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এখানে প্রতিটি অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি পাদ এবং প্রত্যেক পাদের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি সূত্র। সূত্রগুলির উল্লেখের পূর্বে আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর বিষয়সূচিরও নির্দেশ করেছেন যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটির মতই *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থেও প্রতিটি অধায়ের নামকরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও আচার্য হলায়ুধভট্ট *বৈষ্ণবসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব* ও *শৈবসর্বস্ব* নামে আরও তিনটি সর্বস্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি অনুপলব্ধ। আচার্য রঘুনন্দন তাঁর

*স্মৃতিতত্ত্ব* গ্রন্থে *শৈবসর্বস্ব* ও *পণ্ডিতসর্বস্ব* গ্রন্থ দুটির উল্লেখ করেছেন।[১২] গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হল-

## ২.৪. *পণ্ডিতসর্বস্ব* :

এই গ্রন্থটি বর্তমানে অপ্রকাশিত। তবে শুধুমাত্র গ্রন্থনামের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থখানি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধ কর্তৃক রচিত বলে জানা যায়। আচার্য রঘুনন্দনের *স্মৃতিতত্ত্বে পণ্ডিতসর্বস্বের* নাম উদ্ধৃত হয়েছে। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের স্টেট মিউজিয়ামে হলায়ুধের *পণ্ডিতসর্বস্বের* সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি রয়েছে এবং একই শিরোনামে অর্থাৎ *পণ্ডিতসর্বস্ব* নামে একটি অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনা পাওয়া যায়। [১৩] মিথিলার পাণ্ডুলিপির ক্যাটালগে হলায়ুধরচিত *প্রায়শ্চিত্তসর্বস্বের* ১৪৫ ফোলিয়োতে একটি পাণ্ডুলিপির বিবরণ পাওয়া যায়। পাণ্ডুলিপিটিতে নির্দেশ রয়েছে যে, গ্রন্থটির রচয়িতা ও *পণ্ডিতসর্বস্বের* রচয়িতা একই ব্যক্তি। এর পুষ্পিকায় উল্লেখ রয়েছে– "ইতি পণ্ডিতসর্বস্বং পুস্তকং পাদোনং সমাপ্তম্।"[১৪]

## ২.৫. *শিবসর্বস্ব* বা *শৈবসর্বস্ব* :

এই গ্রন্থটিও অনুপলব্ধ। তবে শুধুমাত্র গ্রন্থটির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থখানি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধকর্তৃক রচিত। আচার্য রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বে[১৫] *শিবসর্বস্বের* নাম উদ্ধৃত হয়েছে।

---

[১২] M. M. Chakravarti, p. 329.

[১৩] Descriptive Catalogue of Manuscripts in Mithila, Vol.I, P. 325. No.283.

[১৪] Ibit.

[১৫] M. M. Chakravarti, p. 329.

## ২.৬. *বৈষ্ণবসর্বস্ব* :

এই গ্রন্থটিও অনুপলব্ধ। তবে শুধুমাত্র নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থখানি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধ রচনা করেছেন বলে জানা যায়। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যার অবসরে আচার্য হলায়ুধভট্ট মন্তব্য করেছেন যে বিষ্ণুর উপাসনায় একই সূক্তের প্রয়োগ তাঁর লেখা *বৈষ্ণবসর্বস্বে* বিশদভাবে আলোচিত একটি বিষয়। সেখানে তিনি বলেছেন – "এষা যদ্যপি বৈষ্ণবসর্বস্ব এব তৎ তৎ বিশেষেণ প্রতিপাদিতা তথাপি পুরুষসূক্তস্য আকারপ্রসঙ্গাদেতর্দীয়মাহাত্ম্যং পুনরিহাপি কিঞ্চিৎ অভিধীয়তে।"[১৬]

## ২.৭. *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* :

হলায়ুধের সারস্বতকৃতিসমূহের মধ্যে *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনী* ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। প্রাচীনতম ছন্দঃশাস্ত্র হিসাবে পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্র*-কেই গণ্য করা হয়। তবে এই গ্রন্থের রচয়িতার কাল সম্পর্কে কোনওরকম তথ্য পাওয়া যায় না। একথা উল্লেখ্য যে এখানে বৈদিক ছন্দের পাশাপাশি লৌকিক ছন্দেরও আলোচনা দেখা যায়। তবে উক্ত গ্রন্থটিকে বেদাঙ্গ হিসেবেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি সূত্রাত্মক হওয়ায় সংক্ষিপ্ত এবং সহজ ও সরল। এই গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম সূত্র পর্যন্ত বৈদিক ছন্দের লক্ষণ প্রদত্ত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টম সূত্র থেকে অষ্টম অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত সমস্ত সূত্রেই লৌকিক ছন্দের বর্ণনা রয়েছে। এই গ্রন্থের হলায়ুধকৃত '*মৃতসঞ্জীবনী*' ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই বৃত্তিতেই '*পাঙ্কল ত্রিভুজে*'র বর্ণনা পাওয়া যায়। হলায়ুধভট্ট তাঁর বৃত্তির নাম দিয়েছেন *মৃতসঞ্জীবনী*। বৃত্তিটি

---

[১৬] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ১৩২

প্রতিপাদনের দিক থেকেও অসাধারণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। *ছন্দঃসূত্রের* অন্যান্য ব্যাখ্যা থেকে এর গুরুত্ব অধিক। কারণ, পরবর্তীকালের অনেক ছন্দঃশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থেই এই ব্যাখ্যার প্রভাব লক্ষণীয়।

পিঙ্গলের সূত্রগুলির ব্যাখ্যা ও উদাহরণ ছাড়া অর্থবোধ শ্রমসাধ্য। ছন্দঃশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থরূপে হলায়ুধ প্রণীত *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*কেই ধরা হয়। এই *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তিটি হলায়ুধবৃত্তি* নামেও পরিচিত। এই গ্রন্থটি পৃথকরূপে কোনও লিখিত পুস্তক নয়। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় গ্রন্থের অর্থাববোধনের নিমিত্ত। আচার্য হলায়ুধভট্ট সেই দায়িত্ব গুরুত্বসহকারে পালন করেছেন। তাই তিনি ছন্দঃশাস্ত্রের মূল গ্রন্থের রচয়িতা নন, তিনি এই গ্রন্থের একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকারমাত্র।

## ২.৮. *কর্মোপদেশিনী* :

*ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, হলায়ুধভট্ট কোনও পদ্ধতিবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেননি। কিন্তু *কর্মোপদেশিনী* নামে একখানি পদ্ধতি-গ্রন্থ হলায়ুধের নামে প্রচলিত রয়েছে। গ্রন্থটির আরম্ভ হয়েছে এইরূপে-

"দৃষ্ট্বা পারস্করং সূত্রং স্মৃতিমালোক্য সর্ব্বশঃ।
ব্যাসস্য বচনং দৃষ্ট্বা মুনীনাং সংহিতাং তথা।
যুক্ত্যা চ স্বয়মালোক্য বৃদ্ধানাং সর্বসম্মতা।
হলায়ুধেন রচিতা সম্যক্ কর্ম্মোপদেশিনী"।।[১৭]

এই গ্রন্থে সামগ্রিকভাবে কর্মোপদেশের বর্ণনা আছে। এখানে উল্লেখনীয় বিষয় এই যে এই গ্রন্থে প্রকরণের শেষে হলায়ুধ নিজের কোনও পরিচয় প্রদান করেননি।

[১৭] গৌ. কা., শ্রী শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ (সম্পা.), পৃ. ২৯৪

অথচ *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যার আরম্ভে বা শেষে আত্মপরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। যথা-

আরম্ভে– "হলায়ুধেন গৌড়েন্দ্রধর্মাগারাধিকারিণা।

এতৎ পুরুষসূক্তস্য ব্যাখ্যানং প্রতিপাদ্যতে।।"[১৮]

শেষে- "ইত্যাবসথিক-ধর্ম্মাধ্যক্ষ-শ্রীহলায়ুধকৃতৌ ব্রাহ্মণসর্বস্বে সহস্রশীর্ষা ব্যাখ্যা।।"[১৯]

কারও কারও মতে *কর্মোপদেশিনী ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থেরই ভিন্ন একটি নাম।[২০]

## ২.৯. *দুর্গোত্সববিবেক* :

আচার্য হলায়ুধ রচিত অপর একটি গ্রন্থের নাম হল *দুর্গোত্সববিবেক*। *গৌড়কাহিনী*তে আলোচ্য গ্রন্থটির শুধুমাত্র নামই উল্লিখিত হয়েছে।[২১] গ্রন্থটির বিষয়ে বিস্তৃত কোনও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি।

## ২.১০. *মত্স্যসূক্ততন্ত্র/মত্স্যসূত্র* :

*মত্স্যসূক্ততন্ত্র* বা *মত্স্যসূত্র* হলায়ুধের একটি তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুরই উল্লেখ পাওয়া যায় শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষের *গৌড়কাহিনী*গ্রন্থে।[22] কিন্তু কোন হলায়ুধ কর্তৃক গ্রন্থটি রচিত তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। হলায়ুধের এই গ্রন্থে শৈবতান্ত্রিকতার সঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার

---

[১৮] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., প্রতিটি বিষয়ের মন্ত্রব্যাখ্যার প্রারম্ভে দৃষ্ট।

[১৯] তদেব., প্রতিটি বিষয়ের মন্ত্রব্যাখ্যার অন্তিমে দৃষ্ট।

[২০] স. সা. বা. দা., পৃ. ১৪১

[২১] গৌ. কা., শ্রী শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ (সম্পা.), পৃ. ২৯৪

[২২] তদেব

সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানা যায়। সেই সঙ্গে জানা যায়- এখানে প্রজ্ঞাপারমিতার স্তবও স্থানলাভ করেছে। আবার স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণে কথিত আচার ও বারব্রত প্রভৃতির নিয়মাবলী এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও এখানে নানাবিধ পানাভ্যাস ও পানরসের বর্ণনা পরিবেশিত হয়েছে বলে জানা যায়।

## ২.১১. *দ্বিজনয়ন* :

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর *Notices of Sanskrit Manascript* গ্রন্থে *দ্বিজনয়ন* নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[২৩] *Notices of Sanskrit Manascript* গ্রন্থে অনেক পুঁথির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে *দ্বিজনয়নের* বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই তথ্য অনুযায়ী, এর পুঁথিটি দেশীয় হলুদ কাগজে তৈরি, ফোলিও সংখ্যা ৯৯টি এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৬টি করে শ্লোক এবং সর্বসমেত ১৬৯২টি শ্লোক রয়েছে। এই পুঁথিটি কৃষ্ণনগর সরকারি গ্রন্থাগারে রয়েছে বলে জানা যায়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল– একটি রাশি থেকে অন্য একটি রাশিতে সূর্যের উত্তরণের সঠিক সময় নির্ধারণের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রীয় নিয়মাবলী। এখানে মানবজীবনের নানাবিধ আচরণীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মুহূর্তনির্ণয় করা হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এই *দ্বিজনয়ন* গ্রন্থটি একটি জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক রচনা।

## ২.১২. *সেক-শুভোদয়া* :

*সেক-শুভোদয়া* সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত একটি চম্পূকাব্য। এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে হলায়ুধমিশ্রের নাম জানা যায়। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধই যদি এই গ্রন্থখানির রচয়িতা হন, তবে এই গ্রন্থের রচনাকাল খ্রিস্টীয় দ্বাদশ

[২৩] Notices of Sanskrit Mss., vol. II, 66.

শতকের সমাপ্তি বা ত্রয়োদশ শতকের সূচনালগ্ন হওয়ার কথা। কিন্তু গ্রন্থখানির বিষয়, চরিত্র, ঘটনা, ভাষা ও অন্যান্য দিকগুলি বিবেচনা করে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, গ্রন্থখানির রচনাকাল কোনওভাবেই খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী নয়। সুতরাং এই হলায়ুধমিশ্র লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ওঠা স্বাভাবিক। কেউ কেউ মনে করেন, কোনও মুসলমান লেখক হলায়ুধমিশ্র ছদ্মনামে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। *সেক-শুভোদয়ার* সংস্কৃত ভাষা অশুদ্ধ ও দুর্বল হওয়ায় তা কোনও রাজকবির রচনা হতে পারে না। এই গ্রন্থের আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল- এখানে অনেক আরবি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এই কারণেই মনে করা হয় যে, গ্রন্থখানির লেখক ছিলেন কোনও একজন ইসলামধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। এই গ্রন্থে মোট ২৫টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে আবার এক বা একাধিক গল্প রয়েছে। *সেক-শুভোদয়া* গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল- এখানে বাংলা ভাষায় একটি বাক্য, দুটি গীত ও পাঁচটি ছড়াজাতীয় শ্লোক রয়েছে। তবে এই গ্রন্থের ভাষায় মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যাবলী থাকলেও গ্রন্থটি খুব বেশি প্রাচীন নয়। মধ্যযুগের সাহিত্যে *সেক-শুভোদয়া* একটি আশ্চর্যজনক গ্রন্থ। এটি বর্তমান যুগের পাঠক-গবেষকদের কাছে একাধারে কৌতূহলোদ্দীপক ও বিস্ময়কর।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে মালদহের জেলা প্রশাসক উমেশচন্দ্র বটব্যাল মালদহের প্রবীণ সাহিত্যিক হরিদাস পালিতের কাছ থেকে সংবাদ পান যে, গৌড়ের বাইশ হাজারী মসজিদের মাতোয়ালীর কাছে কাগজে লেখা একটি প্রাচীন পুঁথি আছে। সেই পুঁথি কোনও সংকট-আপদে পাঠ করে বিপন্মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা হয়। বটব্যাল মহাশয় মূল পুঁথি এবং পুঁথির একটি নকল সংগ্রহ করেন। পালিত মশাইও এই পুঁথিটির একটি প্রতিলিপি সংগ্রহ করে রাখেন। পরে বটব্যাল মহাশয়ের মৃত্যুর পর ওই প্রতিলিপি ও মূল পুঁথির আর সন্ধান পাওয়া যায় না। শেষে পালিত মহাশয়ের প্রতিলিপি

অবলম্বনে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ডঃ সুকুমার সেন পুঁথিটির একটি সম্পাদিত নতুন সংস্করণ মুদ্রিত করেন। তার আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু কায়স্থ পত্রিকায় ১৩২০-১৩২১ বঙ্গাব্দে বঙ্গানুবাদ সহ ১৩টি পরিচ্ছেদ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে গ্রন্থটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই *সেক-শুভোদয়া* গ্রন্থটির সরল গদ্যে একটি বঙ্গানুবাদও প্রকাশ করেছেন।

এই পুঁথির প্রতি পরিচ্ছেদের পুষ্পিকায় বঙ্গদেশের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি আচার্য হলায়ুধমিশ্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতে যেরূপে ইচ্ছাকৃতভাবে অশুদ্ধ সংস্কৃত ব্যবহার করা হয়েছে তাতে সকলেই মনে করেন যে গ্রন্থকারের নামটি প্রকৃত নয়। কোনও সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ মুসলমান লেখক হলায়ুধভট্টের নামে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের নির্দেশে টোডরমল্ল এখানকার জমি জরিপ করতে আসেন। তখন মসজিদ ও তৎসংলগ্ন জমি-জমাতে লক্ষ্মণসেনের সময়কাল থেকে ভোগ দখলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য।

আগেই বলা হয়েছে গদ্য-পদ্যের মিশ্রণে *সেক-শুভোদয়া* একটি সংস্কৃত চম্পুকাব্য। এর সহজ ও কবিত্বপূর্ণ পদ্যের মধ্যে গদ্যের ভাগই বেশি। এখানে কিছু কিছু বাংলা ছড়া ও আর্যা গীতের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। কাহিনির দিক থেকে এতে কোনও নিরবচ্ছিন্ন গল্প পাওয়া যায় না। এখানে প্রত্যেক অধ্যায়ে একাধিক গল্প রয়েছে। এতে জালালুদ্দিন তাব্রিজি নামে এক অলৌকিক শক্তিধর সেকের রাজা লক্ষ্মণসেনের

সভায় উপস্থিত হয়ে নানা আজগুবি ঘটনা ও আচরণ-এর দ্বারা সকলের বিস্ময়-বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা উৎপাদন ও রাজার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। অনেক গাল-গল্প ও অশুদ্ধ সংস্কৃতের প্রয়োগ থাকলেও সেকালের বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল তা জানতে হলে এই গ্রন্থটি থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। সাহিত্য সমালোচক ও ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিতে এই পুঁথির রচনাকাল কিছুতেই ১৬শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়।

এই গল্পের ভাষাকে খিঁচুড়িভাষা বলা যেতে পারে (ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় যা Dog Sanskrit)।[২৪] ব্যাকরণকে পীড়ন করে অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে ভাষা ব্যবহার করেও একটি গ্রন্থ যে কীভাবে সসম্মানে দীর্ঘকাল বেঁচে আছে তার বিরল দৃষ্টান্ত হল এই গ্রন্থটি। লেখক অনেক সময় বাংলা বাক্য প্রয়োগ বা বাগ্‌ধারাকে যেন বাংলায় চিন্তা করে নিয়ে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করেছেন। যেমন 'ত্বম্ অস্মাকং গৃহকথাং ন জানাসি' এর বাংলা অর্থ হল – তুমি আমার বাড়ির কথা জান না। 'স পশ্যতি না পশ্যতি' এর বাংলা অর্থ হল – সে দেখতে না দেখতেই। ''ত্বম্ বক্ত্রে ভস্ম দত্তম্''- এর বাংলা অর্থ হল – তোর মুখে ছাই ইত্যাদি।

গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল ১১৭৮-৭৯ থেকে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক বাংলার এক বিশেষ সময়। এই সময় তুর্কি আক্রমণ, ধর্মান্তরকরণের জোয়ার, ক্রমবর্ধমান সামাজিক অবক্ষয় – ইত্যাদি সব ঘটনার মধ্যেই লক্ষ্মণসেনের রাজসভা আলো করে রয়েছেন নবরত্ন। এই নবরত্নের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি জয়দেব। কবি জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের

[২৪] সে. শু., সুকুমার সেন (সম্পা.), ভূমিকাংশ

মূলধারার শেষ গরিমাময় রচনা। এর অনেক কাল পরের রচনা হল *সেক-শুভোদয়া*। এটি সংস্কৃত সাহিত্যের মূল ধারার বাইরে এক অদ্ভুত কথাসাহিত্য শ্রেণীর রচনা।

বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সহাবস্থানের সর্বপ্রথম চিত্র এই গ্রন্থটিতেই ধরা পড়ে। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেনের মতে এই গ্রন্থের রচনাকাল ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি,[২৫] যা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের সমসাময়িক। তাঁদের মতে এই গ্রন্থটি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধের রচনা হতে পারে না, কারণ তিনি ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* প্রভৃতি গুরুগম্ভীর শাস্ত্র এবং মীমাংসা ও ধর্মশাস্ত্র শ্রেণীর গ্রন্থের রচয়িতা। কিন্তু *সেক-শুভোদয়া* গ্রন্থটি রচিত হয়েছে তথাকথিত অশুদ্ধ সংস্কৃতে, যা সুকুমার সেনের মতে ডগ সংস্কৃত। অনেক জায়গায় মনে হয় যেন বাংলা ভাষাকেই অনুস্বার বিসর্গ লাগিয়ে সংস্কৃতের ব্যবহারিকরূপ দেওয়া হয়েছে। যেমন– 'কশ্চিৎ চিল্লঃ ছুয়িং দত্তবান। তবুও দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের গবেষকগণ এই গ্রন্থটিকে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের রচনা বলেই গ্রহণের পক্ষপাতী। তাঁর মতে, হলায়ুধের মূল রচনার উপরে পরবর্তী সময়ের মূর্খ পুঁথিলেখকেরা লেখনী চালিয়ে ভাষার এই অশুদ্ধি ঘটিয়েছে। ইতিহাসবিদ সুখময় মুখোপাধ্যায়ও *সেক-শুভোদয়া*কে জাল বই আখ্যা দিয়েছেন। তিনি *সেক-শুভোদয়া*র কাহিনিকে ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে মনে করেন না। কিন্তু শুধু ভাষাগত কারণেই নয়, এই ২৭ অধ্যায়বিশিষ্ট কাহিনিমালার চমৎকারিত্ব অন্যত্র। এই গ্রন্থের নামকরণই এর বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত বহন করে। এর কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে এক মুসলমান সাধু বা সেকের বঙ্গদেশে শুভাগমন। এই গ্রন্থের অন্তর্গত

---

[২৫] সে. শু., সুকুমার সেন (সম্পা.), ভূমিকাংশ

কাহিনিগুলির নায়ক হলেন শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজি। তিনি ছিলেন একজন সুফি পির। রাজা লক্ষ্মণসেন ছিলেন তাঁরই অনুগত।

ইতিহাস অবশ্য লক্ষ্মণসেনের মুসলমান বিরোধিতার সাক্ষ্য দেয়। তাই এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে পণ্ডিতেরা বরাবরই সন্দিহান। কিন্তু তা হলেও এই গ্রন্থে উল্লিখিত কাহিনিগুলি, যেগুলি আসলে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রচলিত জনপ্রিয় লোককথা, সেগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজমানসের যে প্রতিফলন ঘটেছে তার সত্যতা সর্বদাই সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে, তখন গৌড়ের অধিপতি ছিলেন লক্ষ্মণসেন। কথিত আছে, মাত্র ১৮জন সেনা নিয়ে বখতিয়ার খলজি গৌড়ের রাজপ্রাসাদ দখল করেন। সেই সময় বঙ্গেশ্বর পালিয়ে যান দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে। তাঁর উত্তরসূরিরা সেই অঞ্চলটুকুরই রাজা হয়ে পরবর্তী দুই পুরুষ পর্যন্ত কোনও মতে কাটিয়ে যান। *সেক-শুভোদয়ার* নায়ক শেখ তাব্রিজি তুর্কি আক্রমণের বেশ কিছুটা আগেই এসে পৌঁছেছিলেন বাংলার মাটিতে। সুফি সাধকদের সর্বপ্রাচীন জীবনী সংকলন 'সিযার আল-আফ্রিন'-এ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ইরানের তাব্রিজ প্রদেশে জন্মে সুফিধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত জালালউদ্দিন তাব্রিজি যুবক বয়সে বাগদাদে যান। সেখানেই সাত বছর শেখ শিহাব আল-দিন সুহরাবর্দিকে গুরু হিসাবে পান। সুহরাবর্দিরই নির্দেশে তাব্রিজি ভারতে সুফিধর্ম প্রচার করতে আসেন প্রথমে দিল্লিতে। দিল্লিতে তিক্ত অভিজ্ঞতা হওয়ায় তাব্রিজি আরও পূর্বে যাত্রা করে লখনউ ও পরে সেখান থেকে বাংলার রাজধানী গৌড়ে এসে উপনীত হন। সেখানে দেবমহল বর্তমানে যাকে দেওতলা বলা হয় সেই স্থানে সুফিদের একটি তাকিয়া নির্মাণ করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মালদহের

পাণ্ডুযা অঞ্চলে অধুনা বড়িদরগা বলে পরিচিত বাইশ হাজারি দরগাটি শেখ তাব্রিজির মূল উপাসনাকেন্দ্র হিসাবে স্থাপিত হয় লক্ষ্মণসেনের সমকালেই। সেখানকার লক্ষ্মণসেনী দালান এখনও তার সাক্ষ্য বহন করে। এই দরগায় সযত্নে রক্ষিত থাকত হলায়ুধমিশ্র রচিত *সেক-শুভোদয়ার* একমাত্র পুঁথিটি। এই পুঁথিটিকেই সকলে বলত পুঁথি মুবারক। বিশেষ বিশেষ পুণ্যতিথিতে অথবা বিপত্তির সময়ে সেটি বার করে পাঠ করা হত। মানুষের বিশ্বাস ছিল এই গ্রন্থপাঠে নাকি সকল বিপদ কেটে যায়।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে যখন উমেশচন্দ্র বটব্যাল মালদহ জেলার কালেকটর ছিলেন, সেই সময় তাঁর দৃষ্টিগোচরে এই পুঁথিটি পড়ে। সেটির জীর্ণ দশা দেখে বটব্যাল মহাশয় স্থানীয় বিদগ্ধ পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও হরিদাস পালিতকে দিয়ে এই পুঁথিটির একটি প্রতিলিপি তৈরি করান। এর কিছু সময় পরেই উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় মালদহ জেলা থেকে বদলি হয়ে যান। সেই সময় তিনি এই পুঁথিটি এবং তাঁর নকল করা কপিটিও নিয়ে যান। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে উমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে এই দুটি কপির কোনওটিরই আর হদিস মেলেনি। তখন শ্রী হরিদাস পালিতের কাছে থাকা একটি অসম্পূর্ণ কপি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিদ সুকুমার সেনের হস্তগত হয় এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনিই এটিকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন, যা পরবর্তী সময়ে ইংরেজি অনুবাদ সহ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। অবশ্য ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে মালদহের বাইশ হাজারি ওয়াকফ এস্টেট প্রায় ষোলো বছরের চেষ্টায় *সেক-শুভোদয়া* নামে এই গ্রন্থের একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন, যার ভূমিকাটি লিখেছিলেন মতিলাল দাস ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে। এই গ্রন্থেরই ভূমিকাংশে মতিলাল দাস বলেছেন, এই গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি নাকি ওয়াকফ এস্টেটের মোতিয়ালিদের

নিকট সংরক্ষিত ছিল, যার সম্পাদনা ও সংস্কার করেন ইতিহাসের অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বঙ্গানুবাদ করেন পণ্ডিত রামচন্দ্র কাব্যবেদান্ততীর্থ।

## ২.১৩. *কবিরহস্য* :

আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত একটি কাব্য হল *কবিরহস্য*। এই গ্রন্থে ২৭৪টি শ্লোকের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থের রচয়িতা বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ নন। *কবিরহস্যের* কবি হলায়ুধের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট সম্রাট তৃতীয় কৃষ্ণ। রাষ্ট্রকূটরা ভারতীয় উপমহাদেশের একটি রাজবংশ ছিল। এই রাজবংশ ভারতবর্ষের বিন্ধ্যপর্বতমালার দক্ষিণে রাজত্ব করত। *কবিরহস্য* গ্রন্থেও 'দক্ষিণাপথ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৬] রাষ্ট্রকূট রাজবংশ ভারতীয় উপমহাদেশের বেশ কিছু অংশ জুড়ে সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। রাষ্ট্রকূট সম্রাট তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন এই হলায়ুধ। সুতরাং এই আচার্য হলায়ুধভট্টের স্থিতিকাল হিসাবে রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের রাজত্বকালকেই গণ্য করা যায়। সুতরাং তিনি ওই সময়ের মধ্যেই বর্তমান ছিলেন। *কবিরহস্যের* একটি শ্লোকে কবি হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন–

"অস্ত্যগস্ত্যমুনি জ্যোৎস্নাপবিত্রে দক্ষিণাপথে।

কৃষ্ণরাজ ইতি খ্যাত রাজা সাম্রাজ্য দীক্ষিতঃ।।[২৭]

---

[২৬] কবি., ৫

[২৭] তদেব

## ২.১৩.১. *কবিরহস্যের* কথাবস্তু :

*কবিরহস্য* গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের জীবন-ইতিহাস। ভারতীয় উপমহাদেশের একটি বিশাল রাজবংশ ছিল রাষ্ট্রকূটবংশ। তাঁরা ভারতবর্ষে অপরিসীম শক্তি ও ক্ষমতাবলে দীর্ঘকালব্যপী রাজত্ব করেছেন। অনেক সফল রাজাই এই রাষ্ট্রকূটবংশের পতাকা বহন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ, যিনি শিল্প ও সাহিত্যের গভীর অনুরাগী ছিলেন। তিনি হলায়ুধকে তাঁর রাজসভায় অত্যন্ত সম্মানজনক স্থান দিয়েছিলেন। তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কবি রাজার জীবন-ইতিহাস রচনা করেন। *কবিরহস্য* কাব্যের ২৭৪টি শ্লোকের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই কবি হলায়ুধ তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজার প্রশংসা করেছেন। কবি হলায়ুধ তাঁর রচনায় রাজার প্রশংসা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার করেছেন। কবির কাব্যের উপজীব্য বিষয়ের নির্বাচন যে অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত তা *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থ থেকে জানা যায় -"ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্।"[২৮] রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী সময়ের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজাদের জীবন-ইতিহাস বর্ণনাই এই গ্রন্থের মুখ্যবিষয়। অতএব, বিষয়গত দিক থেকে *কবিরহস্য* কাব্যটিকে ঐতিহাসিক কাব্য বলা যায়। এই গ্রন্থে তিনি ধাতুর লট্ ল-কারের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বিশদীকরণ করেছেন। এই *কবিরহস্য* গ্রন্থখানি রচনা করার জন্য আচার্য হলায়ুধভট্ট রাজা রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের প্রশংসাও লাভ করেছিলেন।

---

[২৮] সাহিত্য., বিশ্বনাথ, ৩.৩১.

আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে, কাব্য প্রধানত দুই প্রকার। যথা– শ্রব্যকাব্য (যা কেবলমাত্র শ্রবণযোগ্য), দৃশ্যকাব্য (যা দর্শন ও শ্রবণযোগ্য উভয়ই)।[২৯] এছাড়া আরও বিভিন্ন দিক থেকে কাব্যের মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। দৃশ্যকাব্যকেই বলা হয় রূপক।[৩০] এই রূপক আবার সংখ্যায় দশটি। যথা – নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন। শুধুমাত্র যে রূপকের বর্ণনাই রয়েছে এমনটা নয়, তার সঙ্গে আঠারোটি উপরূপকও রয়েছে। শ্রব্যকাব্যগুলি আবার গদ্যকাব্য, পদ্যকাব্য ও চম্পুকাব্য ভেদে তিন প্রকার। পদ্যকাব্যের মধ্যে রয়েছে মহাকাব্য, লঘুকাব্য ও খণ্ডকাব্য রয়েছে, গদ্যকাব্য রূপে কথা ও আখ্যায়িকা এবং চম্পুকাব্যও রয়েছে,যা কিনা মিশ্রকাব্য নামেও পরিচিত।

*কবিরহস্য* একটি লঘুকাব্য, যা শ্রব্যকাব্যের অন্তর্গত। এই গ্রন্থ শ্লোকাত্মক, তাই এটি একটি পদ্যকাব্য। এই গ্রন্থটি রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত। *কবিরহস্যের* একটি শ্লোকে কবি নিজের বাসস্থানের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন –

"অস্ত্যগস্ত্যমুনি জ্যোৎস্নাপবিত্রে দক্ষিণাপথে।

কৃষ্ণরাজ ইতি খ্যাত রাজা সাম্রাজ্য দীক্ষিতঃ"।।[৩১]

অপর একটি শ্লোকে গ্রন্থকার যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্যখানি নির্মাণ করেছেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় –

---

[২৯] সাহিত্য., বিশ্বনাথ, ৬.১.

[৩০] তদেব., ৬.২.

[৩১] কবি., শ্লোক ৫

"তোলযত্যতুল শক্ত্যা যো ভারং ভুবনেশ্বরঃ।

কস্ত তুলযতি স্থাম্না রাষ্ট্রকূটকূলোদ্বহম্"।।[৩২]

## ২.১৩.২. *কবিরহস্যের* নায়কবিচার :

কাব্যের ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হল নায়কবিচার। নায়ক বিষয়ে ভারতীয় আলঙ্কারিকদের ধারণা হল নায়ক হবেন কোনও দিব্য, অদিব্য বা দিব্যাদিব্য শ্রেণীর ব্যক্তি, ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন, সদ্বংশজাত কোনও ক্ষত্রিয় অথবা উচ্চবংশজাত কোনও নৃপতি। আলোচ্য *কবিরহস্য* গ্রন্থের নায়ক হলেন রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ। তাঁর কার্যকলাপ, বীরত্ব ইত্যাদির প্রশংসা এই কাব্যে নিপুণভাবে কবি তুলে ধরেছেন। সম্পুর্ণ কাব্যটি রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ক *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে নায়কের চারপ্রকার ভেদের কথা বলা হয়েছে– ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত। আচার্য হলায়ুধভট্ট রচিত *কবিরহস্য* গ্রন্থে প্রথম প্রকারের নায়কের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে ধীরোদাত্ত শ্রেণীর নায়কের লক্ষণ করেছেন–

"অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্ব।

স্থৈয়াত্রি গূঢমানো ধীরোদাত্তো ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ।।"[৩৩]

---

[৩২] কবি., শ্লোক ১৬৪

[৩৩] সাহিত্য., ৩.৩২

অর্থাৎ নিজের প্রশংসা থেকে সর্বদা বিমুখ, ক্ষমাবান্, অতিগম্ভীর, আনন্দ ও দুঃখে স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, শান্তপ্রকৃতিযুক্ত, নিরভিমান, সত্যে সর্বদা অবিচল- এইরূপ গুণসম্পন্ন নায়ককে ধীরোদাত্ত নায়ক বলা হয়। আলোচ্য *কবিরহস্য* গ্রন্থের নায়ক রাষ্ট্রকূট সম্রাট তৃতীয় কৃষ্ণ ধীরোদাত্ত শ্রেণীর নায়ক। এই কাব্যে তাঁকে উচ্চশ্রেণীর রাজা হিসাবে দেখা যায়। তাঁর নির্ভীকতা, বীরত্ব, সাহস ইত্যাদি গুণাবলী রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যত্রও প্রসারিত। উত্তম শাসক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা তাঁকে একজন সক্ষম রাজা হিসাবে চিত্রিত করতে সহযোগিতা করেছে। তাই রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে ধীরোদাত্ত শ্রেণীর নায়ক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

## ২.১৩.৩. *কবিরহস্যের* রসবিচার :

'রস' এর শব্দগত অর্থ হল আনন্দ। কাব্যপাঠ করার পর যে আনন্দের অনুভূতি হয় তাকেই রস বলা হয়। আচার্য ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে বলেছেন– 'রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ'[৩৪] অর্থাৎ যার আস্বাদন করা যায় তাই রস। সাহিত্যদর্পণকার আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন– 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'[৩৫] অর্থাৎ রসই কাব্যের আত্মা। *কবিরহস্য* কাব্যের ২৭৪টি শ্লোকের কোথাও রসের প্রাধান্য তেমনভাবে দেখা যায় না অর্থাৎ রস এই কাব্যে মুখ্যবিষয় হয়ে ওঠেনি। এই কাব্যের রচনার পশ্চাতে কবির মুখ্য উদ্দেশ্য যে কাব্য রচনা ছিল না তাও প্রমাণ হয়ে যায় তাঁর কাব্যে রসের অনুপস্থিতি দেখে। ব্যাকরণ শেখানোই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। তিনি চেয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন ধাতুর পরিচয় পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে, তাই কাব্যের রস এখানে

---

[৩৪] নাট্য., ৬.৩১

[৩৫] সাহিত্য., ১.৩

গৌণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু আচার্য হলায়ুধভট্ট রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের রাজসভায় ছিলেন, তাই তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাজার প্রশংসাও করেছেন। কবি তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে একদিকে রাজার প্রশংসা করেছিলেন এবং অন্যদিকে পাঠকদের কাছে সংস্কৃত ধাতুর ব্যবহারের প্রয়োগিক দিকগুলিও তুলে ধরেছেন। এই কাব্যের রস কোনও বিচারের যোগ্য বিষয় নয়। রসের অভিজ্ঞতার জন্য তিনি কখনই এই কাব্য রচনা করেননি। তিনি বরং ব্যাকরণ এবং ভাষায় ব্যবহৃত ধাতুগুলির ওপর মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন।

## ২.১৩.৪. *কবিরহস্যের* গুণবিচার :

আচার্য দণ্ডীর মতে গুণ হল কাব্যের আত্মা। এক বা একাধিক গুণের সমাবেশেই কাব্যের সৃষ্টি হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্মাঃ শৌর্যাদয় ইবাত্মনঃ।"[৩৬] কাব্যে যেমনভাবে রস আত্মস্বরূপ, তেমনভাবে কাব্যে গুণেরও অভাব নেই। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসাদ, ওজঃ, মাধুর্য – প্রধানত এই তিন ধরনের গুণ রয়েছে, আর এই তিনটি গুণই সর্বদা রসের সঙ্গে সম্পর্কিত। কবিরহস্য কাব্যটি প্রসাদগুণ শৈলীতে রচিত। সাধারণত বিপুল পরিমাণ যৌগিক শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত খুব জটিল বাক্যের ব্যবহার না থাকাই হল প্রসাদ গুণের বৈশিষ্ট্য। আর এই ধরনের বৈশিষ্ট্যাবলী এই কবিরহস্য কাব্যে দেখা যায়। এর ভিত্তিতেই মতামত প্রতিষ্ঠা করা যায় যে, এই কবিরহস্য কাব্যটি প্রসাদগুণযুক্ত।

---

[৩৬] কাব্য., ৮.৬৬

## ২.১৩.৪. *কবিরহস্যের* ছন্দোবিচার :

ছন্দ হল কাব্যের সৌন্দর্যবিধায়ক একটি স্বতঃস্ফূর্ত নির্মাণকৌশল। আহ্লাদার্থক ‘চন্দ্’ বা আচ্ছাদনার্থক ‘ছদ্’ ধাতু থেকে ছন্দ শব্দটির নিষ্পত্তি হয়েছে। সুতরাং যা চিত্তকে আহ্লাদিত করে তাই হল ‘ছন্দ’। *কবিরহস্য* নামক এই শ্রব্যকাব্যটি বিভিন্ন ছন্দের সমন্বয়ে রচিত। কবি হলায়ুধ তাঁর কাব্যরচনায় বিভিন্ন রকমের ছন্দের ব্যবহার করেছেন। যথা – অনুষ্টুপ্, মন্দাক্রান্তা, উপজাতি, বসন্ততিলক ইত্যাদি। এই কাব্যে ছন্দের এই বিভিন্নতা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এই গ্রন্থের গুরুত্ব গুণগত দিক থেকে কতটা উৎকর্ষবিধায়ক। *কবিরহস্যে* ব্যবহৃত কতিপয় ছন্দের উদাহরণ–

“কোপাদসৌ শপতি ভৃত্যজনং ন কংচিৎ
প্রাপ্তাপরাধমপি শয্যতি ন প্রভুত্বাৎ।
কালপ্রিযায শপতে যতরস্য হেতৌ-
স্তঙ্কার্যমাশ্রু কুরুতে কুরুতুল্যতেজাঃ”।।[৩৭]

এই শ্লোকে ত, ভ, জ, জ, গুরু, গুরু ক্রমে মোট ১৪টি অক্ষর রয়েছে। সুতরাং শ্লোকটিতে বসন্ততিলক ছন্দ হয়েছে। যতি বিষয়ে কোনও স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় এই শ্লোকটির পাদান্তে যতি হয়েছে।

“অজ্ঞাননিদ্রানিবিড়োপগুঢ়ে রাজন্যকে বেদযতে য একঃ।

সুখানি যো বেদযতে সদৈব স্বার্থ প্রজা যত্র নিবেদযন্তে”।।[৩৮]

---

[৩৭] কবি., শ্লোক. ৭৭

[৩৮] তদেব., শ্লোক- ৮০

এই শ্লোকে ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের মিলিতরূপে উপজাতি ছন্দ হয়েছে। শ্লোকটির প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ত, ত, জ, গুরু, গুরু ক্রমে ইন্দ্রবজ্রা এবং তৃতীয় ও চতুর্থপাদে জ, ত, জ, গুরু, গুরু ক্রমে উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দ হয়েছে।

## ২.১৩.৫. *কবিরহস্যের* অলঙ্কারবিচার :

আচার্য ভামহের মতে অলঙ্কারই কাব্যের মূল। অলঙ্কারের যথাযথ ব্যবহারেই বাক্য কাব্যময় হয়ে ওঠে। অলঙ্কার না থাকলে কাব্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি হয় না। সাহিত্যদর্পণকার আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ অলংকার বিষয়ে বলেছেন– 'অলঙ্কারাঃ কটক-কুণ্ডলাদিবৎ'।[৩৯] তিনি নারীদেহের সৌন্দর্যবিধায়ক কটক-কুণ্ডলাদির সঙ্গে কাব্যের অলঙ্কারকে তুলনা করে বলেছেন – অনুপ্রাস, উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আচার্য বামনও বলেছেন – 'সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ'।[৪০] *কবিরহস্য* কাব্যের সর্বত্রই দেখা যায় অনুপ্রাস অলঙ্কারের সুন্দর প্রয়োগ। প্রায় প্রতিটি শ্লোকে অনুপ্রাস অলঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। একই বর্ণের পুনরাবৃত্তিকেই বলা হয় অনুপ্রাস[41]। বাল্মীকি, কালিদাস, ব্যাস, ভাস প্রমুখ খ্যাতিমান কবিগণ তাঁদের নিজ নিজ রচনায় অনুপ্রাস অলঙ্কারের সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। অলঙ্কার প্রধানত কাব্যের উৎকর্ষ বিধান করে থাকে। একজন নারী যেমন নিজেকে অলঙ্কৃত করার জন্য বিভিন্ন অলঙ্কার পরেন তেমনিভাবে একজন কবি তাঁর কাব্যকে সুন্দর করার জন্য অলঙ্কারের আশ্রয় নেন। আচার্য ভামহ প্রণীত *কাব্যালংকার* গ্রন্থে বলা হয়েছে–"কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান প্রচক্ষতে।"[42] এই

---

[৩৯] সাহিত্য., ১.৫

[৪০] কাব্যালং., ১.১.২

[৪১] অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপিস্বরস্য যৎ। সাহিত্য., ১০.৩

[৪২] কাব্যালং., ২.১.

অলঙ্কার আবার তিন রকমের হয়ে থাকে। যথা – শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার এবং উভয়ালঙ্কার। যে অলঙ্কার শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত তা শব্দালঙ্কার, যে অলঙ্কার অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত তা অর্থালঙ্কার আর যে অলঙ্কার শব্দ ও অর্থ উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত তা উভয়ালঙ্কার নামে পরিচিত। *কবিরহস্য* গ্রন্থে সর্বাপেক্ষা অনুপ্রাস অলঙ্কারের প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে একটি নির্দিষ্ট শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা কাব্যটিকে অধিক সুন্দর করে তুলতে শব্দচমৎকৃতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। একটি নির্দিষ্ট শ্লোকে অনুপ্রাসের ব্যবহারে শ্লোকটি মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। আর এই অলঙ্কারের উপরেই কাব্যের উৎকর্ষ ও গুণগতমান নির্ভর করে। উদাহরণ :

"গাথাং গ্রাথযতি গ্রথত্যবিরতং শ্লোকাংশ্চ লোকোত্তরান
গদ্যং গ্রন্থযতি স্ফুটার্থললিতং যো নাটকং গ্রন্থতি।
গ্রন্থাতি শ্রুতিশাস্ত্রযোর্বিবরণং গ্রন্থাননেকাংশ্চ যঃ
স্বচ্ছং যস্য মনঃ স্বভাবসরলং ন গ্রন্থতে কুত্রচিৎ"।।[৪৩]

*কবিরহস্যে* একটি নির্দিষ্ট বর্ণের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে শব্দচমৎকৃতি বা অনুপ্রাসের সৃষ্টি করা হয়েছে। শ্লোকের প্রতিটি ছত্রে 'গ' বর্ণ ব্যবহারের দ্বারা কাব্যের উৎকর্ষ প্রদান করা হয়েছে। এই শ্লোকের প্রথম 'গ' বর্ণের দ্বারা গাথাং, গ্রাথযতি, গ্রথতি, গদ্যং, গ্রন্থযতি– এগুলির দ্বারা শব্দচমৎকৃতি তৈরি করা হয়েছে। *কবিরহস্য* গ্রন্থে সম্পূর্ণ শব্দেরও পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে সম্পূর্ণ শব্দেরই শব্দচমৎকৃতির জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। উদাহরণ :

"একার্থা একশব্দাশ্চ ভিন্নার্থা একবাচকাঃ।

---

[৪৩] কবি., শ্লোক- ১৫

তুল্যার্থাস্তুল্যশব্দাশ্চ নানার্থাঃ সদৃশাক্ষরঃ"।।[৪৪]

এই শ্লোকে 'এক' শব্দটির প্রথম চরণে তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে আবার তুল্য শব্দটির শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে দু'বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এই শ্লোকে দেখা যাচ্ছে শব্দের প্রথম এবং দ্বিতীয় চরণে একই শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার।

*কবিরহস্যে* ব্যবহৃত অপর একটি অলঙ্কার হল উপমা। এই উপমা অলঙ্কারকে সংস্কৃত সাহিত্যের বেশির ভাগ কবি তাঁদের গ্রন্থরচনায় ব্যবহার করেছেন। উপমা হল একটি অর্থালঙ্কার। *কবিরহস্য* গ্রন্থে উপমা অলঙ্কারের উদাহরণ :

"যো ভুজাভ্যাং ভুবো ভারং ভরতে ভরতোপমঃ।

বিভর্তি চ যশোরাশিং ভুযাসং যস্য ভূরপি"।।[৪৫]

আলোচ্য শ্লোকে উপমার আশ্রয় নিয়ে কবি হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে ভরত নামক এক সক্ষম রাজার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

"ভাসতে ভাস্কর ইব প্রতাপাতিশযেনন যঃ।

ভাসযত্যধিকং লক্ষ্ম্যা পুরন্দর ইবাপরঃ"।।[৪৬]

---

[৪৪] কবি., শ্লোক- ৪

[৪৫] তদেব., শ্লোক- ২১৫.

[৪৬] তদেব., শ্লোক- ২২৯

আচার্য হলায়ুধ তাঁর রচিত *কবিরহস্য* গ্রন্থে রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে সূর্যের মতো উজ্জ্বল বলে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে ভগবান ইন্দ্র হিসাবেও বর্ণনা করেছেন।

"মৃগেন্দ্রমিব যং দৃষ্ট্বা সংকুটন্তি দ্বিষঙ্ঘটাঃ।

যঃ কুট্টযতি তৎকুম্ভিকটান্কুম্ভৈর্নখৈরিব"।।[৪৭]

এছাড়াও আচার্য হলায়ুধ রাষ্ট্রকূটরাজ রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন- অন্য প্রাণীরা যেমন তাঁদের সামনে বাঘ দেখে ভয় পায়, ঠিক তেমনিভাবে শত্রুরাও রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়।

*কবিরহস্যে* বর্ণিত রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ এমন একজন রাজা ছিলেন, যাঁর যোগ্যতা এবং বীরত্ব *কবিরহস্যে* বর্ণিত বিভিন্ন উদাহরণে দেখা যায়। কবি রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে রামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন- ভগবান রাম ছিলেন রাজা, যিনি সত্য ও ধর্মের পথে চলেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ সত্য ও ধর্মের পথগামী ছিলেন। আচার্য হলায়ুধ আরও বর্ণনা করেছেন যে, রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ অত্যন্ত বিনয়ী এবং সর্বদা বিভিন্ন দানাদি কর্মে লিপ্ত ছিলেন। এছাড়া আরও অনেক অলঙ্কারের ব্যবহার স্বল্প পরিমাণে এই গ্রন্থে রয়েছে। আচার্য হলায়ুধের বর্ণনা অনুযায়ী রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি সোমযাগের অনুষ্ঠান করেছিলেন। *কবিরহস্য* গ্রন্থে বলা হয়েছে -

"সোমং সুনোতি যজ্ঞেষু সোমবশবিভূষণঃ।

---

[৪৭] কবি., শ্লোক- ২৩১

পুরঃ সুবতি সংগ্রামে স্যন্দনং স্বযমেব যঃ"।।[৪৮]

রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ অশ্বমেধযজ্ঞও করেছিলেন। কবি হলায়ুধ তাঁর *কবিরহস্য* গ্রন্থে তাই বলেছেন–

"অশ্নাতি যঃ পুরোডাশমশ্বমেধে মহাক্রতো।

অশ্নুতে ফলমক্ষয্যং শ্রিযা শক্র ইবাসতি"।।[৪৯]

এছাড়া আচার্য হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে কবিবল্লভ বলে বর্ণনা করেছেন। এটি ছিল রাষ্ট্রকূটের রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে দেওয়া উপাধি।

"কশ্চিন্ন কৌতি করণৌরূপপীড্যমানস্তস্য প্রজাসু কুর্বতে ন চ তস্করেণ।

কাব্যানি যশ্চ কবতে কবিবল্লভোঽসৌ তং পূজযত্যভিমতৈর্বিভবৈরজস্রম্"।।[৫০]

## ২.১৩.৬. শাস্ত্রকাব্যরূপে *কবিরহস্য* :

কাব্য বিচারে *কবিরহস্য* হল একটি লঘুকাব্য। তবে এই গ্রন্থটি আবার শাস্ত্রকাব্য শ্রেণীরও অন্তর্ভুক্ত। এই কাব্যটি রচনার পশ্চাতে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল কাব্যের মধ্য দিয়ে ধাতুর ব্যবহার বা ব্যাকরণ বর্ণনা – একথা পূর্বেও বলা হয়েছে। শাস্ত্রকাব্য হল কাব্যের একটি সাধারণ প্রকারবিশেষ, যা কাব্যরূপে অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। যখন একটি কাব্য ব্যাকরণের নিয়ম অথবা অন্যান্য শাস্ত্রীয় জ্ঞানের জন্য বা

---

[৪৮] কবি., শ্লোক- ১৮১

[৪৯] তদেব., শ্লোক- ১১৪

[৫০] তদেব., শ্লোক- ৭১

শাস্ত্রীয় জ্ঞানকে আরও সরলীকৃত করার জন্য রচিত হয়, তখন তাকে শাস্ত্রকাব্য বলা হয়। আচার্য রামচন্দ্র মিশ্র তাই বলেছেন– "ব্যাকরণসম্বন্ধিপদপ্রযোগনিযমানাং জ্ঞানাযান্যশাস্ত্রীযজ্ঞানসৌলভ্যায চ যানি কাব্যানি প্রণীতানি তানি শাস্ত্রকাব্যান্যুচ্যন্তে।।[৫১] শাস্ত্রকাব্য কাব্যের এমন এক শ্রেণী, যা একই সঙ্গে শাস্ত্র ও কাব্য উভয়কেই সমৃদ্ধ করে তোলে।

'বালানাং সুখবোধায' শাস্ত্র তরুণ শিক্ষার্থীদের নিকট মূল্যবান শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রদানার্থে ব্যবহৃত হয়। এই ধরণের কাব্য নবীন শিক্ষার্থীদের মুক্তচিন্তনে কাব্য শিক্ষণের সহায়ক হয়। এই শ্রেণীর কাব্য যে শাস্ত্রকে কেবল সরল করে তোলে তাই নয়, বরং বিনোদনেরও উপযোগীও করে তোলে। কারণ, এগুলি দ্বৈত উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর। এই শাস্ত্রকাব্যগুলি একটি গৌণবিষয়ও উপস্থাপন করে থাকে এবং শাস্ত্রের পরিভাষা ও তথ্য ইত্যাদির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই ধরণের কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তাছাড়া এই ধরণের কাব্য গ্রন্থকর্তাদের প্রতিভার কথাও জ্ঞাপন করে থাকে। এজাতীয় রচনা খুবই প্রশংসিত হয় কিন্তু কবিই আসল প্রশংসা পাবার যোগ্য। এই ধরনের কাব্য কবির কাব্যপ্রতিভার পাশাপাশি শাস্ত্রপারদর্শিতার কথাও ব্যক্ত করে থাকে। কবির এই বহুমাত্রিক জ্ঞান এই ধরনের কাব্যসৃষ্টির পথকে উন্মোচিত করে তোলে।

সংস্কৃত সাহিত্যে বেশ অল্পকয়েকটিই শাস্ত্রকাব্য পাওয়া যায়। *কবিরহস্য* এমনই একটি শাস্ত্রকাব্য। এই *কবিরহস্য* কাব্য *ভট্টিকাব্য* নামক শাস্ত্রকাব্যের অনুকরণে রচিত। এখানে কবি হলায়ুধ কাব্যে বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার চিত্রিত করেছেন। এর পাশাপাশি

---

[৫১] সংস্কৃতসাহিত্যেতিহাসঃ, আচার্য রামচন্দ্র মিশ্র সম্পাদিত, পৃ. ৭১.

ভাষায় বিদ্যমান সমস্ত ধাতুর ব্যবহারের দ্বারা তিনি রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের প্রশংসাও করেছেন। হলায়ুধ যেহেতু রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন তাই তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজার বর্ণনা দিতে বেছে নিয়েছেন এই *কবিরহস্য* কাব্যকে। এই কাব্যের সমস্ত শ্লোক রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের প্রতি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা সহ বিভিন্ন ধাতুর উদাহরণে পরিপূর্ণ। এই কাব্যটিই তাঁকে রাষ্ট্রকূট সাম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের রাজসভায় থাকা নিশ্চিত করে। *কবিরহস্য* কাব্যে প্রদত্ত সমস্ত দৃষ্টান্ত কবির পৃষ্ঠপোষকের ব্যক্তিত্বকে উন্নত করার লক্ষ্যেই প্রযুক্ত হয়েছিল।

## ২.১৩.৭. ভারতের ইতিহাসে *কবিরহস্যের* অবদান :

হলায়ুধ রচিত গ্রন্থ *কবিরহস্য* কাব্যটি রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের প্রশংসাসূচক কাব্য। ভারতীয় উপমহাদেশে সপ্তম শতক থেকে দশম শতক পর্যন্ত রাষ্ট্রকূট রাজবংশ শাসন করেছিল। এই রাষ্ট্রকূট বংশের শাসন বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই গ্রন্থে দক্ষিণাপথ শব্দের মাধ্যমেই তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়।

"অস্ত্যগস্ত্যমুনিজ্যোৎস্নাপবিত্রে দক্ষিণাপথে।

কৃষ্ণরাজ ইতি খ্যাতো রাজা সাম্রাজ্যদীক্ষিতঃ"।।[৫২]

রাষ্ট্রকূট রাজারা বাতাপির চালুক্যদের পরাজিত করে শাসন ক্ষমতায় আসীন হন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ এ. এস. আলটেকর এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকরাও রাষ্ট্রকূটকে একটি স্থানের উপাধির নাম হিসাবে বর্ণনা করেন, গোত্র বা রাজবংশ হিসাবে নয়। তাঁদের মতে রাষ্ট্রকূটরা ছিলেন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা। বলা হয়েছে রাষ্ট্রস্য অর্থাৎ প্রান্তস্য কূটঃ

[৫২] কবি., শ্লোক- ৬

অর্থাৎ প্রধানঃ।[৫৩] রাষ্ট্রকূট রাজাকে রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে দেখা গিয়েছে। রাজত্বকে রাষ্ট্র হিসাবে অনেক ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। যেহেতু গ্রামের প্রধান হিসাবে গ্রামকূট থাকতেন ঠিক তেমনি রাজ্যের প্রধানকে রাষ্ট্রকূট বলা হত। রাষ্ট্রকূট নামের এই কর্মকর্তারা একত্রিত হয়ে ১৫টি বংশ বা রাজবংশ গঠন করেছিলেন।[৫৪]

এই কবিরহস্য গ্রন্থে যে রাজার প্রশংসা করা হয়েছে তাঁর বংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-

"তোলযত্যতুল শক্ত্যা যো ভারং ভুবনেশ্বরঃ।
কস্ত তুলযতি স্থাম্না রাষ্ট্রকূটকুলোদ্বহম।।[৫৫]

এই দুটি শ্লোকের মাধ্যমে বোঝা যায় যে গ্রন্থটি রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে আশ্রয় করে লেখা। তবে এই রাজবংশে কৃষ্ণ নামে তিনজন রাজা ছিলেন। তিনি আসলে কোন রাজা কৃষ্ণকে নিয়ে এই কাব্য রচনা করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেননি। রাষ্ট্রকূট বংশকে নিয়ে গবেষণা করা একজন ঐতিহাসিক ডঃ আলটেকরের মতে, তিনজন কৃষ্ণের মধ্যে রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের একজন সুদক্ষ ও পরিশ্রমী শাসক। তাই রাজা তৃতীয় কৃষ্ণই ছিলেন *কবিরহস্য* গ্রন্থের নায়ক তথা হলায়ুধ বর্ণিত রাষ্ট্রকূট বংশের প্রকৃত শাসক।[৫৬]

---

[৫৩] প্রা. ভা. কা ই. ত. সং., কৃষ্ণ চন্দ্র শ্রীবাস্তব সম্পাদিত, পৃ. ৬৮৪

[৫৪] তদেব

[৫৫] কবি., শ্লোক- ১৬৪

[৫৬] R. T. T. Ed. A. S. Altekar, 123

রাজা তৃতীয় কৃষ্ণই এই রাজবংশের একজন দক্ষ রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী রাজা। তিনি তাঁর ইচ্ছা ও শক্তির মাধ্যমে তাঁর সীমানা বিস্তৃত করেছিলেন। এই গ্রন্থে তাঁর শাসনপ্রণালীর সমস্ত উল্লেখই পাওয়া যায়। তাছাড়া এই গ্রন্থের ২৭৪টি শ্লোকে আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর রাজার ধর্মবিষয়ক প্রশংসাও করেছেন। যেহেতু আচার্য হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট রাজসভার কবি ছিলেন, তাই তিনি রাজার অনুগত গ্রহণকারী হিসেবে তাঁর প্রশংসাও করেছিলেন। তিনি রাজার কাছ থেকে খ্যাতি এবং অনেক অর্থও পেয়েছিলেন। তাই তিনি এই কাব্যে তাঁর বংশাবলী, তাঁর চরিত্রাবলী সম্পর্কিত প্রশংসাসূচক শ্লোকের দ্বারা গুণকীর্তন করে কিছুটা ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করেছেন। সর্বোপরি, তিনি এই কাব্যে রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের জীবন ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন।

## ২.১৩.৮. সংস্কৃত ব্যাকরণে *কবিরহস্যের* অবদান :

*কবিরহস্য* কাব্যকে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থবিশেষ হিসাবেও গণ্য করা হয়। হলায়ুধের *কবিরহস্য* রচনার মূল উদ্দেশ্য হল সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধাতুরূপের উপস্থাপনা। আচার্য হলায়ুধভট্টের এই গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত ধাতুর তালিকা পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে *কবিরহস্য* গ্রন্থটি দ্বৈত ভূমিকা পালনে সফলও হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে এক সুবিশাল শব্দভাণ্ডার, তার মধ্যে কয়েকটিই মাত্র ধাতু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ কিছু ধাতু ভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কিছু ধাতু এমন রয়েছে যেগুলি খুব একটা বেশি ব্যবহার করা হয় না। এই *কবিরহস্য* কাব্যটিতেই

একমাত্র সমস্ত ধাতুগুলিকে একত্রিত করা হয়েছে। এই কাব্যে বেশ কয়েকটি নতুন ধাতুর ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।

বিস্তৃত শব্দভাণ্ডারের কারণে প্রতিটি ক্রিয়ার দু-একটি পরিবর্তন রয়েছে। কিন্তু অভ্যাসগত এবং অন্যান্য অনুরূপ কারণগুলির জন্য একই ধাতুর পুনঃ পুনঃ ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত ধাতুগুলির ব্যবহারই গ্রন্থের শব্দভাণ্ডারকে বর্ধিত এবং কথোপকথনকে উন্নততর করে তোলে। এটি এই কাব্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া এই গ্রন্থকে ধাতুকোষ নামেও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ, এই গ্রন্থে সংস্কৃত সমগ্র ধাতুর সংগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধাতুকোষ ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ধাতু বা ক্রিয়া হল বাক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাক্য গঠনে এই ক্রিয়াগুলি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বিদ্যমান থাকে।

ধাতু শব্দটি ধা ধাতুর সঙ্গে তিঙ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়। এই ধাতুকোষে ধাতুর উল্লেখের পাশাপাশি ধাতুগুলির অর্থও উল্লিখিত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে এই ধাতুগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বৈয়াকরণরা তাঁদের গ্রন্থের শেষে নিজ নিজ ধাতুপাঠ উপস্থাপন করে থাকেন।

ক্রিয়ার মূল রূপকে সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতু বলে। সংস্কৃত ভাষায় নতুন শব্দ গঠন করতে ধাতুগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত ধাতুগুলির সাহায্যে প্রায় সমস্ত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। সংস্কৃত ব্যাকরণ পরম্পরায় ৫টি পাঠ পদ্ধতি বিদ্যমান। সেগুলি হল – ১. সূত্রপাঠ ২. ধাতুপাঠ ৩. গণপাঠ ৪. উণাদিপাঠ এবং ৫. লিঙ্গানুশাসন।

ধাতুপাঠ সংস্কৃত ব্যাকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি এই ধাতু থেকেই সিদ্ধ। প্রায় সব ব্যাকরণবিদই তাঁদের গ্রন্থের শেষে নিজ নিজ ধাতুপাঠ দিয়েছেন। পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক তাঁর রচিত *ব্যাকরণ শাস্ত্র কা ইতিহাস* গ্রন্থে প্রায় ২৬ জন ব্যাকরণবিদের পরম্পরা তুলে ধরেছেন। তবে তাঁদের রচিত সেই সমস্ত গ্রন্থগুলি অধুনা অনুপলব্ধ।

পাণিনি সংস্কৃত ভাষার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁর রচিত *অষ্টাধ্যায়ী* সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য এই *অষ্টাধ্যায়ী* গ্রন্থখানি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য ব্যাকরণ। তাছাড়া পাণিনির পূর্বে বা পরে অনেক ব্যাকরণবিদ ছিলেন যাঁরা ধাতুপাঠের উল্লেখ করেছেন। পাণিনিও তাঁর গ্রন্থের শেষে ধাতুপাঠের উল্লেখ করেছেন। ভাষার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ভিত্তি করে ব্যাকরণের উপর। তাই ভাষায় নতুন শব্দ এবং ক্রিয়াপদ তৈরির জন্য ধাতুপাঠগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিয়ার এই মূলরূপ অর্থাৎ ধাতুকে প্রত্যয়যুক্ত করে নতুন শব্দ গঠন করা হয়ে থাকে। এগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নের জন্য অপরিহার্য। এই হল ভাষায় ধাতু বা ধাতুপাঠের গুরুত্ব। এই ধাতু বাক্যের অর্থাৎ ভাষার ভিত্তি গঠন করে থাকে।

## ২.১৩.৯. সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর গুরুত্ব :

ধাতুগুলি বাক্যগঠনে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ এবং কৌশল আছে। কিন্তু সব ভাষাই ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। এই ধাতুগুলি হল ক্রিয়ার মূলরূপ। ক্রিয়া সৃষ্টি ধাতুর ব্যবহারের সঙ্গে সরাসরি সমানুপাতিক। বিষয়বস্তু এবং ক্রিয়া একটি বাক্যগঠনের জন্য বাধ্যতামূলক। যে কোনও ভাষাতে এটাই সকলের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ক্রিয়া ছাড়া কোনও বাক্য সম্পূর্ণ হয় না। ধাতুর

গুরুত্ব কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই নয়, অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও একই। একজন ব্যক্তির যেমন এই পৃথিবীতে শ্বাস নিতে অর্থাৎ বেঁচে থাকতে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তেমনই ভাষার বিকাশের জন্য একটি ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এই ক্রিয়াগুলি যে কোনও ভাষার ক্ষেত্রেই অক্সিজেন বা প্রাণস্বরূপ এবং এই ক্রিয়াগুলি তাঁদের আসল রূপ অর্থাৎ ধাতু থেকে উদ্ভূত। ক্রিয়া নিজেই ধাতুর গুরুত্বের কথা বলে থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ করে এই ধাতুগুলির সাহায্যে সমস্ত শব্দ গঠন করা হয়ে থাকে। শুধু ক্রিয়া নয়, বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম হিসাবেও শব্দগুলি ধাতু থেকে উদ্ভূত। ধাতু ছাড়া ভাষা সমৃদ্ধ ও বিকশিত হতে পারে না, তাই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধাতুপাঠ একটি আবশ্যিক বিষয়। সংস্কৃতের প্রতিটি শব্দ ধাতু থেকেই উদ্ভূত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কৃ ধাতু করণে, যার অর্থ করণ এবং এর দ্বারা করোতি ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়। এই ধাতুটি আবার একইভাবে কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়াপদগুলিও গঠন করে থাকে। সুতরাং এই ধাতুগুলি কেবল ক্রিয়াপদই নয়, বিশেষ্য-বিশেষণ ইত্যাদিও গঠন করে থাকে। রমতি ক্রিয়াপদটি রম্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। আবার এই ধাতু থেকে রাম শব্দটিও নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। এটি একটি বিশেষ্যপদ বা নামপদ।

## ২.১৩.১০. ধাতুকোষরূপে *কবিরহস্যের* গুরুত্ব :

*কবিরহস্য* হল একটি ধাতুকোষ। এই গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত ধাতুর তালিকা প্রস্তুত করে। এই গ্রন্থে রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের প্রশংসা করার সময় কবি দক্ষতার সঙ্গে এই ধাতুগুলির ব্যবহার করেছেন। এটি একটি ধাতুকোষ হলেও অন্যান্য ধাতুকোষের পরম্পরা থেকে অনেকাংশেই আলাদা। কারণ এই গ্রন্থে রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের জীবনচরিত বর্ণিত হয়েছে, যিনি আচার্য হলায়ুধের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

*কবিরহস্য* গ্রন্থটি দুটি স্তরে বিভক্ত। এখানে ব্যবহৃত ধাতুগুলি সুন্দরভাবে সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হয়। এই দুটি স্তর হল – ১. একই শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া ধাতুগুলি একটি শ্লোকে রাখা। ২. একই অর্থ দিয়ে শুরু হওয়া ধাতুগুলি একটি শ্লোকে রাখা। আচার্য হলায়ুধ কেবল একই শব্দের সঙ্গে ধাতুর ব্যবহার করেননি বরং তিনি সচেতনভাবে একই অর্থের সঙ্গে ধাতুকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন। *কবিরহস্যের* চতুর্থ শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে-"একার্থাঃ সমশব্দাশ্চ নিবধ্যন্তেঽত্র ধাতবঃ"।[৫৭] এর অর্থ হল- একই শব্দের ধাতু এবং একই অর্থের ধাতু এখানে একই শ্লোকে রাখা হয়েছে। তাছাড়া চতুর্থ শ্লোকের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে– "ধাতুপারাযণাম্ভোধি-পারোত্তীর্ণধিয়া ময়া"।[৫৮] উদাহরণ–

"ধূনোতিচম্পকবনানি ধুনোত্যশোকং

চূত ধুনোতি ধুবতি স্ফুটিতাতিমুক্তম্

বাযুর্বিধূনযতি কেসরপুষ্পরেণূ-

ন্যৎকাননে ধবতি চন্দনমঞ্জরীশ্চ।।"[৫৯]

এই শ্লোকে ধূনোতি শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া ধাতুর ব্যবহার করা হয়। এই শ্লোকে ব্যবহৃত ধাতুগুলি হল – ধূনোতি, ধুনাতি, ধুবতি, ধূনযতি এবং ধবতি। এখানে ব্যবহৃত

---

[৫৭] কবি., শ্লোক- ৪

[৫৮] তদেব., শ্লোক- ৪

[৫৯] তদেব., শ্লোক- ৮

ধাতুগুলির অর্থ সরানো এবং সেগুলি গ্রন্থে একই শব্দ দিয়ে শুরু হয়। যেমন– ধ-কার। আরও কয়েকটি উদাহরণ হল-

"মৃষযতি ন নৃপাণাং মৃষ্যতে নোদ্ধতানা-

মনুচিতমণুমাত্রং ন দ্বিষা মর্ষতে যঃ।

অপি গুরুমপরাধ মর্ষতি ব্রাহ্মণানাং

সিতবসনভৃতাং যো মর্ষযত্যাগমজ্ঞঃ।।"[৬০]

এই শ্লোকে 'ম' অক্ষর দিয়ে শুরু হওয়া ধাতুর ব্যবহার রয়েছে। যার অর্থ হল– ক্ষমা করা। এখানে ব্যবহৃত ধাতুগুলি হল- মৃষযতি, মৃষ্যতে, মর্ষতি এবং মর্ষযতি। সুতরাং এগুলি হল ধাতু যার অর্থ হল ক্ষমা করা এবং তারা একই শব্দ অর্থাৎ মকার দিয়ে শুরু হয়েছে।

অন্য একটি শ্লোকে 'ক' শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া ধাতুর ব্যবহার করা হয়েছে। শ্লোকটি হল–

"কশ্চিন্ন কৌতি করণৌরূপপীড্যমানস্তস্য প্রজাসু কুর্বতে ন চ তস্করেণ।

কাব্যানি যশ্চ কবতে কবিবল্লভোঽসৌ তং পূজযত্যভিমতৈর্বিভবৈরজস্রম্"।।[৬১]

---

[৬০] কবি., শ্লোক- ১৫

[৬১] তদেব., শ্লোক- ৭১

এখানে ব্যবহৃত ধাতুগুলি হল– কৌতি, কুবতে, কবতে। এই সমস্ত ধাতুগুলির অর্থ রচনা করা এবং তারা একই শব্দ অর্থাৎ ক দিয়ে শুরু হয়েছে।

অপর একটি উদাহরণ হল-

"লভতে যো বিপক্ষেভ্যো জযলক্ষ্মীং মহাহবে।

লাভযন্তি নৃপাস্তাশ্চ যতো মৃত্বা বরস্ত্রিযঃ"।।[৬২]

এই শ্লোকে 'ল'-কার দিয়ে শুরু হওয়া ধাতুর ব্যবহার করা হয়েছে। ধাতুগুলি হল- লভতে এবং লাভযতি। এই ধাতুগুলির অর্থ হল প্রাপ্ত করা এবং এগুলি একই বর্ণ ল-কার দিয়ে শুরু হয়েছে।

একটু ভিন্ন ধরনের একটি উদাহরণ দেওয়া হল-

"খণ্ডতে বাদিনাং দর্পং মুণ্ডং খণ্ডযতি দ্বিষাম্

ভূষযন্তি গুণাঃ সর্বে যো গুণানেব ভূষতি"।।[৬৩]

এই শ্লোকে দুটি ভিন্ন ধাতুর ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম পঙ্ক্তিটিতে খণ্ড ক্রিয়ার ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হল – ভাঙা এবং দ্বিতীয় পঙক্তিটিতে ভূষ্ ধাতুর ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হল – সাজানোর জন্য।

---

[৬২] কবি., শ্লোক- ২৪৩

[৬৩] তদেব., শ্লোক- ২৯৭

*কবিরহস্য* গ্রন্থ থেকে এই সমস্ত আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল যা সুন্দরভাবে এই ধাতুগুলির শৈল্পিক ব্যবহারকে একই ধ্বনি দিয়ে শুরু করে এমনকি একই অর্থ প্রস্তাব করে-

"বিলীনযতি সংস্পৃষ্টং নবনীতং যশোশ্মণা।

বিলালযতি চিত্তং চ তথা স্ত্রীণাং যদীক্ষণাৎ"।।[৬৪]

সুতরাং কবিরহস্য গ্রন্থটি হল একটি ধাতুকোষ। এই গ্রন্থের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল- এই গ্রন্থে শুধুমাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতুর তালিকাই প্রদর্শিত হয়নি তার সঙ্গে উদাহরণও প্রদর্শিত হয়েছে, যা কবির প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই গ্রন্থটি কাব্যের মধ্যে একটি ধাতু অভিধান বা ধাতুকোষ।

আচার্য হলায়ুধের সমকালীন আচার্যদের মতে, ধাতুগুলির কোনও একঘেয়ে তালিকা এই গ্রন্থে দেওয়া হয়নি। এই ধরণের বৈশিষ্ট্যই *কবিরহস্য* গ্রন্থটিকে কোষকাব্যধারার অন্যান্য গ্রন্থ থেকে পৃথক করে তোলে। ধাতুর সূচী ও একই সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার দেখানো হয়েছে এই কাব্যে। এটি কবিরহস্য গ্রন্থের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃত সাহিত্যে এই ধরনের রচনা খুবই বিরল অর্থাৎ দেখা যায় না বললেই চলে। সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বিশেষ করে সংস্কৃত ব্যাকরণে এই গ্রন্থ রচনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

---

[৬৪] কবি., শ্লোক- ২০৪

## ২.১৩.১১. *কবিরহস্য* গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী :

এই গ্রন্থে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের ব্যবহার অন্যান্য ছন্দের অপেক্ষায় বেশি লক্ষ করা যায়। এছাড়াও শার্দূলবিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা, উপজাতি, রথোদ্ধতা, উপেন্দ্রবজ্রা, বসন্ততিলক প্রভৃতি ছন্দের প্রয়োগ এই গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধ অত্যন্ত সুনিপুণভাবে করেছেন।

হলায়ুধের *কবিরহস্য* গ্রন্থ ছন্দোবদ্ধ একটি কাব্য। এই গ্রন্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের পাশাপাশি রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের জীবনচরিতের বর্ণনাও পাওয়া যায় অর্থাৎ এটি একটি ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবেও পরিগণিত হয়। আবার এই গ্রন্থটি একটি আভিধানিক গ্রন্থ হিসেবেও পরিচিত।

*কবিরহস্য* ছন্দোবদ্ধ কাব্য যেখানে ২৭৪টি ছন্দোবদ্ধ পদ্যের সমাবেশ রয়েছে। শ্লোকগুলিতে শার্দূলবিক্রীড়িত, উপজাতি, স্রগ্ধরা ইত্যাদি ছন্দের ব্যবহার রয়েছে। এই গ্রন্থটির ভাষা অত্যন্ত সহজ ও সরল। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল – রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের প্রশংসা। এই গ্রন্থটি মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখানোর জন্যই রচিত হয়েছিল কিন্তু গ্রন্থটি কাব্য হিসাবেই বেশি পরিচিতি লাভ করে। কাব্যটির রস, গুণ, নায়কের উপর, বাক্যাবলীর উপর, ছন্দের উপর কবির দৃষ্টিনিক্ষেপ করা উচিত। তাছাড়াও প্রত্যেক কবির স্বতন্ত্র কাব্যশৈলী আছে। এই কয়েকটি বিষয় কবির রচনায় প্রতিফলিত হয়। *কবিরহস্য* কাব্যেও সেই বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তবে তা তাঁর নিজস্ব শৈলীতে। হলায়ুধ তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতারূপে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণেরই জীবনচিত্র এঁকেছেন। তিনি রাজা এবং তাঁর রাজকর্মকে বেশি মহিমান্বিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পৃষ্ঠপোষকের

প্রশংসা করার সময় তিনি সংস্কৃতভাষায় উপলব্ধ ধাতুর বিভিন্ন রূপের চিত্রিতকরণকেও বেছে নিয়েছিলেন। এটি কবির একটি ভালো প্রয়াস। কিন্তু হলায়ুধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধাতুর সূচী নির্মাণ করা, কাব্য রচনা করা নয়। তাঁর হৃদয়ের কাছেরও প্রিয় একটি বিষয় বেছে নিয়ে তিনি এই কাব্য রচনা করেছেন এবং ভাষার সমস্ত ধাতুকে এই গ্রন্থে সফলভাবে চিত্রিত করেছেন। এটাই কবি হলায়ুধের প্রতিভার অন্যান্য উদাহরণ। এই গুণটির কারণেই তিনি এই ধরনের কাব্য রচনাকারি অন্যান্য কবিদের থেকে আলাদা। এই ধরনের কাব্য রচনার জন্য বিশেষ দক্ষতার দরকার, যা আচার্য হলায়ুধের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষকের জীবনচরিত বর্ণনা করে একটি কাব্যে বিভিন্ন ধাতু বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে তার উদ্দেশ্যও সফলভাবে সাধন করেছেন। *কবিরহস্য* কাব্যের মূলে রয়েছে অভিধান। এইভাবে এই ধরনের কাব্য একই সঙ্গে দ্বৈত ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই ধরনের কাব্যকে শাস্ত্রকাব্য বলা হয়। কাব্যের এই বিশেষ প্রকার শ্রেণীটি কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যেই দেখা যায়। অন্য বিষয় বা শাস্ত্র শেখানোর জন্য লেখা একটি কাব্য হল শাস্ত্র কাব্য। আর এই ধরনের শাস্ত্রকাব্যের বিশেষ অলংকরণ বৈশিষ্ট্য *কবিরহস্য* কাব্যের মধ্যে লক্ষণীয়। তাছাড়া এই কাব্যের অধ্যয়নের মাধ্যমেই কাব্যের এই বিশেষ প্রকার শ্রেণীর অন্বেষণের জন্য অনুপ্রেরণা জাগাবে তরুণশিক্ষার্থীদের। তখন আরও বেশি করে এই ধরনের কাব্যচর্চায় অগ্রসর হতে দেখা যাবে।

এই গ্রন্থের আরেকটি দিক হল – এই কাব্যে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয়কৃষ্ণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রকূট রাজবংশ ষষ্ঠ থেকে দশম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের কিছু অংশ শাসন করেছিল। এই রাজবংশ দক্ষিণ ভারতের একটি শক্তিশালী রাজবংশ ছিল। এই গ্রন্থে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে।

রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ রাষ্ট্রকূট রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সফল এবং উচ্চাকাঙ্খী রাজাদের মধ্যে একজন। আচার্য হলায়ুধ ছিলেন তাঁর দরবারের একজন সভাকবি। আচার্য হলায়ুধ রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করেছিলেন। আচার্য হলায়ুধভট্ট ভারতবর্ষের বর্ণাঢ্য ইতিহাসে তাঁর পৃষ্ঠপোষককে অমর করে রেখেছেন। শুধু রাজা নয়, রাজার পাশাপাশি রাজবংশকেও মহিমান্বিত করেছেন। আচার্য হলায়ুধ তাঁর *কবিরহস্য* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ অশ্বমেধ ও সোমযজ্ঞ করেছিলেন। বৈদিক সাহিত্যে এই দুটি যজ্ঞ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তাই রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ যেহেতু এই যজ্ঞ করেছিলেন সুতরাং তিনি একজন গুণাধারী ব্যক্তি ছিলেন- এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

আচার্য হলায়ুধ রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে ভগবান রাম ও ইন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি রাজা তৃতীয় কৃষ্ণকে রাষ্ট্রকূট বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, আচার্য হলায়ুধ তৃতীয় কৃষ্ণকে অনেক সাহস ও বীরত্বের অধিকারী সম্রাট হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় ফুঁটে উঠেছে রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের অসীম বীরত্ব। তাই এই সাহিত্য গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে ভারতের ইতিহাসে।

## ২.১৩.১২. রহস্য শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ :

গ্রন্থের শিরোনাম দেখে অনেকেরই ধারণা হতে পারে যে, এই গ্রন্থের সঙ্গে কবির সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু এখানে রহস্য পদটি থাকায় তা গ্রন্থের সঙ্গেই সম্পর্ককে সূচীত করেছে। এটি কবিদের নিকট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়।

মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ* অনুসারে কবিরা যখন কাব্য রচনা করেন, তখন তাঁদের উচিত সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। যার দ্বারা তাদের শব্দভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। একজন কবি যখন কাব্য রচনা করতে শুরু করে তখন তিনি তাঁর কৃতিকে আরও সূক্ষ্ম এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ করার জন্য একটি ভালো শব্দভাণ্ডার তৈরি করতে সমর্থ হন। এই ধরনের ধাতুকোষ তাই উচ্চাকাঙ্খীদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। একেই বলা হয় কবিশিক্ষা। এটাই এই ধরনের কাব্য লেখার রহস্য। নতুন কাব্য রচনা করতে আগ্রহী কবিদের জন্য এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা অত্যন্ত আবশ্যক। রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের প্রশংসা করার সময় হলায়ুধ এই গ্রন্থে সংস্কৃত ধাতুগুলির ব্যবহার করেছেন। যার দ্বারা এই গ্রন্থটি ধাতুকোষে পরিণত হয়েছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই গ্রন্থটি এককভাবে সাহিত্য, ব্যাকরণ, অভিধান এবং ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত- এটাই এই গ্রন্থের রহস্য। গ্রন্থটির শিরোনাম সম্পর্কে এমনটাই মনে করা যেতে পারে।

এই গ্রন্থের রচয়িতা হলায়ুধ ছিলেন রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি। এই গ্রন্থেই রাজবংশের নাম ও রাজার নামের উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রকূটবংশটি ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দি পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে শাসনকারী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ছিল।

রাষ্ট্রকূটরাজাদের আমলে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। চম্পূকাব্যশৈলীতে কাব্য রচনা এই সময়কালেই প্রথম হয়েছিল। ত্রিবিক্রমভট্টের *নলচম্পূ* চম্পূশৈলীতে রচিত একটি কাব্য। মহাবীরাচার্য রচিত *গণিতসারসংগ্রহ* এই সময়েই রচিত।

সুতরাং এই লেখাটি যদি সর্বসমক্ষে আনা হয়, তাহলে তা কবি হলায়ুধেরই উজ্জ্বল কৃতির সাক্ষী হতে মানুষকে সাহায্য করবে।

## ২.১৪. *অভিধানরত্নমালা (হলায়ুধকোষ)* :

হলায়ুধরচিত একটি কোষগ্রন্থ হল- *অভিধানরত্নমালা* যা *হলায়ুধকোষ* নামেই অধিক পরিচিত। এই গ্রন্থের মধ্যে পাঁচটি কাণ্ড রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম চারটি কাণ্ডে পর্যায়বাচী শব্দ ও শেষ কাণ্ডে অনেকার্থবাচী শব্দের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি কোষশাস্ত্রের প্রাচীন আচার্যদেরও নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন- বররুচি, অমরদত্ত, ভাগুরি প্রমুখ। এই গ্রন্থে অমরকোষের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত কোষকাব্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই গ্রন্থটির প্রকৃত নাম হল- *অভিধানরত্নমালা*। কিন্তু এই গ্রন্থটির এতই জনপ্রিয়তা ছিল যে, সরাসরি লেখকের নাম অনুসারেই গ্রন্থখানি পরিচিতি লাভ করেছে।

### ২.১৪.১. *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি :

*অভিধানরত্নমালা* হল ছোট পরিসরের একটি কোষগ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রায় ৯০০টি শ্লোক রয়েছে এবং এই গ্রন্থটিকে ৫টি কাণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। *অভিধানরত্নমালার* দ্বিতীয় শ্লোকে আচার্য হলায়ুধ এই গ্রন্থের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভাগুরি ও অমরদত্ত কর্তৃক গ্রন্থগুলি রচিত হওয়ার পর আচার্য হলায়ুধ কবিদের সহযোগী *অভিধানরত্নমালা* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। শব্দভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হওয়া একজন কবির মৌলিক প্রয়োজন। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই আচার্য হলায়ুধ শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় শব্দগুলির সংকলন করার চেষ্টা করেছেন তাঁর রচিত *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থটিতে। এর জন্য তাঁকে পূর্ববর্তী কোষগ্রন্থগুলির ওপর যেমন বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়েছে তেমনি প্রযুক্তিগত মূল্যের শর্তাবলীর ওপরও বিশেষ যত্নবান হতে হয়েছে। তাই

তাঁর রচিত অভিধান বা কোষগ্রন্থ সংক্ষিপ্ত এবং অন্যান্য কোষগ্রন্থের অপেক্ষায় স্বল্প প্রশস্ত।

এই গ্রন্থের পাঁচটি কাণ্ডের নাম হল- স্বর্গকাণ্ড, ভূমিকাণ্ড, পাতালকাণ্ড, সামান্যকাণ্ড ও অনেকার্থকাণ্ড। এখানে প্রতি কাণ্ডে বর্ণিত নামগুলির বিষয় সংক্ষেপে দেওয়া হল-

**ক. স্বর্গকাণ্ড** – এই অধ্যায়ে স্বর্গ, বৈদিক দেবতা, দানব, গ্রহ, পক্ষ ইত্যাদির নাম রয়েছে।

**খ. ভূমিকাণ্ড** - এই অধ্যায়ে প্রাকৃতিক উপাদান, গাছ, গাছপালা, প্রাণী, অস্ত্র ইত্যাদির নাম বর্ণনা করা হয়েছে।

**গ. পাতালকাণ্ড** – এই অধ্যায়ে জলাশয়, সামুদ্রিক প্রাণী, নদী ইত্যাদির নাম বর্ণিত হয়েছে।

**ঘ. সামান্যকাণ্ড** – এই অধ্যায়ে প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষের আবেগ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**ঙ. অনেকার্থকাণ্ড** – এই অধ্যায়ে সমার্থক শব্দসমূহ সংগৃহীত হয়েছে।

## ২.১৪.২. *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থের রচনাশৈলী :

আচার্য হলায়ুধের রচনাশৈলী খুবই সহজ ও সরল। তিনি *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থে উদাহরণ হিসেবে একটি শব্দেরই উল্লেখ করেছেন এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দের অন্তর্ভুক্তি থেকে বিরত থেকেছেন। এই বৈশিষ্ট্যটিই তাঁর গ্রন্থকে অসাধারণত্ব প্রদান করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তিনি ব্রহ্মার প্রতিশব্দ উল্লেখ করতে গিয়ে

চারমুখী ঈশ্বর শব্দটিরও উল্লেখ করেছেন।[৬৫] তিনি শুধু পদ্মভূঃ শব্দটির উল্লেখ করেছেন, বাকি শব্দ যেমন- কমলাভূঃ ইত্যাদি শব্দাবলিকে আলোচনার বহির্ভাগেই রেখেছেন। এই সহজ-সরলতার প্রয়োজনসিদ্ধি এবং পাঠকের সৃজনশীলতার সুযোগপ্রাপ্তির জন্য হলায়ুধের কোষগ্রন্থ কোষকাব্যের জগতে এক অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে নেয়। তবে এর মানে এমন নয় যে, আচার্য হলায়ুধ অযত্নে এই শব্দগুলিকে বাদ দিয়েছেন। বরং তিন সেই সময় সেগুলির উল্লেখ করা অর্থহীন বলে মনে করেছিলেন। তিনি স্পষ্টতই তাঁর গ্রন্থের মধ্যে শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাননি, যা পাঠকদের নিকট একঘেয়েমি সৃষ্টি করতে পারে বা তাঁরা ধীরে ধীরে তাঁর গ্রন্থ অধ্যয়ন করা ছেড়ে দিতে পারেন। একটি গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত এবং বিশিষ্ট অর্থজ্ঞাপক হলে তা সহজেই প্রত্যেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। তাই আচার্য হলায়ুধ তাঁর গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে এই কৌশলটি গ্রহণ করেছেন।

একইভাবে, হলায়ুধের রচনাটি *অমরকোষের* মতো লিঙ্গ এবং সংখ্যার উপরও খুব বেশি জোর দেয় না, তবে অন্য দিক থেকে এটি সাধারণত পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিকেই অনুসরণ করে। লেখক এই গ্রন্থের মধ্যে শব্দগুলিকে যেভাবে সাজিয়েছেন তার দ্বারা সহজেই লিঙ্গ প্রভৃতি অনুমান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি শ্লোকের উল্লেখ করা হল–

"স্বঃ স্বর্গঃ সুরসদ্ম ত্রিদশাবাসস্ত্রিবিষ্টপং ত্রিদিবম্।

---

[৬৫] শম্ভুঃ স্বযম্ভূর্দুহিণাশ্চতুর্বক্ত্রঃ প্রজাপতিঃ। পিতামহো জগৎকর্তা বিরংচিঃ কমলাসনঃ।। অভিধান., ৭নং শ্লোক।

দ্যৌর্গৌরমর্ত্যভুবনং নাকঃ স্যাদূর্ধ্বলোকশ্চ”।।[৬৬]

এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, স্বঃ, স্বর্গ, ত্রিদশাবাস, দ্যৌঃ, গৌঃ, নাকঃ এবং ঊর্ধ্বলোক পুংলিঙ্গে ব্যবহার করা উচিত এবং ক্লীবলিঙ্গে ত্রিভিশলাপ, ত্রিদিব এবং অমর্ত্যভুবন শব্দগুলি ব্যবহার করা উচিত। এইভাবে একজনের শব্দশক্তি গড়ে তোলার কাজটিকে এই গ্রন্থের মধ্যে খুবই সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

*অভিধানরত্নমালা* অভিধানের রচয়িতা আচার্য হলায়ুধভট্ট ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। R.G. Bhandarkar আচার্য হলায়ুধকে *কবিরহস্যের* লেখকের সঙ্গে শনাক্ত করেন।[৬৭] *কবিরহস্য* গ্রন্থটি একটি ব্যাকরণধর্মী রচনা, যা কিনা রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সময়ে রচিত (খ্রি ৯৪০-৯৫৬)।[৬৮] ভারততত্ত্ববিদ Aufrecht তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, আচার্য হলায়ুধ, যিনি লেখকের সঙ্গে ভট্ট এই উপনামটি ব্যবহার করেছেন, তিনিই *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের* উপর একটি ভাষ্যও (বৃত্তি) রচনা করেছেন।

## ২.১৫. *হলায়ুধস্তোত্র* :

*হলায়ুধস্তোত্রের* একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ উপলব্ধ হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার নর্মদা নদীর তীরে অমরেশ্বর মন্দিরের মণ্ডপের দক্ষিণ দেওয়ালের পাশে খোদিত *হলায়ুধস্তোত্র* নামে একটি স্তোত্র আবিষ্কৃত হয়। ভারতের সরকারি এপিগ্রাফ্রিষ্ট Dr. N.P. Chakrabarty এই স্তোত্রটির একটি প্রতিলিপি অধ্যাপক সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীকে

---

[৬৬] অভিধান., শ্লোক- ৩

[৬৭] Report in Search of Mss. For 1883-84, p. 9.

[৬৮] Keith, H. S. l., p.188.

পাঠিয়েছিলেন। অমরেশ্বর মন্দিরে প্রাপ্ত লিপির কাল হল – ১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দ বা ১১২০ সম্বত ১৩ই কার্ত্তিক। এছাড়াও মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট ওরিয়েন্টাল ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরিতেও *হলায়ুধস্তোত্রের* কয়েকটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। সেই পুঁথিটি সংখ্যা হল- D. Nas. (11271-11278)। অধ্যাপক শাস্ত্রী অমরেশ্বর মন্দিরের দেওয়ালে প্রাপ্ত স্তোত্রের পাঠকে মৌলিক পাঠ হিসাবে ব্যবহার করে এবং মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট ওরিয়েন্টাল ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরির অন্য তিনটি পাণ্ডুলিপির পাঠকে বৈকল্পিক পাঠ রূপে প্রদান করে এই এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকার সমালোচনামূলক সংস্করণটিতে সংযুক্ত করেছেন। *Epigraphia Indica*-তে প্রাপ্ত সূত্র থেকে এও জানা যায় ভারততত্ত্ববিদ Aufrechet এর মতে আচার্য হলায়ুধ কর্তৃক ষোলটিরও বেশি গ্রন্থ রচিত হয়েছে।[৬৯] এই স্তোত্রটি থেকে নিশ্চিতরূপে একথা বলা যায় যে, লেখক হলায়ুধ অবশ্যই শিবের উপাসক ছিলেন।[৭০] স্তোত্রের লিপিকরণ যেহেতু ১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দের, সুতরাং এর লেখক অবশ্যই একাদশ শতকের পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই তিনি সেই হলায়ুধের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন না, যিনি বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন এবং *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব* ইত্যাদি বেশ কয়েকটি সর্বস্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

Dr. Aufrecht হলায়ুধের যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল *অভিধানরত্নমালা*। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের ২৫তম স্তবকে বিষ্ণুর বেশ কয়েকটি নামের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে অন্যতম হল শম্ভু।[৭১] হলায়ুধ ভিন্ন অন্য কেউ বিষ্ণুর সমার্থক শব্দরূপে শম্ভু পদের উল্লেখ করেননি। সুতরাং *অভিধানরত্নমালা* এবং

---

[৬৯] E. I., Vol. XXV, p. 173

[৭০] Ibit., হ. স্তো., শ্লোক- ৬৪

[৭১] সনাতনো জিনঃ শম্ভুর্বিধির্বেধা গদাগ্রজঃ। কৈটভারিরজো জিষ্ণুঃ কংসজিৎপুরুষোত্তমঃ।। অভিধান., ১.২৫, পৃ. ৪

*হলায়ুধস্তোত্রের* রচয়িতার মধ্যে একই ব্যক্তির পরিচয় অনুমান করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়।

Dr. Aufrecht আরও বলেছেন যে, অভিধানবিদ হলায়ুধকে খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বের কোনও এক সময়ের ব্যক্তি বলা যেতে পারে। দেখা যায় যে, *কবিরহস্যের* শেষ শ্লোকটিতে কবি হলায়ুধ নিজেকে অভিধানকার হলায়ুধ হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং *কবিরহস্য* ও *অভিধানরত্নমালার* গ্রন্থকারকে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত। *কবিরহস্যের* শেষ শ্লোকটি হল–

"ইতি সমাপ্তমবাপ্তগুণোদযং কবিরহস্যমিদং রসিকপ্রিযম্।
সদভিধাননিধান হলায়ুধ দ্বিজবরস্য কৃতিঃ সুকৃতার্থিনঃ"।।[৭২]

আচার্য হলায়ুধ রচিত *কবিরহস্য* গ্রন্থটি কাব্যিক শৈলীতে রচিত। ডঃ কিথ মহোদয় হলায়ুধকে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক হিসাবে মনে করে *কবিরহস্যের* লেখক হলায়ুধের স্থিতিকাল নির্ধারণ করেছেন। তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, *হলায়ুধস্তোত্রের* রচয়িতা আচার্য হলায়ুধই, যিনি *কবিরহস্য* এবং *অভিধানরত্নমালা* উভয় গ্রন্থেরই রচয়িতা এবং তাঁর স্থিতিকাল দশম শতাব্দীর শেষার্ধ।

## ২.১৬. *ক্রিয়ানিঘণ্টু* :

*ক্রিয়ানিঘণ্টু*[৭৩] নামে গ্রন্থটিরও একটি পুঁথি পাওয়া গেছে। তবে এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই দাক্ষিণাত্য ভট্টহলায়ুধ নামে গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে

---

[৭২] কবি., শ্লোক- ২৭২

[৭৩] Shree Raghunath Sanskrit Research Institute Library, Jammu, Manuscript No. 396 - ঘ

নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, দাক্ষিণাত্যেও হলায়ুধভট্ট নামে একজন পণ্ডিত রয়েছেন। তবে তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশের শাসক মহারাজ তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি।

**অধ্যায়সংক্ষেপ :**

**আচার্য হলায়ুধের নামে প্রচলিত রচনাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়** নামক এই অধ্যায়ে হলায়ুধভট্টের নামে যে সমস্ত গ্রন্থ উপলব্ধ বা উল্লিখিত সেগুলিরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই কৃতিসমূহের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে দাক্ষিণাত্যের হলায়ুধভট্ট, আবার কতকগুলি গ্রন্থের রচয়িতারূপে বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টকে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া কিছু গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে উক্ত দুই হলায়ুধ ব্যতীত ভিন্ন কোনও হলায়ুধের অস্তিত্বও অনুমিত হয়েছে।

# তৃতীয় অধ্যায়

# লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধ রচিত নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা

## ৩.১. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা :

আগেই বলা হয়েছে আচার্য হলায়ুধভট্টের নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলি হল *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব, অভিধানরত্নমালা, পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের হলায়ুধবৃত্তি* বা *মৃতসঞ্জীবনী বৃত্তি, কর্মোপদেশিনী, মত্স্যসূক্ততন্ত্র, কবিরহস্য, দ্বিজনয়ন, সেক-শুভোদয়া, ক্রিয়ানিঘণ্টু, হলায়ুধস্তোত্র, দুর্গোত্সববিবেক* ইত্যাদি। তবে সবগুলি গ্রন্থই যে একজন হলায়ুধের রচনা নয়, তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য অধ্যায়ে সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব* এবং *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* – মূলত এই তিনটি গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা করা হবে।

### ৩.১.১. বেদভাষ্যকার হলায়ুধ ও *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* :

সায়ণাচার্যের পূর্বসূরিদের বিস্তৃতভাবে দুটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি বিভাগ নির্দিষ্ট বেদসংহিতার ওপর ভিত্তি করে এবং অন্যটি বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে সঙ্কলিত নির্বাচিত মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রচিত। স্কন্দস্বামী, মাধবাচার্য, বেঙ্কটমাধব, উবট এবং ভট্টভাস্কর হলেন প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্গত। অপরদিকে, গুণবিষ্ণু, হরদত্ত এবং হলায়ুধভট্ট হলেন দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

আচার্য হলায়ুধ ছিলেন প্রতিভার ছায়াপথের এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। অধ্যাপক তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দের মতে, আচার্য হলায়ুধের কাল একাদশ শতকের শেষার্ধ।[১] অধ্যাপক বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থের মতে, এই *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থটি সার্বজনীন[২] কারণ, এই গ্রন্থে হিন্দু ধর্মের নানাকৃত্যের ব্যাখ্যা রয়েছে।

আচার্য হলায়ুধভট্ট *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বিভিন্ন গৃহ্য আচার-অনুষ্ঠানে নির্দেশিত বৈদিক মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের কোনও সমালোচনামূলক সংস্করণ নেই, তাই বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করা হয়নি। বেদব্যাখ্যায় আচার্য হলায়ুধের অবদান ও তাঁর জীবনের সামান্য কিছু অজানা তথ্য আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভাংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।

## ৩.১.২. *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* নামকরণ ও সর্বস্ব শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ :

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, বেদজ্ঞান না থাকলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়ে যায়। বেদমন্ত্রের অর্থ, ছন্দ, ঋষি, দেবতা, বিনিয়োগ ইত্যাদির সম্যক মর্ম অবগত না হলে বেদপাঠের কোনও বিশেষ কার্যকারিতা নেই।[৩] মনোগত ও জ্ঞানগত না হলে কেবলমাত্র বাহ্য ধর্মে কোনও উপকার নেই, পরন্তু বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণ সেই সময় বেদবিষয়ে প্রায়ই অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা ধর্মের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। সেই সময়ে শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়াসমূহ সজ্ঞানে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ঐতিহ্যগত দৃষ্টি অনুসারে তাতে কোনও উপকারসাধনই হত না। এই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে তিনি এই

---

[১] ব্রা. স., তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ সম্পাদিত, ভূমিকা

[২] ঐ, বিশ্বনাথ ন্যায়তীর্থ সম্পাদিত, উত্তরণিকা

[৩] অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ। যোঽধ্যাপযেজ্জপেদ্বাপি পাপীযাঞ্জায়তে তু সঃ।। বৃহদ্. ৮.১৩৬

গ্রন্থকে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নাম দিয়ে জনসমাজে প্রচার করেন। বাস্তবিক পক্ষে এটি ব্রাহ্মণগণের সর্বস্ব। তাই *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামটি সার্থক। অন্যভাবে বলা যায়, যে গ্রন্থে ব্রাহ্মণের সর্বস্ব ধন সেই পরম পদ লাভের উপায়স্বরূপ, সদাচার-স্বাধ্যায়-সন্ধ্যাবন্দনাদি বর্ণনার মাধ্যমে সেই পরম পথের নির্দেশ করা হয়েছে তাই-ই হল *ব্রাহ্মণসর্বস্ব।*

## ৩.১.৩. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়সংক্ষেপ :

এই অংশে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করা হচ্ছে। এই গ্রন্থের প্রথমেই প্রয়োজন উদ্দিষ্ট হয়েছে। তারপর বেদ অধ্যয়নের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। বেদমন্ত্রের অর্থজ্ঞানের ফল, ঋষি, ছন্দ, দেবতা প্রভৃতি জানার ফল, দন্তধাবনকর্ম, প্রাতঃস্নান, প্রাতঃসন্ধ্যা সমস্ত বিষয়গুলি পর পর উল্লিখিত হয়েছে। তারপর প্রাণায়ামের মাহাত্ম্য বিস্তারিতভাবে কথিত হয়েছে। তারপর গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যান এবং জপ্যগায়ত্রীর ব্যাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর স্নানমন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা, অঘমর্ষণ সূক্তের মাহাত্ম্য ও ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হয়েছে। ব্রহ্মযজ্ঞক্রিয়ার মন্ত্রসমূহ, তর্পণের মন্ত্রসমূহও বলা হয়েছে। আদিত্যাদি গ্রহগণের পূজামন্ত্র, পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যা, ত্র্যম্বকমন্ত্র ও চণ্ডীমন্ত্রের ব্যাখ্যা, নিরগ্নির বৈশ্বদেবযজ্ঞের মন্ত্রসমূহের উল্লেখ রয়েছে। পার্বণাদি শ্রাদ্ধের মন্ত্রব্যাখ্যা, ভোজনমন্ত্র, সায়ংসন্ধ্যা, শয়ন ও গর্ভাধানবিধির মন্ত্রসমূহ, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়নের মন্ত্রসকল, সোষ্যন্তিকর্ম, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ ও অন্নপ্রাশনের মন্ত্রসমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে। তারপর চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহের মন্ত্রসমূহ প্রদত্ত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এরপর আবসথ্যাগ্নির আধানমন্ত্র, মণিকাধানমন্ত্র, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞবিধির মন্ত্র ও পক্ষাদিকর্মের মন্ত্রসমূহ বর্ণিত হয়েছে। আচার্য হলায়ুধভট্ট এখানে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পশুপতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পশুপতি *পাকযজ্ঞপদ্ধতি* গ্রন্থ রচনা

করেছিলেন বলে আচার্য হলায়ুধভট্ট পাকযজ্ঞবিষয়ক কোনও গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হননি। একথা আচার্য হলায়ুধভট্ট স্বয়ং বলেছেন-

"নিবন্ধেন সমেতাং যৎ পাকযজ্ঞস্য পদ্ধতিম্।

জ্যেষ্ঠঃ পশুপতিশ্চক্রে তেনাস্মাভির্ন সা কৃতা।

অন্ত্যেষ্টিকর্মণো মন্ত্রা ব্যাখ্যাতাঃ খ্যাতকীর্তিনা"।।[৪]

এই শ্লোকে তিনি বলেছেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পশুপতি যেহেতু *পাকযজ্ঞপদ্ধতি* গ্রন্থে অন্ত্যেষ্টিকর্মের মন্ত্রসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন, তাই তিনি সেই মন্ত্রগুলিরও ব্যাখ্যা করেননি। অন্ত্যেষ্টিকর্মের এই মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা *পাকযজ্ঞপদ্ধতি* গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। আর তাই আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে দন্তধাবন থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত যে মন্ত্রসমূহ শাস্ত্রে উল্লিখিত রয়েছে, সেই সমস্ত মন্ত্রগুলিরই ব্যাখ্যা *ব্রহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে করেছেন।

## ৩.১.৪. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন :

"দীপবৎ দ্যোতয়তি যো ভুর্ভবঃ-স্বর্জগত্রয়ীম্।

সবিতুস্তং বয়ং ভর্গমপবর্গকরং স্তুমঃ।।"[৫]

এই ব্রাহ্মণোচিত নমস্কারসূচক শ্লোকে আচার্য হলায়ুধভট্ট *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বঙ্গভূমির ইতিহাস সংকলন উপযোগী বিবিধ উপকরণরাশির আধার এবং সুধীসমাজের নিকট বরণীয় হয়ে রয়েছে। এই গ্রন্থ এখন বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকলেও এবং

---

[৪] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ৭

[৫] তদেব., পৃ. ১

ভ্রমপ্রমাদের ফলে দুষ্পাঠ্য হলেও, হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*ই যজুর্বেদান্তর্গত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের কাছে সকলপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলে সুপরিচিত। এই গ্রন্থে গাত্রোত্থান, দন্তধাবন, প্রাতঃস্নান থেকে আরম্ভ করে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে। এই গ্রন্থে সেকালের সামাজিক রীতি-নীতি ও সদাচার-পদ্ধতির সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

হলায়ুধের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত হলেও, তাঁর প্রকৃত পরিচয় গুপ্ত হয়ে রয়েছে। ভট্টনারায়ণ-বংশোৎপন্ন বলে তিনি নানা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছেন। ভট্টনারায়ণ ছিলেন শাণ্ডিল্য গোত্রের ব্রাহ্মণ, অপরদিকে হলায়ুধ ছিলেন বাৎস্যগোত্রীয়। তথাপি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সুবিখ্যাত ঠাকুরবংশীয় প্রধান পুরুষগণের উৎসাহে তাঁদের যে বংশবিবরণী প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে হলায়ুধও তাঁদের পূর্বপুরুষ বলে উল্লিখিত হয়েছেন। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধভট্ট স্বয়ং যে বংশপরিচয় প্রদান করেছেন, এই সকল পুস্তকে সে সব বিষয় উল্লিখিত হয়নি। শুধুমাত্র আচার্য হলায়ুধ কোন বংশ অলঙ্কৃত করেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"বংশো বাৎস্যমুনের্মুনেরিব সদাচারস্য বিশ্রামভুঃ।

ধর্ম্মাধ্যক্ষধনঞ্জয়ঃ সমজনি জ্যায়ান পরজ্যোতিষঃ"।।[৬]

এই শ্লোকে আচার্য হলায়ুধভট্ট আত্মপরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি প্রথমেই বাৎস্যমুনির বংশের গুণকীর্তন করেছেন। একজন মুনির পক্ষে বংশ বা বেণু যেমন বিশ্রামভূমি হয়ে থাকে, বাৎস্যমুনির বংশ সেইরূপ সদাচারের বিশ্রামভূমি বলে পরিচিত ছিল। সেই বংশে পরমজ্যোতির্ময় ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য হলায়ুধভট্ট ছিলেন সেই ধনঞ্জয়েরই স্বনামধন্য সুযোগ্যপুত্র। ধনঞ্জয় কার ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন সেই কথার বর্ণনা

[৬] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ১

কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু ধনঞ্জয় কীরূপ কার্যে, কেমনভাবে জীবনযাপন করতেন, তার পরিচয় আচার্য হলায়ুধভট্ট প্রদান করেছেন। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে,

"বাঞ্ছাতিক্রমসম্ভবেঽপি বিভবে জ্যোতির্জটালান্ মণীন্
হিত্বা যস্য জগন্নমযস্যমহসো জাগর্তি কোষঃ কুশঃ।
অপ্যেতস্য বিলঙ্ঘ্য শৈলসদৃশঃ প্রাগ্দ্বারবদ্ধান্ দ্বিপান্
দূরোদ্দণ্ডিত-যজ্ঞযূপবৃষভোৎকর্ষেণ হর্ষোঽভবত্।।"[৭]

ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের বিষয়-বৈভবের অভাব ছিল না, বরং আশাতিরিক্ত ধনলাভে তাঁর কোষাগার 'জ্যোতির্জটাযুক্ত' অগণ্য মণিমানিক্যে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সেই সবের প্রতি তাঁর কোনও মোহ ছিল না, তাঁর কাছে কুশই কোষরূপে প্রতিভাত হত। তাঁর শৈলশিখরতুল্য পূর্বাভিমুখ গৃহদ্বারে যে সকল হস্তী নিয়ত নিবদ্ধ থাকত, তা ধনঞ্জয়ের ঐশ্বর্য ও প্রবল প্রতাপের পরিচয় প্রদান করে। তিনি তাঁদেরকে লঙ্ঘন করে সুদৃঢ় নিবদ্ধ যজ্ঞযূপবৃষভের উৎকর্ষেই সর্বদা হর্ষলাভ করতেন। ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের কীর্তিকলাপ সুরাধিপতির সভামণ্ডপে কীর্তন করার সময়ে সুরযুবতীবৃন্দের লোচনসকল আন্তরিক প্রমোদাতিশয্যে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। এই মহাপুরুষের ঔরসে এবং উজ্জ্বলাদেবীর গর্ভে পশুপতি, ঈশান এবং হলায়ুধ নামক তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা বিবিধ শাস্ত্রে বিশারদ ও সুপণ্ডিত হয়ে চরিত্রবলে সে কালের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থানে উপবিষ্ট ও বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলনে লোকসমাজের পূজনীয় হয়ে উঠেছিলেন। ইতিহাসের অভাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের অতুলনীয় উপন্যাস গঠনকৌশল আচার্য হলায়ুধকে জ্যেষ্ঠ ও পশুপতিকে কনিষ্ঠ কল্পনা করে, পশুপতির যে চিত্র মৃণালিনীর উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা

[৭] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ১

হয়েছে, তা রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত হওয়ার সময়ে আধুনিক অধঃপতিত বঙ্গবাসীর নিকটেও পুনঃ পুনঃ ধিক্কৃত হয়ে থাকে। হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বলা হয়েছে,

"ভ্রাতা পদ্ধতিমগ্রজঃ পশুপতিঃ শ্রাদ্ধাদিকৃত্যে বাধাৎ
ঈশানঃ কৃতবান দ্বিজাহ্নিক-বিধৌ জ্যেষ্ঠোঽপরঃ পদ্ধতিম্।
তেনাস্মিন্নমুনা ফলস্তুতিপরাঃ প্রস্তুত্য নানাস্মৃতীঃ
সন্ধ্যাদি-দ্বিজকর্ম্ম-মন্ত্রবচসাং ব্যাখ্যা পরং খ্যাপিতা।।"[৮]

হলায়ুধের লিখিত *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* পশুপতি ও ঈশান সম্বন্ধীয় এই কথা বিস্মৃত হলেও, পণ্ডিতসমাজে *পশুপতিপদ্ধতির* পরিচয় এখনও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *মৃণালিনী* উপন্যাসে পশুপতির অবতারণায় রাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনকে অকর্মণ্য, অযোগ্য ভূপতি ও তদীয় প্রধান মন্ত্রী পশুপতিকে নরকুলাঙ্গাররূপে চিত্রিত করেছেন। কবিকল্পনা এখানে নিরঙ্কুশ ও তাঁর কাহিনি অধিকতর মুখরোচক। আর সে সবই ইতিহাসে স্থান অধিকার করে বসেছে।

"লব্ধ জন্ম ধনঞ্জয়াদ্গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে
রাবৃত্যা সদৃশী নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
শব্দব্রহ্ম-করোদরামলকবদ্ভোগোত্তরা সত্ক্রিয়ে-
ত্যস্তি প্রার্থয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্"।।[৯]

ধনঞ্জয় থেকে জন্মলাভ ও শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতি থেকে নিজ বয়সোচিত মহামাত্য পদবীলাভ করে, বিবিধ শাস্ত্রবিশারদ হলায়ুধ সৎকার প্রাপ্ত হয়ে কোনও সাংসারিক

---

[৮] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ৫

[৯] তদেব., পৃ. ২

উন্নতির প্রার্থনা করতেন না। তথাপি বাল্যকাল থেকেই নানা সম্পদ তাঁকে আলিঙ্গন করতে আরম্ভ করেছিল। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে,

"বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশু-বিম্বোজ্জ্বল-

চ্ছত্রোৎসক্ত-মহামহত্তকপদং দত্বা নবে যৌবনে।

যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ

শ্রীমাল্লক্ষ্মণ-সেনদেবনৃপতির্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ।।"[১০]

লক্ষ্মণসেন আচার্য হলায়ুধকে বাল্যে রাজপণ্ডিতপদ, যৌবনে মহামাত্যপদ ও যৌবনশেষযোগ্য ধর্ম্মাধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন হলায়ুধের প্রতিভার সমুচিত সমাদর করেছিলেন। আচার্য হলায়ুধ রাজকার্যে ব্যাপৃত হয়ে প্রচুর সম্পদ 'মণীষিতাধিকপুরস্কারোত্তরাং সম্পদং'[১১] লাভ করেছিলেন। এত ঐশ্বর্য্য অন্য লোকের পক্ষে চিত্তবিকার ঘটাতে পারত, কিন্তু আচার্য হলায়ুধের নীলাশ্মরশ্মিচ্ছটা কেবল তাঁর কৃষ্ণাজিনকেই অধিকতর কৃষ্ণাভ করে দিত, গৃহিণীর রত্নকঙ্কন রনৎকারও তাঁর যজ্ঞগৃহের কোলাহলকেই বর্দ্ধিত করে তুলত। ঐশ্বর্য্যের আতিশয্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত কৃষ্ণাজিনাদি তাঁর গৃহকে যুগপৎ সম্ভোগ সংযমের অপূর্ব সম্মিলনে সজ্জীভূত করে তুলত।

"পাত্রং দারুময়ং ক্বচিৎ বিজয়তে, হৈমং ক্বচিদ্ভাজনং

কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দূধবলং, কৃষ্ণাজিনং ক্বাপি চ।

ধুমঃ ক্বাপি বষট্কৃতাহুতিকৃতো, ধূমঃ পরঃ কাপ্যভূ

---

[১০] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ৩

[১১] তদেব., পৃ. ২

দগ্নেঃ কর্মং ফলং চ তস্য যুগপজ্জাগর্তি যন্মন্দিরে।।"[১২]

আচার্য হলায়ুধ এইভাবে নিয়ত রাজকার্যে ব্যাপৃত থেকেও অবসর সময়ে স্বদেশের কল্যাণ কামনায় *মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব* ও *পণ্ডিতসর্বস্ব* নামক বিস্তৃত গ্রন্থসংকলন করে, অবশেষে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

এই গ্রন্থ সংগ্রহ ও ব্যাখ্যাপুস্তক। এটি সন্ধ্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের অবশ্যপাঠ্য বেদমন্ত্রাদির সুলিখিত ভাষ্যগ্রন্থ। আচার্য হলায়ুধের পূর্বে বেদমন্ত্রের এরূপ ভাষ্যগ্রন্থ প্রচলিত ছিল না। পরবর্তীকালে সায়ণাচার্য ভাষ্য রচনা করবার সময়ে আচার্য হলায়ুধের মন্ত্রব্যাখ্যার সহায়তা লাভ করেছিলেন।

"আসন্ বা কতি সন্তি বা কতি ন কিং ক্ষ্মামণ্ডলে পণ্ডিতা
ব্যাখ্যাতো মতিশালিনাঽযমুবটাচার্য্যেণ বেদঃ পরম্।
অস্পষ্টং তদপীত্যনেন বিদুষা বিশ্বপ্রসিদ্ধৈঃ পদৈঃ
সন্ধ্যাদিদ্বিজকর্মমন্ত্রবচসাং ব্যাখ্যানমেতত্ কৃতম্।।"[১৩]

এই ভূ-ভাগে অনেক পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন, এখনও অনেক পণ্ডিত বর্তমান রয়েছেন এবং অনেক আচার্যই বেদব্যাখ্যা করেছেন। এত সব ব্যাখ্যা থাকতেও বেদার্থ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে আচার্য হলায়ুধভট্ট সন্ধ্যাদিমন্ত্রের ব্যাখ্যান লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই ভাষ্য রচনার মূল উদ্দেশ্য নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে। হলায়ুধের সময়ে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের অধস্তন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ পুরুষের বংশধরগণ বর্তমান ছিলেন। তাঁরা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাঢ়ী বা বারেন্দ্র সকলেই বেদার্থজ্ঞানবিহীন হয়ে কেবল কর্মমীমাংসাদ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদন

---

[১২] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ৩

[১৩] তদেব., পৃ. ৪

করতেন। আচার্য হলায়ুধের আবির্ভাবের পূর্বে বেদমন্ত্রের আবৃত্তিমাত্রই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেই আচার্য হলায়ুধ বেদার্থব্যাখ্যায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজকে প্রবুদ্ধ করবার আশায় *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

হলায়ুধ নানা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বেদার্থজ্ঞান লাভ করবার প্রয়োজন প্রদর্শনের প্রচেষ্টায়, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে নানাভাবে প্ররোচিত করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রার্থ ব্যাখ্যা যেমন সরল, সেইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি কীরূপ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর ব্যাখ্যাই তা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করে। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থ পাঠ করতে করতে হলায়ুধের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও তাঁর মন্ত্রব্যাখ্যার উদার মতের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া মাত্র তাঁর চরণে শ্রদ্ধাবনতমস্তকে প্রণাম নিবেদন করতে হয়। তাঁর গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও পুরুষসূক্ত ব্যাখ্যা পৃথক্ মুদ্রিত হওয়ার দাবি রাখতেই পারে।

*ব্রাহ্মণসর্বস্বে* দেখতে পাওয়া যায়, তিনি কোনও পদ্ধতিগ্রন্থ রচনা করেননি। কিন্তু হলায়ুধ বিরচিত *কর্মোপদেশিনী* নামে একখানি পদ্ধতি গ্রন্থ প্রচলিত রয়েছে। এই গ্রন্থে সমগ্র কর্মোপদেশ থাকলেও এর প্রত্যেক প্রকরণ শেষে হলায়ুধের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

আচার্য হলায়ুধ পরিণত বয়সে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাল্যে রাজপণ্ডিতপদে নিযুক্ত থাকার সময়ে, লক্ষ্মণসেনের যে সকল তাম্রশাসন লিখিত হত, তাঁর কবিতাবলি হলায়ুধের রচিত বলে অনুমান করা যায়। লক্ষ্মণসেনের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে পাবনার অন্তর্গত মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ব্যতীত, অন্যান্য তাম্রশাসনগুলির রচনাকাল লক্ষ্মণ শাসনাব্দের সপ্তম সংবৎসরের মধ্যবর্তী বলে বিবেচিত হয়েছে। মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানির রচনাকাল অপাঠ্য হয়েছে বলে, তা অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে। এই সকল তাম্রশাসন একত্র পাঠ করলে

দেখতে পাওয়া যায়, সপ্তম সংবৎসর পর্যন্ত যে সকল তাম্রশাসনলিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল, তা থেকে তাঁর রচনাবলি পৃথক নয়। প্রথম থেকে সমস্ত শাসনে একই রচনাবলি উৎকীর্ণ রয়েছে, কেবল দু-একটি শ্লোকের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের শ্লোকাবলি তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। রচনারীতিও বিশেষভাবে পার্থক্য প্রকাশ করে। প্রথমোক্ত শাসনগুলির রচনাবলির রচনালালিত্য হলায়ুধের রচনারীতির অনুরূপ, কাব্যসৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল এবং রসমাধুর্য্যে সুমণ্ডিত। তিনি যে বাল্যে রাজপণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন, সে কথার সঙ্গে লক্ষ্মণসেনের প্রথম শাসনসময়ের এই সকল তাম্রশাসনলিপির রচনাবলির বিশেষভাবে সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। মহামাত্যপদে নিযুক্ত থাকার সময়ে হলায়ুধের প্রতি কীরূপ কার্যভার সমর্পিত ছিল, তার প্রমাণ না থাকলেও, কিছু কিছু পরিচয় লাভ করা যায়। তৎকালে লক্ষ্মণসেন নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে নানা দেশে ঘুরে বেড়াতেন। তখন মহামাত্যই ছিলেন তাঁর পরামর্শদাতা, পিতৃরাজ্য শাসনের সহকারী এবং সংগ্রামনির্জিত অভিনব রাজ্যে সুশাসন বিস্তৃত করবার প্রধান মন্ত্রণাদাতা। তাঁর সদ্‌গুণাবলী শিলাপটে উৎকীর্ণ হয়ে এবং কবির নিবন্ধে সন্নিবিষ্ট হয়ে, গ্রামে নগরে গৃহে গৃহে নানা স্থানে নিদর্শনরূপে রক্ষিত হওয়ার কথা *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* লিখিত রয়েছে। সেগুলি আবিষ্কৃত হলে নানা ঐতিহাসিক রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

হলায়ুধের পূর্বেই বঙ্গদেশে পুনরায় সংস্কৃত শিক্ষার সমুন্নতি সাধিত হয়েছিল। এক সময়ে পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত বরেন্দ্রভূমি পাণিনীয় ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত ছিল। পাণিনীয় ব্যাকরণই আজও বরেন্দ্রভূমির একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু তার কিছুকাল পর থেকেই তা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে। *রাজতরঙ্গিণী* গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাসের সময়ে গৌড়মণ্ডলে *মহাভাষ্যের* পঠন-পাঠন পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। তখন বেদার্থজ্ঞানের প্রয়োজন

অস্বীকার করে ব্রাহ্মণসমাজ আবৃত্তিমাত্রেই পরিতুষ্ট হতেন। অথচ পাণিনি ব্যাকরণের বহুসংখ্যক বৈদিকসূত্র অধ্যয়নে অকারণে বালকগণ পরিশ্রান্ত হত। লক্ষ্মণসেন এই অসুবিধা দূর করবার জন্য বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেবকে বৈদিকসূত্র বিবর্জিত পাণিনি সূত্রের এক সংক্ষিপ্ত বৃত্তি রচনা করতে আদেশ করেন। তা-ই পরবর্তীকালে লঘুবৃত্তি বলে পরিচিত হয়ে অদ্যাপি বরেন্দ্রদেশে অধীত ও অধ্যাপিত হয়ে আসছে। আচার্য হলায়ুধ বেদমন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, সেখানে ব্যুৎপত্তিনির্দেশার্থ পাণিনিসূত্রই উল্লিখিত হয়েছে। তিনি যে বৈদিকসূত্রে সমধিক ব্যুৎপত্তিলাভ করেছিলেন, এই সকল ব্যাখ্যাই তার বিশিষ্ট প্রমাণ। হলায়ুধের আত্মপরিচয় সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে সহজেই বোঝা যায়। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগণেরই নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের মন্ত্রব্যাখ্যার সুপরিচিত গ্রন্থ। এই কারণেও আচার্য হলায়ুধকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলা যায় না। সে যাই হোক, আচার্য হলায়ুধ যে ভট্টনারায়ণবংশীয় ঠাকুর উপাধিধারী পাথুরিয়াঘাটার স্বনামখ্যাত মহারাজ শ্রী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পূর্বপুরুষ হতে পারেন না, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনায় নিযুক্ত হয়ে পাশ্চাত্ত্য অধ্যাপকবর্গ পুরুষসূক্তের সমালোচনাচ্ছলে লিখে গেছেন, হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে একেশ্বরবাদ থেকে কিরূপে স্খলিত হয়ে পড়েছিল এবং কিরূপেই বা উত্তরকালে জাতিভেদের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল বন্ধন যাতনা সহ্য করছে, তা পুরুষসূক্তে বিশদীকৃত হতে পারে।[১৪]

[১৪] It will serve to illustrate the gradual sliding of Hindu monotheism into pantheism, and the first fore-shadowing of the institution of caste, which for so many centuries has held India in bondage. Indian Wisdom, p.24.

এই পাশ্চাত্ত্যসিদ্ধান্তকে কণ্ঠস্থ করে ইংরেজভক্ত ভারতবাসী অনেক সময়ে স্বদেশের ঐতিহাসিক প্রবন্ধরচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন। সেই কারণে পুরুষসূক্তের হলায়ুধকৃত সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও পাশ্চাত্ত্য অধ্যাপকবর্গের ইংরেজি ব্যাখ্যার তুলনাত্মক আলোচনা করা আবশ্যক।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম মন্ত্রের আলোচনা করা হল,

"সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত্

স ভূমিং সর্বতস্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।"[১৫]

এখানে 'অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্' বলতে দশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অধিকার করে পুরুষ অবস্থান করছেন, এইরূপ বুঝে সহস্রশীর্ষার সঙ্গে তার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'অত্যতিষ্টৎ' বলতে পূর্ণ করা বা অধিকার করা বুঝে অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়মস্ এই অসঙ্গত অনুবাদ করে গেছেন। বলা বাহুল্য 'অত্যতিষ্ঠৎ' একটি শব্দ নয়, 'অতি' এবং 'অতিষ্ঠৎ' এই দুই শব্দের সন্ধিযুক্ত একপদ রূপে প্রতিভাত মাত্র। 'অতি' উপসর্গ হয়েও বৈদিক রচনারীতি অনুসারে ধাত্বর্থ বিজ্ঞাপনে সমর্থ, এর অর্থ হল 'অতিক্রম করে'। তা সকর্মক বলে কর্মের আকাঙ্ক্ষা রাখে। 'দশাঙ্গুলম্' শব্দটি কর্মপদ। ভূমি শব্দের অর্থ হল প্রাণিদেহ। সহস্রশীর্ষা পুরুষ যদিও সকল দেহেই বর্ত্তমান, তথাপি তিনি নাভিদেশকে দশাঙ্গুল পরিমিত করলে যে স্থান পাওয়া যায় সেই মানব হৃদয়েই অবস্থিত বলে অনুভূত। এটাই এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা।

ধীরভাবে সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করে, ইতিহাসের উপকরণ সঙ্কলন ও তার সন্ধান প্রদান করাই বর্তমান যুগের লেখকদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। আর

---

[১৫] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ১২৪

এই বিষয়গুলিকেই অবহেলা করে ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করলে, সে ইতিহাসে ভারতবর্ষের প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হওয়ার আশা আকাশ-কুসুম কল্পনায় পরিণত হবে।

হলায়ুধ যেরূপ সদাচার-সম্পন্ন, উদারচিত্ত ও জ্ঞানানুরক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন সেরূপ ব্রাহ্মণ বর্তমান যুগে দুর্লভ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এখন কেবল বাহ্যাড়ম্বরের আতিশয্য। আচার্য হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* এই বাহ্যাড়ম্বর অতিক্রম করে, যথার্থ ধর্মজীবনলাভের যে সকল উপদেশ পাওয়া যায়, তদনুসারে সমাজসংস্কার সাধিত হলে বঙ্গীয় জনসমাজ এখনও স্বদেশের মলিন মুখ উজ্জ্বল করতে পারেন। *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* আদ্যন্ত কেবল জ্ঞানানুশীলনের বিবিধ ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে,

"ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে।

যস্য বিপ্রস্য তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে"।।[১৬]

শূদ্রকে বৃষল না বলে তিনি বেদকেই বৃষ বলেছেন। যে বিপ্র অব্যুৎপন্ন, তিনিই বৃষল বলে কথিত হওয়ার প্রকৃত যোগ্য পাত্র। এই যমসংহিতার বচন উদ্ধৃত করে, হলায়ুধ ব্রাহ্মণের পক্ষে কেবলমাত্র বেদধ্যয়নের প্রয়োজন ব্যক্ত করেই নিরস্ত হননি। বেদার্থতাৎপর্যজ্ঞানের প্রয়োজন ব্যক্ত করে, বিবিধ বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যায় বেদ থেকে কীরূপ উদার শিক্ষালাভ করা যায় তারও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে গিয়েছেন। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস সংকলন করতে হলে হলায়ুধের গ্রন্থের সঙ্গে বর্তমান ক্রিয়াকাণ্ডে প্রচলিত পদ্ধতির একত্র সমালোচনা করা আবশ্যক।

লক্ষ্মণসেন দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করেছিলেন। আচার্য হলায়ুধের গ্রন্থই তার বিশিষ্ট প্রমাণ বা সাক্ষ্য বহন করে। লক্ষ্মণসেনের বিবিধ রাজকার্যে আচার্য হলায়ুধের বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য অতিবাহিত হয়েছিল। কোন সময়ে আচার্য হলায়ুধ বর্তমান ছিলেন তা

---

[১৬] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ১২

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করতে না পারলেও, বল্লালসেন বিরচিত *দানসাগরের* রচনাকাল অবলম্বন করে হলায়ুধের আবির্ভাবকালের আভাস পাওয়া যেতে পারে। সময় ও প্রকাশের নির্দেশ অনুসারে *দানসাগর* রচিত হওয়ার কাল হল, 'শশি নবদশমিতে শকবর্ষে' অর্থাৎ খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষার্ধ। আচার্য হলায়ুধের গ্রন্থে রচনাকাল নির্ণয় করবার উপযুক্ত কোন প্রমাণ উল্লিখিত নেই। কেবল *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* যে হলায়ুধের পরিণত জীবনের সুবৃহৎ গ্রন্থ এবং গ্রন্থরচনাকালে তিনি যে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তা জানতে পারা যায়। এই গ্রন্থ কোন স্থানে রচিত হয়েছিল, তারও কোনওরূপ সন্ধান লাভ করার উপায় নেই। তবে অনুমানের দ্বারা এই গ্রন্থকে লক্ষ্মণাবতী নগরে রচিত হওয়া বলে বিশ্বাস করতে হয়। কারণ, লক্ষ্মণসেনের তদীয় রাজ্যাব্দের সপ্তমবর্ষ পর্যন্তও শ্রীবিক্রমপুরে বাস করবার কথা তাম্রশাসনে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর কোনও সময়ে তিনি লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করে, গৌড়েশ্বর বলে পরিচিত হয়েছিলেন। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* রচিত হওয়ার সময়ে লক্ষ্মণসেনদেব গৌড়েশ্বর হয়ে থাকলে এই গ্রন্থ লক্ষ্মণাবতীর অভিনব রাজধানীতে বিরচিত হয়েছিল বলেই অনুমান করতে হয়। *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* একস্থলে আচার্য হলায়ুধ নিজেকে 'গৌড়েন্দ্রধর্ম্মাগারাধিকারিণা'[১৭] বলে বর্ণনা করেছেন, যা এই অনুমানের পক্ষে সমর্থন করার একমাত্র প্রমাণ।

### ৩.১.৪.১. মঙ্গলাচরণ :

সংস্কৃতশাস্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মঙ্গলাচরণের ব্যবহার। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থ নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য শিষ্টাচার অনুসরণ করে এই মঙ্গলাচরণ করা হয়ে থাকে। মঙ্গলাচরণ

[১৭] তেজশ্চন্দ বিদ্যানন্দ (সম্পা.), ব্রা. স., পৃ. ১২১

হল ইষ্টদেবতা ও গুরুজনদের প্রতি বন্দনা বা নমস্কার করা। তাছাড়া শিষ্যদেরকে শিক্ষা দান করাও মঙ্গলাচরণের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে ইষ্টদেবতা ও গুরুজনদের প্রতি বন্দনা মঙ্গলজনক বলে তাকে মঙ্গলাচরণ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বেদের বিধানের দ্বারা যাঁদের সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত সেরূপ শিষ্টব্যক্তিগণ গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ অবশ্যই করেন, যার দ্বারা গ্রন্থের নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হয়। সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন আচার্যদের মঙ্গলাচরণ করতে দেখা গেছে।

মঙ্গলাচরণ হল বেদবোধিত কর্তব্য-বিশেষ। বৈদিক মতে, বেদ হল সকল নৈতিক বা ধর্মীয় বিধির মূল। ইষ্টদেবতারূপ মঙ্গলাচরণ বা নৈতিক আচরণের উৎস বেদে নিহিত। বেদে মঙ্গলাচরণের অবশ্য কর্তব্যতাসূচক বাক্য পাওয়া যায় না কিন্তু মঙ্গলাচরণরূপ শিষ্টাচার দেখা যায়। যাঁরা বেদের অনুশাসন মেনে চলেন, সেরূপ শিষ্টব্যক্তি গ্রন্থের সমাপ্তি কামনায় মঙ্গলাচরণ করেন। এরূপ শিষ্টাচার থেকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই এরূপ অনুমান করা যায় যে, 'সমাপ্তিকামঃ মঙ্গলমাচরেত্' এরূপ শ্রুতিবাক্য অবশ্যই ছিল। বেদে যদি এইরকম বাক্যাবলি না থাকত তাহলে শিষ্টব্যক্তিগণ নিয়মিত মঙ্গলাচরণে রত থাকতেন না। কেননা তাঁরা জানেন, 'ন কর্ম নিষ্ফলং কুর্যাত্'[১৮] অর্থাৎ যে কর্ম নিষ্ফল তা কখনই করা উচিত নয়। সুতরাং শিষ্টব্যক্তিদের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত দর্শ নামক যজ্ঞ ইত্যাদির মত অলৌকিক ও অনিন্দিত আচরণ থেকে মঙ্গলাচরণের কর্তব্য যে বেদবোধিত তা সহজেই অনুমিত হয়।

---

[১৮] মনু., ৪.৭০

কখনও কখনও সংস্কৃতসাহিত্যে মঙ্গলাচরণ ছাড়াই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হতে দেখা গেছে। যেমন– উদয়নাচার্যের *কিরণাবলী* গ্রন্থ। আবার মঙ্গলাচরণ করেও গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়নি, সংস্কৃতসাহিত্যে এধরণেরও গ্রন্থ দেখা যায়। যেমন– বাণভট্ট বিরচিত *কাদম্বরী* গ্রন্থ। তবে যাই হোক না কেন মঙ্গলাচরণের সঙ্গে চিরাচরিত প্রথা ও শিষ্টাচারের সম্বন্ধ রয়েছে, তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেই হয়।

আচার্য হলায়ুধ বিরচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের প্রারম্ভসূচক প্রথম চারটি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে- "দীপবদ্দ্যোতযতি যো ভূর্ভুবঃস্বর্জগৎত্রযীম্। সবিতুস্তং বযং ভর্গমপবর্গকরং স্তুমঃ"।।[১৯] অর্থাৎ সবিতার বা সূর্যের তেজ ভূ, ভুবঃ ও স্বঃ নামক ত্রিজগৎকে দীপের মত আলোক দান করে থাকে। আচার্য হলায়ুধভট্ট গ্রন্থরচনার প্রারম্ভে সেই অপবর্গকর সূর্যের তেজেরই স্তব বা প্রশংসা করেছেন।

"দধানং চতুরাম্নাযপূতাং মুখচতুষ্টযীম্।

মুনিমাদ্যং নমামস্তং পঙ্কজোটজবাসিনম্"।।[২০]

চার বেদের দ্বারা পূত, চার মুখ ধারণকারী এবং পদ্মকুসুমরূপ উটজে বসবাসকারী আদি মুনি ব্রহ্মাকে গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে আচার্য হলায়ুধভট্ট প্রণাম করেছেন।

"ত্রিদিবাভরণং কালত্রযহেতুস্ত্রযীমযঃ।

ত্রিবর্গপ্রাপ্তিসরণিস্তরণিঃ শ্রেযসেঽস্তু বঃ"।।[২১]

শুধু প্রণাম নিবেদন করেই মঙ্গলাচরণের সমাপ্তি ঘটেনি, সূর্যদেব যাতে তাঁদের অর্থাৎ গ্রন্থকর্তা ও গ্রন্থপাঠক উভয়ের মঙ্গলবিধান করে তারও প্রার্থনা আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর

---

[১৯] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা স, পৃ. ১

[২০] তদেব

[২১] তদেব

*ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের প্রারম্ভে করেছেন। এই শ্লোকে তিনি সূর্যদেবকে বিভিন্ন উপমায় ভূষিত করেছেন, যথা- সূর্য স্বর্গের আভরণস্বরূপ, অতীতাদিকালত্রয়ের হেতু, বেদময় এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম নামক ত্রিবর্গের উপায়স্বরূপ।

"ত্রিলোকপূজ্যাং নমতি ত্রিসন্ধ্যাং যাং ত্রিলোচনঃ।

ত্রিবর্গফলনির্মাত্রীং গাযত্রীং তামুপাস্মহে।।"[২২]

ত্রিলোকের পূজ্যা, ত্রিলোচন দ্বারা ত্রিসন্ধ্যায় যিনি নমস্কার পেয়ে থাকেন এবং ত্রিবর্গফল নির্মাত্রী গায়ত্রীদেবীর উপাসনাও আচার্য হলায়ুধভট্ট নিবিঘ্নে গ্রন্থ পরিসমাপ্তির জন্য তাঁর গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে করেছেন।

## ৩.১.৪.২. গ্রন্থকারের পরিচয় :

বাৎস্যমুনির বংশধর, সদাচারের বিশ্রামভূমি এবং পরজ্যোতি ইত্যাদি গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়। তিনি অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা যে হোম করতেন তা থেকে উৎপন্ন অম্বুরাশি দেবতারাও পান করতেন। এ থেকে ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের যাগযজ্ঞের পদ্ধতি ও গুণমানবিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।[২৩] জাগতিক বিষয় সম্পত্তির প্রতি তাঁর কোনওরকম লোভ ছিল না।

ধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ের পত্নী ছিলেন ষণ্ডী। ষণ্ডী ছিলেন যম, নিয়ম, সুমতি ও ধৈর্য্য ইত্যাদি গুণসমূহের আধার।[২৪] পরম পুরুষের প্রকৃতির মতন ছিলেন তিনি। প্রকৃতি থেকে যেমন মহান বা মহৎ উৎপন্ন হয়েছে[২৫] (সাংখ্যতত্ত্বানুসারে) সেরকমই তাঁরও ছিল

---

[২২] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ১

[২৩] তদেব

[২৪] তদেব., পৃ. ২

[২৫] সাংখ্য., কারিকা ৩

শ্রেয়রূপ বিলাসের আয়তনস্বরূপ হলায়ুধ নামে এক পুত্র। আর এই হলায়ুধের কীর্তি সমুদ্রের মত বিস্তৃত ছিল।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ধনঞ্জয় ছিলেন আচার্য হলায়ুধের পিতা। ধনঞ্জয় যেহেতু রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, সেই কারণে গুণবান ভূপতি লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদে আচার্য হলায়ুধ নিজ বয়সের যোগ্য মহামাত্যের পদ পেয়েছিলেন। হলায়ুধ ছিলেন দানকার্যে মহান অর্থাৎ নানাবিধ পার্থিব ভোগসম্পদ দানে তিনি সমর্থ ছিলেন।

আচার্য হলায়ুধ তাঁর রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে সেনবংশের শ্রেষ্ঠ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের কীর্তির কথাও দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে হলায়ুধ সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর বলে বর্ণনা করেছেন।

আচার্য হলায়ুধের প্রতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের স্নেহভাব যে কতটা গভীর ছিল তারও পরিচয় *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহারাজ লক্ষ্মণসেন হলায়ুধকে মনোবাঞ্ছারও অধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত করে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন আচার্য হলায়ুধকে বাল্যাবস্থায় রাজপণ্ডিত পদ দান করেছিলেন, নবযৌবনে শুভ্রচন্দ্রের মতো উজ্জ্বল শ্বেতছত্রের দ্বারা অলংকৃত মহামহত্তক পদ দান করেছিলেন, যৌবনাবসানে সমস্ত ভূপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারায়ণতুল্য মহারাজ লক্ষ্মণসেন আচার্য হলায়ুধকে তাঁর যোগ্য ধর্মাধিকারীর পদ প্রদান করেছিলেন।

আচার্য হলায়ুধের স্ত্রীর নাম স্মৃতিকথা,[২৬] তিনি ছিলেন হলায়ুধের প্রাণের থেকেও প্রিয়তরা। তাঁর পত্নী স্মৃতিকথার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীরও পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্বরচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে। বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১. শাস্ত্রীয় আচার রক্ষায় বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন তাঁর স্ত্রী স্মৃতিকথা।

---

[২৬] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ৩

২. যজ্ঞাদিকর্মে ছিল তাঁর উৎসাহ।

৩. প্রায়শ্চিত্ত কর্মসম্পাদনে অন্তরে ছিলেন প্রহৃষ্ট।

৪. গৃহস্থের উপযুক্ত নানাবিধ ব্রতচারাদি পরিগ্রহে আসক্ত।

৫. তিনি ছিলেন বর্ণাশ্রম ধর্মরক্ষায় তৎপর। এর থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন সবর্ণা নারী।

আচার্য হলায়ুধের বেদশাস্ত্রের প্রতি ছিল গভীর প্রেম। হলায়ুধ দিবারাত্র বেদশাস্ত্রকে হৃদয়ে ধারণ করে হৃষ্ট হতেন। তাঁর কর্ণে ছিল স্বর্ণময় কুণ্ডলের মধ্যস্থিত নীল প্রস্তরখণ্ড, আর তাঁর নীল রশ্মিচ্ছটা কৃষ্ণাজিনকে আরও বেশি কৃষ্ণবর্ণ করে তুলত। অগ্নিগৃহে যজ্ঞকালে তাঁর মন্ত্রধ্বনি চঞ্চলনয়না স্ত্রীর করস্থিত রত্নকঙ্কনের ঝনৎকার ধ্বনির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অধিকগুণ বৃদ্ধি পেত।

তিনি সর্বদা যাগযজ্ঞাদি কর্মের সঙ্গেই কাল অতিবাহিত করতেন। তাঁর গৃহের মধ্যে যাগযজ্ঞাদির কর্মপদ্ধতি বিষয়ক বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যাবলিও লক্ষ্য করা গেছে। যথা– গৃহের কোথাও কাষ্ঠময় পাত্র, কোথাও স্বর্ণময় পাত্র, কোথাও চন্দ্রবৎ শুভ্রকান্তিবস্ত্র, কোথাও বা কৃষ্ণাজিন, কোথাও ধূম, আবার কোথাও বষট্‌কারপূর্বক আহুতি থেকে উৎপন্ন ধূপের গন্ধ বিরাজ করত। অর্থাৎ অগ্নির কর্ম এবং তজ্জনিত ফল উভয়ই তাঁর গৃহে বিদ্যমান ছিল।

স্বাধ্যায়বিহীন ও যজ্ঞাদিবিহীন কলিযুগেও আচার্য হলায়ুধ ত্রিসন্ধ্যায় বিধি অনুসারে নিত্য হোম করতেন। আচার্য হলায়ুধ যে কতটা জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর পরিচয় *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তাঁর গুণসমূহ পণ্ডিতগণ কর্ণের দ্বারা পান করে হৃদয়ে সংস্থাপন করেছিলেন, শিল্পীগণ দেবমন্দিরের পথে স্থাপিত স্থায়ী শিলাপট্টকে খোদিত করে তাঁর নাম রক্ষণ করেছিলেন, কবিগণ তাঁকে বিশেষভাবে অলংকৃত কথাবন্ধ ও

প্রবন্ধের মধ্যে উৎকীর্ণ করে রেখেছিলেন। এইভাবেই তাঁর কথা প্রতি নগরে, প্রতি গৃহে ও প্রত্যেক আবাসস্থলে জনশ্রুতির মাধ্যমে প্রচারিত হত।

তাঁর অন্যান্য কৃতি সম্পর্কেও *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* প্রারম্ভে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যার দ্বারা জানা যায় যে, আচার্য হলায়ুধ *মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, শিবসর্বস্ব* ও *পণ্ডিতসর্বস্ব* নামে গ্রন্থগুলিও রচনা করেছেন।

হলায়ুধ তাঁর গ্রন্থে উবটাচার্যের উল্লেখ করেছেন। আচার্য হলায়ুধের মতে, উবটাচার্যের বেদব্যাখ্যা ছিল অস্পষ্ট। তাই তিনি লোকপ্রচলিত পদসমূহের দ্বারা ও সন্ধ্যাদি দ্বিজগণের কর্তব্যকর্ম সমূহের মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে করেছেন।

আচার্য হলায়ুধ বেদবাক্যসমূহের কিয়দংশেরই ব্যাখ্যা করেছেন। তবে এর পশ্চাতে কিছু কারণও ছিল। আচার্য হলায়ুধ ছিলেন বাক্‌পতি ও সাহসী পুরুষ। তিনি বেদার্থবোধের জন্য রসজ্ঞগণের অন্তরসদৃশ বাক্যসজ্জা করেছিলেন। তবে বলা ভালো, এই বিষয়ে উবটাচার্য পূর্বেই পথপ্রদর্শন করে গিয়েছেন। আর উবটাচার্যের পথ প্রদর্শনানুসারী হয়েই আচার্য হলায়ুধ বেদব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেন। তাই হয়তো আচার্য হলায়ুধভট্ট উবটাচার্যকৃত বেদমন্ত্রগুলির ব্যাখ্যায় অগ্রসর না হয়ে, বেদবিষয়ক অন্য মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেন।

আচার্য হলায়ুধ বেদের অর্থ বিচারের দিকে বেশি জোর দিয়েছেন। বেদ মন্ত্র পাঠের ক্ষেত্রে ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ ইত্যাদির প্রাধান্য *বৃহদ্দেবতা, সর্বানুক্রমণী, পাণিনীয় শিক্ষা* ও *আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্র* ইত্যাদি গ্রন্থেও পাওয়া যায়। হলায়ুধের মতে, যাঁরা বেদপাঠ করে অর্থবিচার করেন না, মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ইত্যাদি জানেন না, বিনিয়োগের সঙ্গে যাঁদের কোনও পরিচয় নেই, তাঁরা পদক্রম জেনেও বেদপাঠ ফলের

বাইরেই অবস্থান করে থাকেন এবং প্রত্যহ সেই দুর্বহ বেদরাশির ভারবহনে কষ্টই পেয়ে থাকেন। অর্থবোধ ব্যতীত বৈদিক শব্দে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় না। এই কারণে, কর্মানুসারে বেদভাগের ব্যাখ্যা আচার্য হলায়ুধভট্ট সুচিন্তিতভাবে করেছেন।

আচার্য হলায়ুধভট্টের দুইজন ভাই ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই ছিলেন ঈশান এবং অপর একজন ছিলেন পশুপতি। তিনিও ছিলেন হলায়ুধের অগ্রজ। পশুপতি *শ্রাদ্ধকৃত্যপদ্ধতি* গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ঈশান *দ্বিজাহ্নিকপদ্ধতি* গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর তাই আচার্য হলায়ুধভট্ট সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যায় অবতরণ না করে, ফলস্তুতিযুক্ত নানা স্মৃতি আহরণ করে ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যাদি কর্মের যে সমস্ত মন্ত্র আছে তারই ব্যাখ্যা নিপুণভাবে করেছেন তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে।

*ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামক সরল ব্যাখ্যায় প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য তিনি বিভিন্ন মুনির বচন উদ্ধৃত করেছেন, যাতে ক্ষণকালের জন্য হলেও এই ব্যাখ্যার উপর দৃষ্টিপাত করে প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বদ্ধাঞ্জলি হন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারেরা মন্ত্রাদির ব্যাখ্যার মধ্যে যে অর্থ অপ্রাপ্ত তা বর্ণনা করেননি কিন্তু আচার্য হলায়ুধভট্ট সেইরূপেও মন্ত্রাদির অর্থ তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে করেছেন।

আচার্য হলায়ুধভট্ট রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল, এই গ্রন্থ সূক্ষ্মার্থের অববোধক, অদৃষ্ট বিষয় সমূহের বিকাশকারী, নিস্তারক ও কণ্ঠদেশের ভূষণস্বরূপ ইত্যাদি।

আচার্য হলায়ুধভট্ট ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। আচার্য অনির্বাণের মতে, বেদের মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাগ্রন্থরূপে ব্রাহ্মণগ্রন্থকে ধরা হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণই প্রকৃত বেদব্যাখ্যাকার। তাই তাঁদের দৃষ্টিকোণেই বেদব্যাখ্যাত হয়ে আসছে। আচার্য হলায়ুধভট্ট বলেছেন, 'এতন্নিরাবিলমকারি হলাযুধেন নেত্রদ্বযীবিসদৃশং নযনং দ্বিজানাম্।' অর্থাৎ

ব্রাহ্মণগণের দুটি স্বাভাবিক চক্ষু থেকে বিসদৃশ চক্ষুস্বরূপ করে এই *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

### ৩.১.৪.৩. গ্রন্থারম্ভ প্রয়োজন :

স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে, বেদ অধ্যয়ন করে স্নান করা উচিত। ক্রমানুসারে বেদসমূহ, বেদদ্বয় অথবা একটিমাত্র বেদ অধ্যয়ন করে ব্রহ্মচর্য অব্যাহত রেখে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করা উচিত।[২৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মনুর মতে অন্ততপক্ষে একটিমাত্র বেদ হলেও অধ্যয়ন করা উচিত। আচার্য পারস্করও এই বিষয়ে বলেছেন, বিধি-বিধেয়-তর্ক নামক ত্রিবিধাত্মক বিষয় বেদ ষড়ঙ্গের সঙ্গেই বুঝতে হবে।[২৮] 'বিধিবিধেযস্তর্কশ্চ বেদঃ ষড়ঙ্গমেকে।' মনুর মতে, এই বেদাধ্যয়ন গুরুকুলে থেকে ও ব্রহ্মচারী হয়েই সম্পন্ন করতে হয়।

"তপোবিশেষৈবিধিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।

বেদঃ কৃৎস্নঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা"।।[২৯]

অর্থাৎ সমগ্র বেদই অর্থ সহকারে অধীত হওয়া উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা থাকার জন্য বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান ছাড়া গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশেরই অধিকার থাকে না। সেই অনাধিকারবশতঃ আবার সকল শ্রৌতকর্ম ও স্মার্তকর্মেও অনধিকার উপস্থিত হয়। মনু বলেছেন-

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

---

[২৭] মনু., ৩.২

[২৮] পা. গৃ., ২.৬.৫

[২৯] মনু., ২.১৬৫

সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাসু গচ্ছতি সান্বযঃ।।"[৩০]

অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদপাঠ না করে অন্যশাস্ত্র অভ্যাসে শ্রম করে থাকেন, তিনি এইজন্মেই স্ববংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। এর মধ্য দিয়েই মনু আসলে বলতে চেয়েছেন যে, বেদ অধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান থেকে বিমুখ ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে আবার আয়ু, প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও শ্রদ্ধাদির অল্পত্ব হেতু উৎকল ও পাশ্চাত্ত্যাদি ব্রাহ্মণেরা বেদের শুধুমাত্র অধ্যয়ন করে থাকেন আর রাঢ়ী শ্রেণী, বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বেদের অধ্যয়ন ছাড়া বেদের কিয়দংশের পর্যন্ত অর্থ বোঝার চেষ্টা করেন না এবং এর দ্বারা কর্মমীমাংসা শাস্ত্রের সাহায্যে যজ্ঞের ইতিকর্তব্যতা বিষয়ে আলোচনা করেন। তবে এর দ্বারা মন্ত্রাত্মক বেদ ও তার অর্থ সম্বন্ধে সম্যকজ্ঞান কখনই হবে না। সুতরাং বেদমন্ত্রের অধ্যয়ন জ্ঞান এবং তার অর্থজ্ঞানই প্রয়োজন। কারণ, এইরূপ জ্ঞানই শুভফল আনয়ন করে থাকে এবং এর অজ্ঞানই দোষ বলে শ্রুত হয়। তাই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেছেন-

"যস্তু জানাতি তত্ত্বেন আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবতম্।

বিনিযোগং ব্রাহ্মণশ্চ মন্ত্রার্থজ্ঞানকর্ম চ।।"[৩১]

অর্থাৎ যিনি বেদের এক বা একটি মন্ত্রের যথার্থভাবে ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ, ব্রাহ্মণ, অধ্যয়নজাত ও অর্থজাত জ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞাত হন, তিনিই অতিথির মতো বন্দনীয় হন এবং দেবতাদের সাযুজ্য লাভ করেন।

---

[৩০] মনু., ২.১৬৮

[৩১] যাজ্ঞ., ১.৩১

যে দ্বিজ এই প্রকারে ঋষি, ছন্দ প্রভৃতি জানেন তারই বৈদিক কর্মে অধিকার জন্মায়। এই সকল মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, ঋষি, ছন্দ, দেবতা ইত্যাদি যত্নপূর্বক জ্ঞাত হলেই স্বাধ্যায়ের ফল পরিপূর্ণভাবে লাভ করা সম্ভব এবং বেদগ্রন্থগুলিও অচিরেই তার ফল প্রদান করে থাকে। আর যিনি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ইত্যাদি না জেনে যজন, অধ্যয়ন, জপ, হোম ও অন্তর্জলাদি কর্ম করেন তার ফল অতি অল্প হয়। আসলে যাজ্ঞবল্ক্য বোঝাতে চেয়েছেন যে, বেদাধ্যয়ন করার পর বেদ মন্ত্রের অর্থজ্ঞান হওয়া আবশ্যক। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বেদের কেবলমাত্র অর্থবিচারই করেন। এইভাবে কেবলমাত্র গ্রন্থপাঠের অথবা অর্থজ্ঞানের মাধ্যমে বেদের সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তার চেয়ে বরং বেদের একদেশমাত্র যথাবিধি অধ্যয়ন করে অর্থবিচার করা উচিত। এই বিষয়ে যম বলেছেন, শূদ্র বৃষ নয়, বেদই বৃষ। ব্রাহ্মণই প্রকৃতপক্ষে বৃষপদবাচ্য হন। অতএব সমগ্র না পারলেও বেদের একদেশমাত্রও অন্ততঃপক্ষে অধ্যয়ন করা উচিত। আচার্য ব্যাস এ বিষয়ে বলেছেন, যে ব্রাহ্মণ বেদের কিছু অংশের পাঠ করে তার অর্থবোধের সহায়ক হন, তিনিই স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। আবার চার বেদের অর্থহীনভাবে কেবলমাত্র পাঠ করলে তার দ্বারাই বিশিষ্টতা আনয়ন করা যায় এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের অধিকার জন্মায়। এই ভাবে বেদের একটিমাত্র অংশের অধ্যয়ন কর্তব্যরূপে বিহিত হলেও সংশয় হতে পারে যে, স্বেচ্ছায় বেদের যে কোনও একটি ভাগ পড়তে হবে নাকি অনুষ্ঠানের উচিত ভাগটুকুই পড়তে হবে? তার মধ্যে আবার যদি পাঠক্রমে নির্দিষ্ট কোনও একটি ভাগ অধীত হয় তবে সেই ভাগে সন্ধ্যাস্নানাদি ক্রিয়াকাণ্ডের উপযুক্ত সকল প্রকার মন্ত্র না থাকায় সেই সকল অনুষ্ঠান অসম্ভব। বরং সন্ধ্যাস্নানাদি ক্রিয়াকাণ্ডের উপযুক্ততা যে ভাগে পাওয়া যায় তা পাঠ করাই যুক্তিসংগত। কারণ, এইভাবে অধ্যয়নের দ্বারাই বেদের একদেশের অধ্যয়ন সাধিত হয়ে থাকে। আচার্য মনু

বলেছেন, শুধুমাত্র গায়ত্রী মন্ত্রকে পাঠ করেও অসৎক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ে সন্ধ্যাস্নানাদি নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান এবং অর্থবোধ সহ গায়ত্রী মন্ত্রপাঠে নিরত থাকা যায়।[৩২] এইরকম ব্রাহ্মণ নিন্দিত প্রতিগ্রহাদি এবং অসৎক্রিয়াদি যুক্ত ত্রিবেদবিদ ব্রাহ্মণ থেকেও শ্রেষ্ঠ।

সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করতে অসমর্থ কান্বশাখাধ্যায়ী রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কর্মানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতঃকালীন দন্তধাবন থেকে আরম্ভ করে শয়নক্রিয়া পর্যন্ত, আহ্নিককৃত্য গর্ভাধানাদি থেকে আরম্ভ করে বিবাহ পর্যন্ত সংস্কারসমূহের এবং অগ্ন্যাধানাদি থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত গৃহ্যকর্মের মন্ত্রসমূদায়ের ব্যাখ্যা আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে করেছেন।

### ৩.১.৪.৪. বেদাধ্যয়নের প্রশংসা :

আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বেদাধ্যয়নের প্রশংসাসূচক ধর্মশাস্ত্রকারদের শ্লোকরাশি তুলে ধরেছেন। আচার্য মনু ব্রাহ্মণদের সর্বদা তপস্যাচরণে নিযুক্ত থেকে বেদাভ্যাস করার কথা বলেছেন।[৩৩] যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলেছেন, বেদাধ্যয়নই পরম নিঃশ্রেয়স্কর কার্য।[৩৪] যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, বেদেরই অভ্যাস সর্বদা করণীয়। কারণ, বেদ সনাতন এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবকিছুই বেদ থেকে শিখতে হয়।[৩৫] বেদাধ্যয়নের ফলবিষয়েও আচার্যগণ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, যাঁরা বেদাভ্যাসে সর্বদা নিরত থাকেন তাঁদেরকে মহাপাতক পাপসমূহও স্পর্শ

---

[৩২] মনু., ২.১১৮

[৩৩] তদেব., ২.১৬৬

[৩৪] যাজ্ঞ., ১.৪০

[৩৫] তদেব., ১২,৪১

করতে পারে না। আচার্য মনু যমের উল্লেখ করে বলেছেন, যে মুনি অরণ্যে ফলমূলমাত্র ভক্ষণ করে তপশ্চরণ করেন তাঁর সঙ্গে যিনি প্রত্যহ একটিমাত্র ঋক হলেও অধ্যয়ন করেন তিনিও লোকসমাজে সমমর্যাদা পেয়ে থাকেন।[৩৬]

স্মৃতিকার যমের মতে, বেদ হল বৃষ। শূদ্র প্রকৃতপক্ষে বৃষল পদবাচ্য নয়। যে ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞান নেই তিনিই আসলে বৃষল। তাই বৃষল হবার ভয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই করণীয় হল প্রযত্নপূর্বক বেদের অন্ততঃ একদেশ অধ্যয়ন করা (যদি সমগ্র বেদাধ্যয়ন করা সম্ভব না হয়)। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সেই সময় ব্রাহ্মণেরা হয়তো বেদজ্ঞানবিমুখ হয়ে পড়েছিলেন। তাই আচার্য হলায়ুধভট্ট হয়তো তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* রচনার মাধ্যমে ব্রাহ্মণদেরকে বেদজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হবার কথা বলেছেন। আচার্য হলায়ুধভট্ট বেদের একদেশ অধ্যয়ন বলতে যাবতীয় বেদবিহিত সংস্কারাদি অনুষ্ঠানের উপযুক্ত বেদভাগকে বুঝিয়েছেন। আচার্য মনু বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণদেরকে নামমাত্র ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করেছেন। কাষ্ঠময় হস্তী যেমনভাবে শুধুমাত্র হস্তী নামেরই যোগ্য হয়ে থাকে, চর্মময় মৃগ যেমন কেবলই মৃগপদবাচ্য হয়, যেমনভাবে ক্লীব ব্যক্তি স্ত্রীতে উৎপাদনশক্তিবিহীন হয়, যেমনভাবে বলদের সহযোগে গাভীর সন্তানের জন্ম দেওয়া অসম্ভব, যেমনভাবে অপাত্রে দান নিষ্ফল হয়ে থাকে সেইরূপ বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণও নিষ্ফল।[৩৭] মনু আরও বলেছেন, ব্রহ্মচর্য ব্রত অব্যাহত রেখে সামর্থ্য অনুযায়ী যথাক্রমে বেদসমূহ, বেদদ্বয় অথবা একটিমাত্র বেদাধ্যয়ন করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা উচিত।[৩৮] আচার্য ব্যাস ন্যায়পূর্বক অধীতবেদ ব্যক্তিকেই সৎপাত্র বলে উল্লেখ করেছেন। আবার

---

[৩৬] মনু., ২.১৬৭

[৩৭] তদেব., ২.১৫৭

[৩৮] তদেব., ৩.২

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য অসংযমের সঙ্গে বেদপাঠকারী ব্যক্তির নিন্দা করেছেন। এইভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রকারদের উল্লেখ করে আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বেদাধ্যয়নের প্রশংসা করেছেন।

### ৩.১.৪.৫. বেদার্থজ্ঞানের প্রশংসা :

বেদের পাঠ অর্থবিচার সহ করণীয়। অর্থবিচার না করে বেদপাঠ করলে তিনি শূদ্রতুল্য হন এবং অসৎপাত্রে পর্যবসিত হন।[৩৯] সুতরাং অর্থ সহ বেদপাঠ অবশ্যই করণীয়। আচার্য ব্যাস অর্থজ্ঞান ব্যতীত বেদাধ্যয়নকে বৃথা বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যাসদেব আরও বলেছেন, যদি প্রকৃত ধর্মানুসারী দ্বিজ বেদের কিয়দংশের পাঠ করেও তাঁর অর্থাধিগমে তৎপর থাকেন তবে তিনি স্বর্গলাভের অধিকারী হয়ে থাকেন। বলা হয়েছে,

"অধীত্য যত্কিঞ্চিদপি বেদার্থাধিগমেরতঃ।

স্বর্গলোকমবাপ্নোতি ধর্মানুষ্ঠানবিদ দ্বিজঃ।।"[৪০]

অতএব দেখা যায়, আচার্য মনুও বেদের অর্থজ্ঞান অবগত হওয়া আবশ্যক বলে মনে করেছেন। আচার্য ব্যাসদেবের মতে, সামান্যমাত্র অর্থানুসারে বেদাধ্যয়নই শ্রেষ্ঠ। আবার যাঁরা বেদের নামই শোনেননি তাঁদের থেকে বেদের পাঠক শ্রেষ্ঠ। আবার তাঁদের থেকে যিনি অর্থজ্ঞান বিষয়ে অবগত তিনিই শ্রেষ্ঠ। আবার তার থেকে বেদের অধ্যাত্মচিন্তক শ্রেষ্ঠ। এইভাবে আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে

---

[৩৯] ব্যাস., উঃ ১৪; কূর্ম., ৮৭.৮৯

[৪০] মনু., ১২.১০২

অর্থজ্ঞানসহ বেদাধ্যয়নের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণের মতামতকে যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করেছেন।

## ৩.১.৪.৬. ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ জ্ঞানের প্রশংসা :

বেদাধ্যয়ন এবং বেদার্থজ্ঞানের প্রশংসা করার পর আচার্য হলায়ুধভট্ট ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ ইত্যাদির জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। যিনি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিযোগ, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রার্থ এবং যজ্ঞকর্মে তার প্রয়োগপদ্ধতি জানেন তিনি ইহলোকে শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং ঋষিদের তুল্য তেজোদীপ্ত হন।[৪১] আবার যিনি বেদের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ ইত্যাদি না জেনেই যাজন, অধ্যাপন, জপ, হোম ইত্যাদি কর্ম করেন তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প ফল লাভ করে থাকেন।[৪২] *ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে* বলা হয়েছে, যিনি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ ইত্যাদি জানেন না তিনি স্থাণূগর্তে গমন করেন এবং পাপীয়ান হয়ে থাকেন।[৪৩] ছন্দ হল আচ্ছাদনপ্রক্রিয়া আর যে মন্ত্রের যে দেবতা উদ্দিষ্ট হয় সেই মন্ত্র সেই সেই দেবতাবিশিষ্ট বলে অভিহিত হয়। এই মন্ত্রসমূহ যজ্ঞাদি কর্মের জন্যই সমুৎপন্ন হয়েছিল। মন্ত্রের দ্বারা যে সকল কর্তব্যকর্ম করা হয়ে থাকে, তাকেই বলে বিনিয়োগ। আর বেদের যে অংশে মন্ত্রের সমুৎপত্তি, প্রয়োজন, প্রতিষ্ঠান ও স্তুতি উক্ত থাকে, তাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। এই ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিযোগ ইত্যাদি জেনেই যাজনাদি কর্ম করা উচিত। উবট তাঁর মন্ত্রভাষ্যে ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ ইত্যাদিকে মন্ত্রপাঠের ক্ষেত্রে আবশ্যক জ্ঞানরূপে স্বীকার করেছেন।[৪৪]

---

[৪১] যাজ্ঞ., ১.৩১-৩৭

[৪২] তদেব., ১.২৭-৩১

[৪৩] ছা. ব্রা,, ১.১

[৪৪] উবটকৃত মন্ত্রভাষ্য, ১.১

এইভাবে আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগবিষয়ক যাগমন্ত্রের আবশ্যকতাকে শ্রুতি ও স্মৃতির আলোকে উপস্থাপন করেছেন।

## ৩.১.৫. পুরাণসাহিত্য, স্মৃতি ও নিবন্ধগ্রন্থের প্রমাণ-প্রয়োগের আকররূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* :

আচার্য হলায়ুধভট্ট উবটাচার্য এবং গুণবিষ্ণুর ভাষ্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন। আচার্য হলায়ুধ বলেছেন যে, কিছু মন্ত্র তিনি প্রথম বারের মতো ব্যাখ্যা করেছেন, যা তিনি ভিন্ন অপর কেউ ব্যাখ্যা করেননি। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে- 'দত্ত্বার্থরূপং প্রথমমদত্তমপরৈর্ভুবি'।[৪৫] এই ধরণের মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যার জন্য আচার্য হলায়ুধ বেদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলে মনে হয়। তিনি তাঁর ব্যাখ্যার সময় *শতপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, পারস্করগৃহ্যসূত্রের* থেকে প্রায়শই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন।

হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্বস্বতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নিঘণ্টু, নিরুক্ত, ঋগ্বিধান এবং এই জাতীয় অন্যান্য সহায়ক বৈদিক গ্রন্থগুলির সঙ্গে পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র, বিশেষত, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, মনুস্মৃতি ইত্যাদি থেকে সাহায্য লাভ করেছিলেন। অঘমর্ষণ সূক্তের[৪৬] ব্যাখ্যা করার সময় আচার্য হলায়ুধ যে মন্তব্য করেছেন তার সরলার্থ হল, তাঁর হৃদয় কেঁপে ওঠে এই অঘমর্ষণ স্তোত্রটি ব্যাখ্যা করতে, যা সমস্ত বেদের সারাংশ ধারণ করে এবং চরিত্রের দিক থেকে যা সবচেয়ে রহস্যময়। স্তোত্রটি পদপাঠের দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়নি, ব্রাহ্মণ বা নিরুক্তের দ্বারাও এর ব্যাখ্যা করা হয়নি। তাই, এই স্তোত্রটির ব্যাখ্যায়

---

[৪৫] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ৫

[৪৬] ঋ. সং., ১০.১৯০

কোনও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এমন কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে, হলায়ুধ তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে মন্ত্রটির ব্যাখ্যা সাহসের সঙ্গে করেছেন। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে- "অস্যাঘমর্ষণমন্ত্রস্য ব্যাখ্যানমাচরিতুং হৃদি প্রকম্পো জাযতে যতঃ সর্ববেদসারভূতোঽত্যন্তগুপ্তঞ্চাযং মন্ত্রঃ। অস্য পদপাঠমাত্রং চা নাস্তি ব্রাহ্মণ-নিরুক্তাদিকমপ্যস্য নাস্তি। ইত্যমেতদীযব্যাখ্যানানুমুণং কমপ্যুপাযমপ্রাপ্য যদেতস্য স্বকপোলমাত্রেণ ব্যাখ্যানমাচরণীযং তদতিসাহসম্।"[৪৭]

আচার্য হলায়ুধ একটি বৈদিক মন্ত্রের তাৎপর্য-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, পদপাঠ এবং *নিরুক্ত* থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য সাহায্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন। তাই আচার্য হলায়ুধের পক্ষে অঘমর্ষণ স্তোত্র ব্যাখ্যা করতে যাওয়ার আগে ব্রাহ্মণ, *নিরুক্ত*, পদপাঠ ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই অঘমর্ষণ মন্ত্রটির তাৎপর্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মণে কোনওরূপ সহায়ক মন্ত্ররাজি নেই, পদপাঠেও এই মন্ত্রটিকে বিশ্লেষিত করা হয়নি এবং *নিরুক্তে*ও এই স্তোত্রটির বিষয়ে কোনওরূপ মন্তব্য করা হয়নি। ১০৫৫২টি ঋগ্বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে শাকল্য পদপাঠে মাত্র ৬টি মন্ত্রের পদপাঠ নির্ণয় করেননি, তার মধ্যে একটি হল এই অঘমর্ষণ মন্ত্র। একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান আচার্য হলায়ুধের মতো একজন বৈদিক পণ্ডিত ছাড়া আর কারও কাছেই এই তথ্যটি জানা সম্ভবপর হয়নি।

এইভাবে অগ্রগণ্য বৈদিক উৎসগুলির থেকে অঘমর্ষণ স্তোত্রের অর্থ সম্পর্কে কোনও ধারণা না পেয়ে আচার্য হলায়ুধ ধর্মশাস্ত্রের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*র আলোকে মর্মোদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*র সঙ্গে বৈদিক মন্ত্রের তাৎপর্যের অনেক মতপার্থক্য দেখা যায়। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি* অনুসারে এই

[৪৭] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ৯৯

অঘমর্ষণ মন্ত্রটিতে রয়েছে সৃষ্টি, স্থিতি এবং জগতের বিলুপ্তি বা লয়। আচার্য হলায়ুধভট্ট *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*তে উক্ত অঘমর্ষণ মন্ত্র সম্পর্কিত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন এবং তারই আলোকে অঘমর্ষণ স্তোত্রটির ব্যাখ্যা করেছেন।

শুধু তাই নয়, আচার্য হলায়ুধভট্ট অঘমর্ষণ স্তোত্রের অন্তর্ব্যাখ্যার প্রথাগত পঙ্‌ক্তিটি খুঁজে পেয়েছেন। *বৃহদ্দেবতা*র একটি বিবৃতি অনুযায়ী, এই অঘমর্ষণ স্তোত্রটির অনেক বিবর্তন ঘটেছে। *বৃহদ্দেবতায়* বলা হয়েছে, "ভাববৃত্তং পরং সূক্তং তদর্থাথাঘমর্ষণঃ"।[৪৮] *বৃহদ্দেবতায়* আরও বলা হয়েছে,

"যথোদমগ্রে নৈবাসীদসদপ্যথবাপি সৎ।

যজ্ঞে যথেদং সর্বম তদ ভাবদত্তং বদন্তি তু"।।[৪৯]

'নমো বঃ পিতরঃ শুষ্মায়'[৫০] ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য হলায়ুধ প্রমাণ হিসাবে *শতপথব্রাহ্মণ* থেকে 'ষডবা ঋতবঃ পিতরঃ' মন্ত্রাংশটিকে উদ্ধৃত করে ছয় ঋতুর সঙ্গে পিতৃগণকে চিহ্নিত করেছেন। এই ব্যাখ্যাটিকে রঘুনন্দন তাঁর শ্রাদ্ধতত্ত্বে (পিণ্ডপূজা) অন্যান্য ব্যাখ্যার থেকে উৎকৃষ্ট বলে স্বীকার করেছেন।

আচার্য হলায়ুধ তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* 'গাতুবিদঃ' পদটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'গাতুং যজ্ঞং বিদন্তি জানন্তীতি'[৫১] অর্থাৎ যাঁরা যজ্ঞের বিষয় জানেন, তাঁরাই 'গাতুবিদঃ'। এখানে যে 'গাতুবিদঃ' পদটি রয়েছে, তার অর্থ হল যজ্ঞ।[৫২] আবার আচার্য হলায়ুধ *শতপথব্রাহ্মণ* ও *কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে*র নির্দেশাবলি অনুসরণ করে রাষ্ট্রব্রত

---

[৪৮] বৃহদ্., ৮.৯১

[৪৯] তদেব., ২.২০

[৫০] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ১৮২; শ. ব্রা., ২.৪.২.২৪

[৫১] তদেব., পৃ. ৩২০

[৫২] দেবা গাতুবিদ ইতি গাতুবিদো হি দেবা গাতুং বিত্তেতি যজ্ঞং বিত্ত্বেত্যেবৈতদাহ। শ. ব্রা., ১.৯.২.২৮

গ্রন্থটিকে ১২টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই গ্রন্থের মন্ত্রগুলিকে বিভক্ত আকারে আচার্য হলায়ুধভট্ট কখনও জানতেই পারতেন না, যদি না তিনি প্রাথমিক বৈদিক তথ্যসূচির সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত হতেন।

### ৩.১.৬. *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* সংস্কারতত্ত্ব :

মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-গৌতমাদি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারেরা যেসব সংস্কারের কথা বলেছেন তদপেক্ষা আচার্য হলায়ুধভট্টের *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে সংস্কারসমূহের নাম ও ক্রিয়াকাণ্ডের কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সম্-পূর্বক কৃ ধাতুর উত্তর ঘঞ্-প্রত্যয়ে সংস্কার শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সংস্কার শব্দের অর্থ হল- শুদ্ধি, শোধন, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদির দ্বারা পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার ইত্যাদি। যে ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষ শুদ্ধ হয় তাকে বলা হয় সংস্কার। তাই শবরস্বামী বলেছেন, সংস্কার হল এমন একটি ক্রিয়া, যা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে যোগ্য করে তোলে।[৩] শাস্ত্রে বলা হয়েছে- পিতার বীজজনিত ও মাতার গর্ভজনিত হওয়ার কারণে আমাদের এই শরীর পাপসম্ভূত; সংস্কারের দ্বারা শরীরের পবিত্রতা সিদ্ধি হয়।[৪] শ্রীভাষ্যকার বলেছেন, 'সংস্কারো নাম কার্যান্তরকরণযোগ্যা'।[৫৩] আচার্য মনুর মতে, সংস্কারের দ্বারাই সাধারণ এই শরীর ব্রহ্মলাভের যোগ্য হয়ে ওঠে।[৫৪] আর এই সংস্কারের দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজসংজ্ঞায় অভিহিত হন। শংকরাচার্যের মতে- সংস্কারের দ্বারা দোষাপনয়ন ও গুণোৎপাদন হয়।[৫৫] এককথায়, সংস্কারের দ্বারা কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর বিশুদ্ধতা সম্পাদনের মাধ্যমে তা জাগতিক ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। তাই সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, বাসস্থান প্রভৃতির পরিশুদ্ধির

---

[৫৩] বে. ত. স., শারীরকমীমাংসাভাষ্য,পৃ.৭

[৫৪] ব্রাহ্মীযং ক্রিযতে তনুঃ। মনু., ২.২৮

[৫৫] সংস্কারো বি নাম গুণাধানেন বা স্যাদ দোষাপনযনেন বা। শাঙ্করভাষ্য, বেদান্ত., ১.১.৪

মতো আমাদের শরীর তথা মনেরও পরিশুদ্ধি বা সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কারমুক্ত নির্মল মনের প্রার্থনা কবি রজনীকান্ত সেনের গানেও প্রকাশ পেয়েছে- ‘‘তুমি নির্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন-মর্ম-মুছায়ে। তব পূণ্যকিরণ দিয়ে যাক মোরে মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।’’[৫৬]

## ৩.১.৬.১. সংস্কারের উপযোগিতা :

আধুনিককালেও এই সংস্কারগুলির উপযোগিতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েনি। সুপ্রাচীনকাল থেকে শাস্ত্রসম্মত সংস্কারসমূহ কোনও রাষ্ট্রিক আইন ছাড়াই কিছু না কিছু যে এখনও পর্যন্ত সমাজে টিকে আছে তাই বা কম কীসের। আধুনিককালে রেজিস্ট্রি বিবাহ কিংবা বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দিরে গিয়ে বিবাহ হলেও এখনও শাস্ত্রীয় বিধি মেনে গৃহে আনুষ্ঠানিক বিবাহকেই অতি পবিত্র বলে মানা হয়। কেশান্তসংস্কার, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এখনও নিষ্ঠাবান গৃহে অত্যন্ত সাদরে পালিত হয়। তবে সময় সুযোগের অভাবে গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, চূড়াকর্ম প্রভৃতি সংস্কারগুলি আলাদাভাবে করা হয়ে ওঠে না ঠিকই, তবুও কোথাও কোথাও এগুলিও যথানিয়মে পালিত হয় কিংবা কয়েকটি সংস্কার এককভাবে পালন করা হয়ে থাকে। এর থেকে বোঝা যায় যে, সংস্কারসমূহ পর্যালোচনার উপযোগিতা আধুনিক সময়েও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি।

## ৩.১.৬.২. সময় ও শাস্ত্রভেদে সংস্কারের সংখ্যার ভিন্নতা :

সময় ও শাস্ত্রভেদে সংখ্যার দিক থেকে সংস্কারের বিভিন্ন রকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গৌতমের *ধর্মসূত্রে* চল্লিশ ধরনের সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৭] স্মৃতিশাস্ত্রকার আচার্য মনু একাদশ ধরনের সংস্কারের কথা বলেছেন। আচার্য মনু নিষেক

---

[৫৬] নির্ভর , রজনীকান্ত সেনের *বাণী* কাব্যগ্রন্থ।

[৫৭] H. D., P.V.Kane, vol.1, part.1, p.37.

থেকে শ্মশানকর্ম পর্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপকেই সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৫৮] *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়*ও এই সংস্কারগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কেশান্ত সংস্কার ও সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের উল্লেখ *মনুসংহিতায়* পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালের ধর্মশাস্ত্রকারগণ অবশ্য অন্ত্যেষ্টিকে সংস্কারের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন না। রঘুনন্দনের *অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে*ও দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৯] ভাষ্যকার আচার্য হলাযুধের মতে – গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ – এই হল দশবিধ সংস্কার।[৬০]

বর্তমান কালের সমাজব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে যন্ত্রচালিত, ভোগসর্বস্ব ও ব্যস্ততম জীবনে সমস্ত সংস্কার পালন করা সম্ভব না হলেও সেগুলি এখনও কিছু সংস্কারমনস্ক নিষ্ঠাবান মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এজন্যে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে প্রাপ্ত সংস্কারগুলির গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া সংক্ষেপে তুলে ধরা হল–

## ৩.১.৬.৩. বেদভাষ্যকার হলায়ুধ ও সংস্কারসমূহ :

হলায়ুধ তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামক বেদভাষ্য গ্রন্থে সংস্কারসমূহের কথা বলেছেন যেগুলি ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ বলে অভিহিত হয়েছে। বেদের মধ্যে এই সংস্কারগুলি সম্পর্কে নানা রকম তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বোঝা যায় যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই সংস্কারগুলির প্রচলন রয়েছে এবং অদ্যাবধি পর্যন্ত তার ধারা বয়ে চলেছে। হয়তো আগামী দিনেও তা থাকবে। তবে বৈদিক যুগে সংস্কারগুলির যে সংখ্যা ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি

---

[৫৮] মনু. ২.১৬

[৫৯] স.স.র., পৃ. ১১৭

[৬০] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ২০৪

ছিল পরবর্তী সময়ে তার অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছে। সে সময় যেখানে ৬৪ রকমের সংস্কারের প্রচলন ছিল, সূত্রসাহিত্যের যুগ ছাড়িয়ে ধর্মশাস্ত্রের যুগে সেই সব সংস্কারের অনেকগুলিই লুপ্ত হয়েছে আবার সংস্কার পালনের ক্ষেত্রেও ঘটেছে নানা সরলীকরণ। তবে ধর্মশাস্ত্রে সংস্কারের যে কঠোরতা বা কাঠিন্য ছিল পুরাণের সময়ে তা পরিবর্তিত হয়ে অনেক সরল হয়েছে। বর্তমান সময়ে এই সংস্কারগুলি সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে পালিত হয়। মানবজীবনে জন্মের পূর্ব থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত এইসব সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে।

### ৩.১.৬.৪. গর্ভাধান :

প্রথম সংস্কার হল গর্ভাধান। এর অর্থ হল জরায়ুতে শুক্রস্থাপন। গর্ভাধান বলতে বোঝায় গর্ভোৎপাদন; এটি স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহরূপ সংস্কারবিশেষ। আচার্য মনু এই সংস্কারকে নিষেক নামে অভিহিত করেছেন। গর্ভাধান সংস্কারে স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শনের ১৬ দিনের মধ্যে স্বামী পবিত্র হয়ে সন্ধ্যায় সূর্যার্ঘ্য প্রদান করে যথাবিধি বহ্নিস্থাপনের পর পঞ্চগব্য দ্বারা স্ত্রীকে শোধন করে সন্তান উৎপাদনার্থ গ্রহণ করেন। গৃহ্যসূত্র মতে, এই সংস্কারের সূচনায় স্ত্রী যথাবিধি সুসজ্জিত হন এবং স্বামী সৃষ্টিসংক্রান্ত বৈদিক স্তোত্র উচ্চারণ করতে করতে দেবগণকে আহ্বান জানান, যাতে তাঁরা তার স্ত্রীকে গর্ভধারণে সহায়তা করেন। অতঃপর নারী ও পুরুষের যৌনক্রিয়া-সংক্রান্ত স্তোত্রগুলি উচারণ করতে করতে তাঁরা গর্ভোৎপাদন কার্য করেন। স্বামী পুরুষের উৎপাদন-ক্ষমতা-সংক্রান্ত স্তোত্র উচ্চারণ করতে করতে স্ত্রীর দেহে নিজের শরীর ঘর্ষণ করেন। আলিঙ্গনের পর পূষণের নিকট প্রার্থনার মাধ্যমে গর্ভস্থাপনের কাজ শুরু হয়। হলায়ুধ *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* গর্ভাধানের পূর্বে বিবাহের চতুর্থ রাত্রিতে চতুর্থীকর্ম করার বিধান দিয়েছেন। আবার

বলেছেন যে, যদি নিষেকের সময়ে গর্ভাধান না হয় তবে পুনর্বসুনক্ষত্রের দিনে গর্ভোৎপাদন-কার্য নিষ্পন্ন করতে হয়।[৬১] তবে কোনও কোনও আচার্য চতুর্থীকর্ম সম্পাদনের শেষে তিন রাত্রির পর সহবাসের বিধান দেন। চতুর্থীকর্মকে অনেকে আলাদা সংস্কার বললেও আচার্য হলায়ুধ কিন্তু চতুর্থীকর্মকে স্বতন্ত্র সংস্কার না বলে অঙ্গসংস্কার বলেছেন। যজ্ঞকর্মের পূর্বে যজ্ঞীয়কাষ্ঠ সমিধের শুদ্ধীকরণের মতো গর্ভাধানের পূর্বে পতি-পত্নীর শুদ্ধির জন্য এই কর্ম করা হয়ে থাকে। গর্ভাধান সংস্কার আসলে গর্ভপূজার নামান্তর। আচার্য মনু এই সংস্কার সম্পর্কে বলেছেন- ঈশ্বরের প্রার্থনা না করে যে শিশুকে জগতে নিয়ে আসা হয়েছে সেই শিশুটি সমাজের পক্ষে একটি অভিশাপ। আমাদের কাছে এখন যে স্মৃতিশাস্ত্রগুলো এসেছে সেগুলো এমনিতেই কত প্রাচীন, পণ্ডিতরা বলেছেন- প্রায় আড়াই হাজার বছর পুরনো। তার মানে এই সংস্কারগুলো যিশু খ্রিস্টের জন্মের পাঁচ ছ'শ বছর আগে থেকে অনুশীলিত হয়ে আসছিল। জুলিয়াস সিজার ফ্রান্সের লোকেদের বলতেন বর্বর জাতি। তারও পাঁচশ বছর আগে এই বিধিগুলি রীতিমতো ভারতে অনুশীলন করা হচ্ছিল। গর্ভাধান সংস্কারে বিশেষ পূজোর পরেই স্বামী-স্ত্রী দুজনের মিলিত হওয়ার নিয়ম ছিল। সেখানে হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদানের মধ্য দিয়ে স্তব-স্তুতি করা হত। তবে এই সংস্কারের প্রচলন বর্তমান কালে না থাকলেও এখনও অনেক ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহ অর্থে তা পালন করা হয়ে থাকে। অথর্ববেদে গর্ভাধান সংস্কার বিষয়ে বলা হয়েছে -

"পরিহস্ত বিধারয যোনিং গর্ভায ধাতবে।

---

[৬১] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ২০৭

মর্যাদে পুত্রমা ধেহি তম্ ত্বমা গময়াগমে।।"[৬২]

### ৩.১.৬.৫. পুংসবন :

পুংসবন হল দ্বিতীয় সংস্কার। গর্ভিণীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে কর্তব্য সংস্কার-বিশেষ হল পুংসবন। গর্ভের তৃতীয় মাসে রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে নন্দ ও ভদ্রা তিথিতে পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, পুর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্বসু, মৃগশিরা, পুষ্যা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্র থাকলে এবং যুতযামিত্রবেধ ও দশযোগভঙ্গ না হলে লগ্নের নবম ও পঞ্চমে এবং লগ্ন চতুর্থ, সপ্তম ও দশমে শুভগ্রহ ও তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশে পাপগ্রহ অবস্থান করলে গর্ভিণীর চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি হলে কুম্ভ, মিথুন, সিংহ, ধনুঃ ও মীন লগ্নে পুংসবন সংস্কার কর্তব্য। পুত্রসন্তান লাভের ইচ্ছায় এই সংস্কার করা হয়। বিবাহের পরবর্তীকালে কন্যা শ্বশুরবাড়ি চলে যান, পিতৃতর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে পুৎ-নামক নরক থেকে পুত্র পিতাকে উদ্ধার করেন বলে পুত্রসন্তান সকলেরই কাঙ্ক্ষিত। বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে যদিও ছেলেমেয়ে সমান বলে মনে করা হয় তা সত্ত্বেও এখনও প্রায়শ-ই পরিবারের সকলেই মনে মনে পুত্রসন্তান কামনা করে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, পুংসবন সংস্কার করলেই কি পুত্রসন্তান উৎপন্ন হত? তাহলে তো সকলেই পুত্রসন্তান কামনা করতেন এবং সকলেই পুত্রসন্তান লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তাহলে কি কোনও একসময় জৈবিক প্রক্রিয়ার ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ত না? আচার্য রঘুনন্দন গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন-সংস্কারগুলি সকল গর্ভের ক্ষেত্রে পালনের বিধান দেননি, তিনি এই সংস্কারগুলির শুধু একবার পালনেরই বিধান দিয়েছেন। তবে কী এই পুংসবন সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে পুত্রসন্তান নিশ্চিত ছিল? যদি এই পুংসবন সংস্কার করার পরেও কারও পুত্রসন্তান না

---

[৬২] অথর্ব., ৬.৮১.২

হত, তাহলে সেই সব পিতামাতার কী করণীয়? সে বিষয়েও শাস্ত্রে কোনও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় নি। তবে কী এই সংস্কারটি ছিল নিছক আনুষ্ঠানিক? এইরূপ নানা রকমের প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আলোচ্য সংস্কারে প্রযুক্ত বিধিবিধান ও ক্রিয়াকর্মাদির দ্বারা পুত্রসন্তান লাভের বৈজ্ঞানিক যুক্তি কতটা আছে তা নিশ্চিতভাবে কিছু বোঝা যায় না।

গর্ভ সৃষ্টির পর স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের সবারই দুশ্চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক যে গর্ভস্থ সন্তান সুরক্ষিত থাকবে কি না। তাই গর্ভের সন্তানের সুরক্ষার জন্য এটাকে একটা মঙ্গলকামনামূলক অনুষ্ঠান বলা যায়। তবে সমাজের অধিকাংশের কাছে কন্যাসন্তানের তুলনায় পুত্রসন্তান অধিক কাম্য ছিল তা এই সংস্কারের নামকরণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। এক কথায়, পুত্রসন্তান যে সংস্কারে কামনা করা হয় ও গর্ভের শিশুকে রক্ষা করার জন্য যে সংস্কার পালন করতে হয় তা হল পুংসবন সংস্কার। এই সংস্কার সম্পর্কে বেদেও বলা হয়েছে,

"যাসাং দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্র মূলং বীরুধা বভুব।

তাস্তা পুত্র বিদ্যায দৈবীঃ প্রাবন্ত্বোষধয।।"[৬৩]

### ৩.১.৬.৬. সীমন্তোন্নয়ন :

তৃতীয় সংস্কার হল সীমন্তোন্নয়ন। সীমন্ত শব্দের অর্থ হল কেশরচনাবিশেষ। গর্ভিণীর বিশেষ প্রকার কেশবন্ধন বিষয়ক সংস্কার হল সীমন্তোন্নয়ন। এই সংস্কারের মূলে রয়েছে গর্ভিণীর মনে আনন্দ উৎপাদন। সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার বর্তমানে গর্ভিণীর সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পুংসবন করা হয় প্রথম পাঁচ মাসের

[৬৩] অথর্ব., ৩.২৩.৬

মধ্যে আর সীমন্তোন্নয়ন পরের পাঁচ মাস থেকে আট মাসের মধ্যে। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়* ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের বিধান দেওয়া হয়েছে।[৬৪] *পারস্করগৃহ্যসূত্রেও* গর্ভের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আচার্য হলায়ুধও *পারস্করগৃহ্যসূত্রের* মত অনুসরণ করেছেন।[৬৫] এই সংস্কারের আলোচনায় প্রথম গর্ভের উল্লেখ থাকায় মনে হয় প্রতি গর্ভের ক্ষেত্রে এই সংস্কারের প্রসঙ্গ নেই। সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের দিনে পূর্বাহ্নেই গর্ভিণী পুংসবন সংস্কারে উক্ত নিয়মে স্নানাদি সম্পন্ন করে অগ্নির পশ্চিম দিকে এলে পতি পত্নীর পিছনের দিকে এসে পূর্বাহূত দুটি নীলবর্ণ যজ্ঞডুমুরস্তবক 'অয়মূর্জ্জাবতোবৃক্ষঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে বধূর গলায় বেঁধে দেবেন। তারপর পতি তিনবার কুশাগ্রপরিবেষ্টিত কেশ 'ভুঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে প্রথম সীমন্ত, 'ভুবঃ' মন্ত্র পাঠ করে দ্বিতীয় সীমন্ত এবং 'স্বঃ' মন্ত্র পাঠ করে তৃতীয় সীমন্ত উন্নীত করবেন। এরপর পতি শর, শলা এবং তিন স্থান শ্বেতবর্ণ ও মধ্যের দুইস্থান কৃষ্ণবর্ণ এরূপ একটি সজরুকন্টক এই তিন বস্তু দ্বারা 'যেনাদিতে', 'রাকামহং', 'যান্তেরাকে' ইত্যাদি তিন মন্ত্র পাঠ করে ক্রমশ তিনটি সীমন্ত উন্নীত করবেন। এরপর তিলতণ্ডুলমিশ্রিত কৃসরান্নের উপরে ঘৃতস্রুব দিয়ে পতি পত্নীকে দেখিয়ে বলবেন 'কিং পশ্যসি? প্রজাং' ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্বভাগ 'কিং পশ্যসি' পতি নিজে বলে – 'প্রজাং পশুন সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘাযুষ্টঞ্চ পত্যুঃ'– এই অংশ পত্নীকে পাঠ করাবেন। এরপর পত্নী পূর্বোক্ত কৃসরান্ন ভোজন করালে পতিপুত্রবতী ব্রাহ্মণীরা 'বীরপুত্র প্রসব করো, দীর্ঘজীবী পুত্রের জননী হও, চিরদিন সধবা থাকো' ইত্যাদি আশীর্বাদে গর্ভিণী বধূকে অভিনন্দিত করবেন।

---

[৬৪] ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সামন্তৌ মাস্যেতে জাতকর্ম। যাজ্ঞ., ১.১১

[৬৫] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ২১০; পা. গৃ., ১.১৫.১-৩

## ৩.১.৬.৭. সোষ্যন্তীকর্ম ও অবরাবপতন :

এই সংস্কারের সাথে কিছু অঙ্গকর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের দুটি অঙ্গকর্ম আছে- সোষ্যন্তীহোম বা সোষ্যন্তীকর্ম এবং অবরাবপতন। বলাবাহুল্য, এগুলি কোন সংস্কার নয়, এগুলি অঙ্গকর্ম। গর্ভিণীর প্রসববেদনা অনুভূত হওয়ার পর সুষ্ঠুভাবে সন্তান প্রসবের জন্য যে হোম করা হয়, তার নাম হল সোষ্যন্তীকর্ম। এই অঙ্গকর্মগুলির কথা মনু-যাজ্ঞবল্ক্য কেউই বলেননি। আচার্য হলায়ুধ সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারের অঙ্গকর্ম হিসাবে এই কর্মগুলির কথা বলেছেন। এক কথায়, এই সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য হল- দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা হয় এই গর্ভ যেন সুরক্ষিত থাকে এবং জাতক যেন বুদ্ধিমান ও খুব বড় মেধাবী হয়। তার সঙ্গে প্রার্থনা করা হয় জাতককে যেন চাঁদের মতো সুন্দর দেখতে হয়। এই সংস্কার বিষয়ে বেদে বলা হয়েছে,

"রাকামহঃ সুহবাং সুষ্টতি হুবে শৃণোতো ন শুভগা বোধোতুত্মানা।

সীব্যত্মপঃ সুচ্যা হচ্ছিদ্যমানযা দদাতু বীরং শতদায মুকথ্যম্।।"[৬৬]

## ৩.১.৬.৮. জাতকর্ম :

চতুর্থ সংস্কার হল জাতকর্ম। জাতকর্ম এখনও অনেকেই পালন করে থাকেন। নাড়ীছেদনের আগে পিতা সদ্যোজাত সন্তানের মুখদর্শন করেন। পিতা যখনই সন্তানের মুখদর্শন করেন তখন সেই মুহূর্তে তিনি পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন বলে মনে করা হয়। এই সময় সন্তানের একটি গুপ্ত নাম দেওয়া হয়, যাতে কেউ নবজাতকের কোনওরকম অমঙ্গল বা ক্ষতিসাধন করতে করতে না পারে। তবে এই নামটি সন্তানের পিতা ও মাতা ব্যতীত অন্য কেউ জানতে পারতেন না। তবে এখনকার দিনে এই

[৬৬] ঋ. স., ২.৩২.৪

ধরনের গুপ্ত নামকরণের কোনওরকম প্রথা দেখতে পাওয়া যায় না। বর্তমানে সন্তান উৎপন্ন হওযার ষষ্ঠ দিনে ছয়ষষ্ঠী হিসেবে পালন করে নামকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। কোনও কোনও আচার্য এই সংস্কারকে পৃথক সংস্কাররূপে না ধরলেও আচার্য হলায়ুধ কিন্তু এই সংস্কারকে একটি স্বতন্ত্র সংস্কার বলেছেন। তাঁর মতে, গর্ভিণীর নাড়ীছেদনের মাধ্যমে সন্তানের মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার যে প্রক্রিয়া, তা-ই জাতকর্ম সংস্কার নামে পরিচিত। এই সংস্কারের সঙ্গে দুটি অঙ্গসংস্কারও জড়িত, তবে তার কথা অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রকারদের শাস্ত্রগ্রন্থে তেমন একটা তুলে ধরা হয়নি। 'সূতিকাগারহোম' এবং 'বালগ্রহোপশান্তি' নামে দুটি অঙ্গকর্ম এই জাতকর্ম সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত।[৬৭] তবে বর্তমানে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসালয়ে বা চিকিৎসকের সান্নিধ্যে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা থাকায় জাতকর্ম সংস্কারের বিভিন্ন নিয়মনিষ্ঠা তেমন একটা পালন করা হয় না বললেই চলে।

### ৩.১.৬.৯. নিষ্ক্রমণ :

নিষ্ক্রমণ হল জাতকর্মের পরবর্তী সংস্কারবিশেষ। পুত্রজন্মের তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে চন্দ্রদর্শনপ্রক্রিয়া সমাপনান্তে নিষ্ক্রমণের বিধান আছে। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা চার মাসে শিশুর নিষ্ক্রমণ সংস্কারের উপদেশ দিয়েছেন।[৬৮] তবে বর্তমানে প্রায়শ-ই নিষ্ক্রমণ সংস্কার ষষ্ঠীপূজার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এই দিন একটা সামান্য পূজার্চনা করে শিশুকে প্রথম সূতিকাগার থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয়। সুশ্রুতসংহিতা ও চরকসংহিতাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিশুকে কতদিনে প্রথম সূর্যের

---

[৬৭] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ২২৯-২৩০

[৬৮] ...চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমণঃ। যাজ্ঞ., ২.১২

আলোতে এবং বাইরের বাতাসে নিয়ে আসা উচিত। এগুলি করা হয় যাতে শিশুর কোনও সংক্রামক ব্যাধি না হয়। আচার্য হলায়ুধও *পারস্করগৃহ্যসূত্রের* মত উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই নিষ্ক্রমণ সংস্কারে শিশুকে প্রথম সূর্যদর্শন করানো হয়।

### ৩.১.৬.১০. অন্নপ্রাশন :

অন্নপ্রাশন হল এমন একটি সংস্কার বিশেষ যেখানে শিশুকে প্রথম মুখে অন্নগ্রহণ করানো হয়। এই সংস্কারটি বর্তমানে বেশির ভাগ লোককেই পালন করতে দেখা যায়। মোটামুটি ছয় মাস বয়স হয়ে গেলে শিশুর অন্নপ্রাশন করা হয়।[৬৯] এই দিন শিশুকে প্রথম সামান্য অন্ন মুখে তুলে দেওয়া হয়। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রেও আজকাল ছয় মাস থেকে শিশুকে দুধ খাওয়ার পরিমাণ কমানোর কথা বলা হয়। ছয় মাস পর্যন্ত শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্য শ্রেষ্ঠ । ছয় মাস বয়স থেকে শিশুকে মাতৃস্তন্য ভিন্ন অন্যান্য খাদ্য একটু একটু করে খাওয়ানো শুরু করতে হয়। বর্তমানে এই সংস্কারটি সাড়ম্বরে পালন করা হয়।

### ৩.১.৬.১১. চূড়াকরণ :

'চূড়া' শব্দের অর্থ হল গোছা চুল, তার জন্য কৃত কর্মই হল চূড়াকর্ম। মনুর মতে, সকল দ্বিজাতির প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ করণীয়। আচার্য হলায়ুধও একই মত পোষণ করেছেন।[৭০] তবে এই সংস্কার এখন আর তেমনভাবে পালন করা হয় না।

---

[৬৯] ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং...। যাজ্ঞ., ২.১২

[৭০] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ২৩৪

## ৩.১.৬.১২. উপনয়ন :

উপ শব্দের অর্থ সমীপে এবং নয়ন মানে নিয়ে যাওয়া। বেদাদি অধ্যয়নের জন্য গুরুর নিকট নিয়ে যাওয়া বা উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াই হল উপনয়ন সংস্কার। মনুর মতে, জন্ম থেকে ব্রাহ্মণের অষ্টম, ক্ষত্রিয়ের একাদশ এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষ হল উপনয়ন সংস্কারের কাল।[৭১] বর্তমানে এই উপনয়ন কালের মধ্যে নানা রকমের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ হল, শিক্ষানুরাগী পিতা-মাতার সন্তানের শিক্ষার প্রতি অতি সচেতনতা। তৎকালীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় দ্বিজ বর্ণের এই উপনয়ন সংস্কার করা হত। দ্বিজ বর্ণ বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদেরকেই বোঝানো হয়। শূদ্রদের এই উপনয়ন সংস্কার হত না। দ্বিজ বর্ণের যখন উপনয়ন সংস্কার করানো হয় তখন তাঁরা যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন এবং বেদ অধ্যয়নের অধিকার লাভ করেন। তারপরেই তাঁরা বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত গুরুগৃহে চলে যেতেন। বর্তমানে সেই গুরুগৃহে থেকে বেদাধ্যয়নের পরম্পরা আর নেই বললেই চলে। তৎকালীন গুরুগৃহে অনুষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা অধুনা বিদ্যালয়কেন্দ্রিক হওয়ায় বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে শিশুর হাতেখড়ির প্রক্রিয়ায় যেমন উপনয়ন সংস্কার আধুনিক রূপ পেয়েছে, তেমনি বিদ্যাসমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়ে স্বগৃহে ফিরে আসারূপ সমাবর্তন সংস্কারের যে ধারণা, তার প্রক্রিয়াও বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাঠসমাপনান্তে প্রচলিত আছে। আচার্য হলায়ুধও তাই এই সংস্কারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

---

[৭১] গর্ভাষ্টমেঽব্দে কূর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনাযনম্ গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ। মনু., ২.৩৬
তুল. গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বা'ব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনাযনম্ রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলম্ যাজ্ঞ., ১.১৪

## ৩.১.৬.১৩. সমাবর্তন :

উপনয়ন সংস্কারের পরবর্তী সংস্কার হল সমাবর্তন সংস্কার। কোনও কোনও স্মৃতিশাস্ত্রকার সমাবর্তনকে উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত করলেও আচার্য হলায়ুধ কিন্তু এই সংস্কারকে স্বতন্ত্র সংস্কারের মান্যতা দিয়েছেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধান্য থাকায় গুরুগৃহে থেকে বেদাধ্যয়নের পরম্পরা প্রচলিত ছিল। সেই সময় সমাবর্তন হওয়া মানে তাঁর ব্রহ্মচর্য আশ্রম শেষ। সমাবর্তনের মন্ত্রগুলি তৈত্তিরীয় উপনিষদেই রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, *'বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্মং চর।*[৭২] বেদাধ্যয়ন শেষে শিষ্য বা শিক্ষার্থী তাঁর অবশিষ্ট জীবনটা কীভাবে অতিবাহিত করবেন তারই একটা নির্দেশিকা এই সমাবর্তন সংস্কারে বলে দেওয়া হয়।

## ৩.১.৬.১৪. বিবাহসংস্কার :

সকল সংস্কারের মধ্যে বিবাহ হল সর্বাপেক্ষা অতিপরিচিত সংস্কার। কয়েকটি ছোট ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হয়। বিবাহের সমার্থক হিসাবে পাণিগ্রহণ, দ্বারকর্ম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। মূলত ধর্ম, প্রজা ও রতি- এই তিন প্রকার উদ্দেশ্য বিবাহের মাধ্যমে সাধিত হয়। আচার্য মনুর মতে, সমাবর্তন সংস্কারের পর দ্বিজের সুলক্ষণসম্পন্না সজাতীয় কন্যাকে বিবাহ করা উচিত।[৭৩] এ থেকে বোঝা যায়, সমাবর্তন না হলে দ্বিজ যেমন বিবাহের অযোগ্য, তেমনি কন্যা সুলক্ষণা না হলে তিনিও বিবাহের অযোগ্যা। এককথায়, উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিণত বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ সংস্কারে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। আচার্য হলায়ুধও বিবাহের ক্ষেত্রে পরিণত বয়স,

---

[৭২] তৈ. উ., ১.১১

[৭৩] মনু., ৩.৪

সুলক্ষণা কন্যা এবং সজাতীয় কন্যা ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সংস্কারের সঙ্গেই চতুর্থীকর্ম নামে একটি অঙ্গকর্মের কথাও হলায়ুধ বলেছেন। বিবাহ সংস্কার পুরোপুরি উপচারভিত্তিক সংস্কার। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে পুরুষ আর নারী পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে পবিত্রভাবে বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করার অঙ্গীকার করা হয় এই সংস্কারে। উল্লেখ্য যে, স্মৃতিশাস্ত্রকাররা বিবাহকে পাণিগ্রহণ বলতেন না, এই শব্দটি পরবর্তী সময়ে এসেছে। বর্তমানে আইনসম্মতভাবে রেজিস্ট্রি করে বা মন্দিরে গিয়ে অনেকে বিবাহ সম্পন্ন করে থাকেন। তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, বিবাহ হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় খুবই নিষ্ঠাসহকারে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে এই সংস্কারক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে সংস্কারের তাত্ত্বিক উপদেশ থাকলেও তাদের প্রক্রিয়াত্মক উপদেশ হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* মত সব জায়গায় পাওয়া যায় না। আলোচ্য ভাষ্যগ্রন্থে শুধুমাত্র সংস্কারসমূহের উল্লেখই করা হয়নি, তার সঙ্গে প্রত্যেক সংস্কারের পদ্ধতি ব্রাহ্মণগ্রন্থোচিত মন্ত্রাত্মক যজ্ঞের মাধ্যমে যেভাবে সম্পন্ন করা উচিত সেই প্রয়োগাত্মক দিকটিরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিত্য, নৈমিত্তিক ও বিবিধ কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি জানার জন্য এই ভাষ্যগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

## ৩.১.৭. আচার্য হলায়ুধ ও আচার্য গুণবিষ্ণুর মন্ত্রব্যাখ্যার তুলনাত্মক অধ্যয়ন :

খ্রিস্টীয় দশম শতক ও তাঁর পরবর্তী কালে বঙ্গদেশে বেশ কয়েকজন বেদব্যাখ্যাকার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ-ই সম্পূর্ণ বেদের ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে জানা যায় না। তাছাড়া সকলের রচনা আমাদের হস্তগত হয়নি,

শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যাখ্যাকারেরই নাম জানা যায়। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলির মধ্যে বেশির ভাগই অমুদ্রিত অবস্থায় রয়ে গেছে। এই সকল ব্যাখ্যাকার গৃহস্থের দৈনন্দিন ধর্মানুষ্ঠানের উপযোগী বৈদিক মন্ত্রগুলি একত্র করে তার উপর ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন। সম্পূর্ণ বেদের ব্যাখ্যা রচনায় কেউ-ই অগ্রসর হননি।

এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গুণবিষ্ণু। সামবেদ অবলম্বনে তাঁর রচিত বেদভাষ্যের নাম হল *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য*। গুণবিষ্ণু রচিত *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য* আটটি খণ্ডে বিভক্ত। তিনি এই গ্রন্থে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, গৃহ্যসূত্র, *নিঘণ্টু*, *নিরুক্ত*, পুরাণ ও বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করেছেন এবং পদসাধনে সর্বত্র পাণিনি ব্যাকরণকে অনুসরণ করেছেন। অপরদিকে আচার্য হলায়ুধ তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* কাণ্বশাখীয় বাজসনেয়িগণের গার্হস্থ্যকর্মের উপযোগী ৩০০টির কিঞ্চিদধিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। এই শ্লোকবদ্ধ গ্রন্থটিতে দন্তধাবন থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত চল্লিশ প্রকার কর্মের নাম রয়েছে। যে সকল স্থলে সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয়গণের একই মন্ত্র পাঠ করতে হয়, সেই সকল স্থলে গুণবিষ্ণু ও আচার্য হলায়ুধের ব্যাখ্যা প্রায় একই ধরনের। অপরদিকে হলায়ুধের ব্যাখ্যা পুরাণ, গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি নানাশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা উপস্থাপিত এবং স্মৃতি-নিবন্ধের মতো কর্মানুষ্ঠানসম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রয়োগে পরিপূর্ণ। আচার্য হলায়ুধভট্টের *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* বহু মন্ত্রের ব্যাখ্যার সঙ্গে গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যার অভিন্নতা দেখা যায়।

## ৩.১.৮. হলায়ুধের রচনায় গৃহ্যসূত্রের প্রভাব :

আচার্য হলায়ুধভট্টের বেদভাষ্য *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* মধ্যে গৃহ্যসূত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কল্পসূত্রের অন্তর্গত গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানবিষয়ক নিয়মাবলী আলোচিত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ এবং গর্ভাধান থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও তার পরবর্তী বিভিন্ন পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ। শ্রৌত

অনুষ্ঠানগুলিতে যেখানে মূলত সমগ্র গোষ্ঠীর সামূহিক কল্যাণ কামনা করা হয়ে থাকে, গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানসমূহ সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত স্থানে অবস্থান করে। কারণ, গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিবারকেন্দ্রিক। এই গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে পাকযজ্ঞ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গৃহ্যকর্মগুলি আবার তিনভাগে বিভক্ত। যথা- হুত, আহুত এবং প্রহুত। গৃহ্যসূত্রের এই সকল বিষয়ের বর্ণনা হলায়ুধকৃত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উপলব্ধ হয়। আচার্য হলায়ুধ তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ করেছেন।[৭৪] সংস্কারগুলি হল- গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহ। এই দশবিধ সংস্কারের আলোচনা গৃহ্যসূত্রের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে গৃহ্যসূত্র বিষয়ক সংস্কারগুলিরই আলোচনা করেছেন। নিষ্ক্রমণ সংস্কারে শিশুর জাতকগৃহ থেকে বাইরে প্রবেশ প্রসঙ্গে *পারস্করগৃহ্যসূত্রের* উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে হলায়ুধ বলেছেন যে, নিষ্ক্রমণ সংস্কারমূলক অনুষ্ঠানেই শিশুকে প্রথম সূর্যদর্শন করানো হয়।[৭৫] গৃহ্যসূত্রগুলির বাইরে গিয়ে এইসব পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানগুলির কল্পনাই করা যায় না। অতএব সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, হলায়ুধকৃত *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* গৃহ্যসূত্রের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

### ৩.১.৯. *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* ব্যাখ্যায় গুণবিষ্ণুপ্রণীত *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের* প্রভাব :

বঙ্গদেশের বেদব্যাখ্যাকারদের মধ্যে গুণবিষ্ণু ও আচার্য হলায়ুধভট্টের নাম অগ্রগণ্য। আগেই বলা হয়েছে গুণবিষ্ণু রচিত বেদভাষ্যের নাম হল *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য*। গ্রন্থটি আটটি খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম,

---

[৭৪] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ২০৪

[৭৫] পা. গৃ., ১.১৮.৬

নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন প্রভৃতি সংস্কার এবং স্নান, সন্ধ্যা, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের উপযোগী চারশতেরও অধিক মন্ত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে। গুণবিষ্ণুপ্রণীত এই *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য* নামক বেদভাষ্য গ্রন্থকে অনুসরণ করে আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামক বেদভাষ্য গ্রন্থটি রচনা করেছেন। *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের* ভূমিকায় শ্রী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে, গুণবিষ্ণুর ভাষ্য থেকে হলায়ুধ বহু অংশ স্বরচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং উপর্যুক্ত দুইটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, আচার্য গুণবিষ্ণুর *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্য* গ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে, হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে সেই সকল বিষয়েরই আলোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, সেই সকল বিষয়ের মন্ত্রসম্পর্কিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে একতা লক্ষ্য করা যায়। অতএব নির্দ্বিধায় বলা যায়, *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* ব্যাখ্যায় গুণবিষ্ণুপ্রণীত *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের* প্রভাব বিদ্যমান।

## ৩.১.১০. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের স্বরূপ আলোচনা :

*ব্রাহ্মণসর্বস্বে শুক্লযজুর্বেদের* বাজসনেয়ি-সংহিতার কান্বশাখার অন্তর্গত বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত মন্ত্রগুলির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা রয়েছে। আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে যে মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন তার বেশিরভাগ অংশ গৃহ্যসূত্রগুলিতেও পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র মাঝারি আকারের চারশতের অধিক কিছু মন্ত্রের সংগ্রহ করেছেন। এগুলি কেবলমাত্র বৈদিক সংহিতা থেকে সংগৃহীত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রই নয়, বরং সেগুলি বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রেও রয়েছে। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ভাষ্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল, এই গ্রন্থটি মন্ত্রব্যাখ্যার পাশাপাশি ব্যবহারিক বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে অনুসরণ করা পদ্ধতির

সঙ্গে বিশদভাবে সম্পর্কিত। এই প্রসঙ্গে আচার্য হলায়ুধভট্ট ব্রাহ্মণ, গৃহ্যসূত্র, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্রের বেশ কিছু উদ্ধৃতিও গ্রন্থমধ্যে উপস্থাপন করেছেন। ভাষ্যগ্রন্থ যে এমনভাবে কখনও কখনও সূত্রসাহিত্যের সহায়তায় স্মৃতিশাস্ত্রের চরিত্র ধারণ করে. তা হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থেই পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থকারের বক্তব্য অনুযায়ী, বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা পদ্ধতি রচনা করা গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও তার সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে পুরাণ এবং অন্যান্য বিষয়ের উপস্থাপন *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে করা হয়েছে। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "অত্র যদ্যপি সূর্যাদিদেবতাপুজাষুপৌরাণিকাদিমন্ত্রা বহব এব সংবিহিতা সন্তি তথাপি অস্মাভিঃ বৈদিকমন্ত্রব্যাখ্যানস্য উপক্রান্তত্বাৎ তৎ প্রসঙ্গেন এব অনুষ্ঠানাভিধানম্। তাৎপর্যন্তু বৈদিকমন্ত্রব্যাখ্যায়ামেব।"[৭৬]

*ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের মূল লক্ষ বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা নির্ধারণ হলেও বলি উৎসর্গকে আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর আচার-অনুষ্ঠানমূলক মন্ত্রব্যাখ্যা থেকে বাদ দিয়েছেন। তাঁর মতে, এখানে বলি উৎসর্গ বিষয়ক বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে তিনি বলি উৎসর্গের কোনও বিরোধিতা করেননি। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "অত্রবেদমন্ত্রব্যাখ্যাপরত্বাৎ গ্রন্থস্য বলীনাশ্চ বৈদিকমন্ত্রশূন্যত্বাৎ বলয় ন ব্যাখ্যাতাঃ।"[৭৭] তবে সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে যে, আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে মূলত বৈদিক মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যার উপরেই জোর দিয়েছেন।

## ৩.১.১১. *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের উৎসানুসন্ধান :

*ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে কোন কোন কারণ হলায়ুধকে বৈদিকমন্ত্রগুলির নির্বাচিত অংশের ব্যাখ্যা করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তা তিনি নিজেই বলেছেন। এই প্রসঙ্গে

---

[৭৬] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ১২৫

[৭৭] তদেব., পৃ. ১৫৬

তিনি সেই সময়কার সামাজিক অবস্থার চিত্রও তুলে ধরেন। তাঁর সময়ে বঙ্গদেশে বসবাসকারী উৎকল, পাশ্চাত্ত্য, রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র- এই চারটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেদাধ্যয়ন পাঠ্য হয়েছিল। আচার্য হলায়ুধ ব্রাহ্মণদের এই সমস্ত গোষ্ঠীর বৈদিক জ্ঞানকেই চিহ্নিত করে বলেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ-ই বেদ অধ্যয়নের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন না। উৎকল এবং পাশ্চাত্ত্যরা বেদমন্ত্রের অর্থের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বেদকে কেবলমাত্র মুখস্থ করতেন। অন্যদিকে, রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রগণ বেদমন্ত্রকে শুধুমাত্র মুখস্থ না করে তার অর্থের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা যাগযজ্ঞে প্রযুক্ত মন্ত্রগুলির উপর বেশি মনঃসংযোগ করেছেন এবং বৈদিক গ্রন্থের শুধুমাত্র একটি অংশের অর্থসহ অধ্যয়ন করেছেন। বেদমন্ত্রের মুখস্থের প্রতি যত্নশীল না হয়ে তাঁরা মীমাংসা সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যার আলোকে বেদমন্ত্রের অর্থ অধ্যয়নে সচেষ্ট হয়েছেন। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "উৎকলপাশ্চাত্যাদিভিঃ বেদাধ্যয়নম্ অর্থম্ ক্রিয়তে, রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈঃ তু অধ্যয়নং বিনা ক্রিয়মেব বেদার্থস্য কর্মমীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞেতিকর্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে"।[৭৮] এই দুটি প্রধান গোষ্ঠীর মধ্যে দেশে প্রচলিত বৈদিক অধ্যয়নের পদ্ধতিগত ত্রুটিগুলি আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'উভয়রপি গ্রন্থার্থতো বেদজ্ঞানম্ নাস্ত্যেব'।[৭৯] বেদপাঠের সঙ্গে বোধগম্যতা রেখে গ্রন্থের স্মৃতিচারণা এবং তাদের অর্থজ্ঞান লাভ করা বেদ অধ্যয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'বেদাধ্যয়নবিধেঃ বেদাধ্যয়নানন্তরং বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানে হি তাৎপর্যম্।' শুধুমাত্র মন্ত্রগুলির আবৃত্তি অর্থের উপলব্ধি সহ এককভাবে বেদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্যগুলি পুরণ করতে পারে না। কিন্তু বাংলায় উৎকল এবং পাশ্চাত্ত্যরা কেবলমাত্র

---

[৭৮] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ৮

[৭৯] তদেব., পৃ. ৯

বেদের আবৃত্তি অধ্যয়নেই সন্তুষ্ট ছিলেন। আর ঠিক সেই সময় রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্ররা মন্ত্রগুলির অর্থের অধ্যয়ন করতেন। এর থেকেই অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে আচার্য হলায়ুধভট্ট *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছেন।

## ৩.১.১২. হলায়ুধমতে বেদাধ্যয়নের শর্তাবলি :

আচার্য হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের উল্লেখ অনুযায়ী দেখা যায় যে, দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলায় ব্রাহ্মণদের দুটি শ্রেণী বেদাধ্যয়নের ধারাকে বহন করে চলেছিল। তবে তাঁদের বেদ অধ্যয়নের ধারাকে বহন করার পন্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। একদল শুধুমাত্র বেদ গ্রন্থের আবৃত্তিকে পছন্দ করতেন  এবং অপর একদল কেবলমাত্র বেদমন্ত্রের অর্থের আলোচনা করতে পছন্দ করতেন। অর্থসহ বেদাধ্যয়নকারীরা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে মন্ত্রের প্রায়োগিক দিক সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন। আচার্য হলায়ুধভট্ট এগুলির কোনওটিকেই বেদাধ্যয়নের সঠিক পথ বলে গণ্য করেননি। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের আলোচনা বঙ্গদেশে বেদ অধ্যয়নের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিগুলিরই ইঙ্গিত বহন করে। তবে এই অবস্থা শুধুমাত্র বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের অন্যান্য অংশেও বেদাধ্যয়নের এই দুরবস্থা লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত বলা যায়, চতুর্দশ শতকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জনগণ (কৃষ্ণমিশ্র রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত বিষয়) বেদাধ্যয়ন বর্জন করেছিল। সেই সময় শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের জন্যই বেদাধ্যয়নের প্রচলন ছিল।[৮০] এমনকি কাশ্মীরের ইতিহাসে বেদাধ্যয়ন বর্জনের কারণে হলায়ুধের মতো ব্যক্তিরা বিলাপ করেছেন। আচার্য হলায়ুধভট্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন, কেবলমাত্র বৈদিক পুরোহিতরাই নিয়ম করে বেদ পাঠ করতেন। কিন্তু তাঁদের বেদমন্ত্রের শব্দগুলির

---

[৮০] তত্রোত্তরাঃ পথিকাঃ পাশ্চাত্যশ্চ ত্রয়িমেব ত্যাবিতো। ... অন্যত্রাপি প্রায়সা জীবিকামাত্রফলৈব ত্রয়ী। প্রবোধ., অঙ্ক ২

অর্থ বুঝতে খুব সমস্যা হত। ফলে তাঁরা শুধুমাত্র গ্রন্থ আবৃত্তি করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। দীর্ঘায়ু, বুদ্ধিমত্তা, উদ্যম এবং বিশ্বাস ইত্যাদির সাধারণ হ্রাসকে আচার্য হলায়ুধ এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত, বেদ অধ্যয়নের প্রচলিত পদ্ধতিকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করে একটি আমূল পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। তাই আচার্য হলায়ুধভট্ট প্রতিদিনের আচার এবং পর্যায়ক্রমিক ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে মিল রেখে আবৃত্তি করা মন্ত্রগুলির উপর একটি সুস্পষ্ট ভাষ্য লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ তাঁর এই *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থ।

## ৩.১.১৩. হলায়ুধমতে বেদাধ্যয়নের রীতি :

আচার্য হলায়ুধের মতে, বেদের একটি অংশ হলেও সঠিকভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। পূর্বেই বলা হয়েছে, পাঠ্যগ্রন্থটি ভালোভাবে পড়ে অর্থ বোঝার মাধ্যমেই বেদাধ্যয়নের সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব। আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বলেছেন, 'তত্ বরং বেদকৈদেশস্যাপি যথাবিধি অধ্যয়নং কৃত্বা অর্থবিচারাঃ ক্রিয়তে'।[৮১] আচার্য হলায়ুধভট্ট বেদের এই আংশিক অধ্যয়নের বিষয়ে যমের উদ্ধৃতিও উপস্থাপন করেছেন। হলায়ুধ বলেছেন, 'একদেশোঽপ্যধ্যেতব্যো যদি সর্বো ন শক্যতে।'[৮২] যদি প্রশ্ন ওঠে, বেদের শুধুমাত্র একটি অংশ যথাযথভাবে অর্থসহ অধ্যয়ন করে কি বেদাধ্যয়নের সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব? অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে কোনও নির্দিষ্ট একটি অংশ পর্যাপ্ত পাঠপদ্ধতি গঠন করতে পারে কি? কোনও ছাত্র কি তাঁর ইচ্ছামত বেদের কোনও একটি অংশ গ্রহণ করবেন? অথবা সেই ছাত্রকে কি আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলি নির্ধারণ করে দেওয়া হবে? এই বিষয়ে *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে=

---

[৮১] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ৯

[৮২] তদেব

"ইত্থমেকদেশাধ্যয়নে কর্তব্যে সংশয়ঃ কিং স্বেচ্ছয়া যঃ কশ্চিদেকো ভাগোঽধ্যেতব্যঃ। কিং তৃতীয়ো ভাগশ্চতুর্থো বাঽধ্যেতব্য উত্তানুষ্ঠানোচিতভাগো বা।"[৮৩] এই প্রশ্নগুলির উত্তরে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, বেদাধ্যয়নের এই পদ্ধতিটি কেবলমাত্র মন্ত্রসংগ্রহের ভিত্তি গঠন করে থাকে। হলায়ুধের মতে, "অত্রৈকদেশপদেন যাবদনুষ্ঠানোপযুক্তবেদভাগোঽপেক্ষিতঃ।"[৮৪] তাই আচার্য হলায়ুধ অন্ততঃ মন্ত্রপাঠের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে বেদাধ্যয়ন করার পরামর্শ দেন। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে- "যদি বা পাঠক্রমানুরোধেন প্রথমভাগ একোঽধীযতে তদা তস্মিন ভাগে সন্ধ্যাস্নানাদ্যাহ্নিকগর্ভাধানাদিক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্তমন্ত্রাণাং সর্বেষামসম্ভবাৎ তদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতি। তদ্বরং সন্ধ্যাস্নানাদ্যাহ্নিকগর্ভাধানাদিক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্তমন্ত্রভাগ এবাধ্যেতুং যুজ্যতে। অস্যৈবাধ্যযনেন বেদস্যৈকদেশাধ্যয়নং পর্যবস্যতি।"[৮৫]

স্পষ্টতই, আচার্য হলায়ুধ বাধ্যতামূলক বৈদিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে উদার মনোভাব গ্রহণ করেছেন। কারণ, দেশের প্রচলিত অবস্থা অনুয়ায়ী বেদাধ্যয়নের জন্য ন্যূনতম পাঠক্রমেরই প্রয়োজন ছিল। তাঁর মতে, একদেশ শব্দের দ্বারা আক্ষরিক অর্থে বেদের কোনও একটি অংশ নেওয়া যায় না।

আচার্য হলায়ুধ শুধুমাত্র সীমিতসংখ্যক বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করার প্রস্তাব করেছেন। যাঁরা সম্পূর্ণ বেদমন্ত্রের অধ্যয়ন করতে অক্ষম তাঁদের উপকারের জন্যই এই প্রস্তাবের উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমনভাবে তিনি তাঁর ভাষ্যগ্রন্থে যজুর্বেদের কাণ্বশাখার বাজসনেয়ি-শাখার অনুসারীদেরকেই বুঝিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাঢ়ীয় এবং

---

[৮৩] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ৯

[৮৪] তদেব., পৃ. ১২

[৮৫] তদেব., পৃ. ১০

বারেন্দ্রগণ। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে, "তদেবং ব্যবস্থিতে শাস্ত্রার্থে কৃৎস্নবেদাধ্যয়নাসমর্থানাং রাঢ়ীয়বারেন্দ্রকদ্বিজাতীনাং কান্বশাখীবাজসনেয়ীনাং কর্মানুষ্ঠানার্থং গ্রাহ্যকর্মোপযুক্তমন্ত্রব্যাখ্যাপ্রস্থোতড্ডা।"[৮৬] বিশেষতঃ, বঙ্গদেশের বেদাধ্যয়নের পদ্ধতিতে পুনর্বিন্যাস প্রতিষ্ঠা করাই ছিল আচার্য হলায়ুধের সংকল্প।

## ৩.১.১৪. হলায়ুধপ্রণীত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* ভাষ্যের রচনাশৈলী :

বেদের মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আচার্য হলায়ুধভট্ট কিছু ক্ষেত্রে গৃহ্যকর্মের আচার-অনুষ্ঠানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এসব ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যাখ্যা খুবই স্পষ্ট। শৌনকের *বৃহদ্দেবতা*[৮৭] গ্রন্থে এবং উবটাচার্যের মন্ত্রভাষ্যে[৮৮] উল্লিখিত বৈদিক ভাষ্যকারের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে আচার্য হলায়ুধভট্ট বেদব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছেন।

তিনি মন্ত্রব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শব্দের অর্থজ্ঞাপনের উপর জোর দেন এবং শব্দগুলিকে বিভিন্ন উপযুক্ত তথ্যের দ্বারা অর্থোপযোগী করে তোলেন। যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তাঁর নিজস্ব শব্দ যোগ করে মন্ত্রের গূঢ়ার্থবোধক বিষয়গুলিকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেইসব বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে তাঁর বেদভাষ্যে সংযুক্তও করেছেন। তাঁর মহান উত্তরসূরি আচার্য সায়ণের মতে, হলায়ুধ একটি বৈদিক মন্ত্রে লিঙ্গ, ক্রিয়ার রূপ এবং কারকবিভক্তি ব্যবহারে অদ্ভূত কিছু বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন।

---

[৮৬] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ব্রা. স., পৃ. ১০

[৮৭] প্রধানমর্থঃ শব্দো হি তদ্গুণায়ত্ত ইষ্যতে।
তস্মান্নানান্বয়োপায়ৈঃ শব্দানর্থবশং নয়েৎ।।
অতিরিক্তং পদং ত্যাজ্যাং হীনং বাক্যে নিবেশয়েত্। বৃহদ্., ২.৯৯-১০০

[৮৮] লিঙ্গং ধাতুং বিভক্তিং চ যোগ্যং বাক্যানুলোমতঃ।
যদ্ যদ্ স্যাচ্ছান্দস বাক্যং কুর্যাত্তত্তু লৌকিকম্। উবট মন্ত্রভাষ্য, ভূমিকাংশ

তাঁর ভাষ্যের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান দিক হল ভাষ্যার্থপ্রদানের পাণ্ডিত্য। এই বিষয়ে আচার্য হলায়ুধের প্রচেষ্টা বৈদিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অতুলনীয়। *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* প্রারম্ভিক শ্লোকগুলিতে আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর ব্যাখ্যার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'বিশ্বপ্রসিদ্ধৈঃ পদৈঃ'[৮৯] এবং 'ঋজুব্যাখ্যানে'[৯০] শব্দ দুটির প্রয়োগ করেছেন।

আচার্য হলায়ুধ উবটাচার্য এবং গুণবিষ্ণুর ভাষ্য অনেক ক্ষেত্রেই উদ্ধৃত করেছেন। আচার্য হলায়ুধ বলেছেন যে, কিছু মন্ত্র প্রথম বারের মতো তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, যা তিনি ভিন্ন অপর কেউ আর ব্যাখ্যা করেননি।[৯১] এই ধরনের মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যার জন্য আচার্য হলায়ুধভট্ট বেদের পারম্পরিক ঐতিহ্যগত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যাখ্যার সময় *শতপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র* ও *পারস্করগৃহ্যসূত্রের* থেকে প্রায়শই উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

তিনি *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* রচনায় পদপাঠ, *নিঘণ্টু, নিরুক্ত, ঋগ্বিধান* এবং এই জাতীয় অন্যান্য সহায়ক বৈদিক গ্রন্থগুলির সঙ্গে পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র, বিশেষতঃ *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি* থেকে সাহায্য লাভ করেছিলেন। আচার্য হলায়ুধ বৈদিক মন্ত্রের তাৎপর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, পদপাঠ এবং *নিরুক্ত* থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য সাহায্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন ছিলেন।

আচার্য হলায়ুধভট্ট রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হল, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* উদ্ধৃত *শুক্লযজুর্বেদের* কাণ্বশাখার মন্ত্রগুলির বেশিরভাগই আচার-আনুষ্ঠান

---

[৮৯] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ৪

[৯০] তদেব, পৃ. ৫

[৯১] তদেব., দত্ত্বার্থরূপং প্রথমমদত্তমপরৈর্ভুবি।

ভিত্তিক। গৃহ্যকর্মবিষয়ক মন্ত্রেরই সারসংকলন আচার্য হলায়ুধভট্টের *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* অধিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। তবে শ্রৌতকর্ম বিষয়ক আচার-অনুষ্ঠানমূলক মন্ত্রগুলি একেবারেই যে নেই, তা নয়। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে উল্লিখিত জন্ম থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত যাবতীয় কর্মানুষ্ঠান গৃহ্যকর্মের অন্তর্গত। গৃহ্যকর্মসমূহকে আশ্রয় করেও পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রের উদ্ধৃতি প্রদানপূর্বক বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা করা হয়েছে। বেদভাষ্যের জগতে আচার্য হলায়ুধভট্টের মতো ভাষ্যকার সত্যই দুর্লভ। বেদের অন্যান্য ভাষ্যকারদের মধ্যে যেখানে কেউ যজ্ঞপন্থায়, কেউ আবার জ্যোতিষ ও নক্ষত্রকাল পন্থায়, কেউ ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে, কেউ বা ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা বেদ ব্যাখ্যা করেছেন, সেক্ষেত্রে আচার্য হলায়ুধভট্ট একেবারে ভিন্ন ধারায় বেদব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছেন। তিনি তাঁর বেদভাষ্যে একদিকে যেমন গৃহ্যকর্ম বিষয়ক মন্ত্রগুলিকে আশ্রয় করেছেন তেমনি আবার শ্রৌতকর্ম বিষয়ক মন্ত্রগুলিরও আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এইরকম শ্রৌতকর্ম ও গৃহ্যকর্মের আলোচনার সমন্বয় *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা গ্রন্থটিকে উৎকর্ষ প্রদান করেছে।

## ৩.১.১৫. *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ব্যাখ্যা :

আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে আচার-অনুষ্ঠানে পাঠ্য *শুক্লযজুর্বেদের* কাণ্বশাখার অন্তর্গত প্রায় তিনশত মন্ত্রের ব্যাখ্যা খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। *শতপথব্রাহ্মণ, নিরুক্ত* এবং *মনুসংহিতায়* বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও হলায়ুধের গ্রন্থ তিনটি ভিন্ন অবস্থানবিন্দু থেকে বেদের ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম।[৯২] যেমন– আচার-

[৯২] শ. ব্রা., ১০.৩.৪; নি., ১০.২৬, ১০.৪; মনু., ৬.৮৩

অনুষ্ঠানভিত্তিক (অধিযজ্ঞ), আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক। বেদের অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী কেবলমাত্র আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। হলায়ুধের গ্রন্থে এমন অনেক শ্লোক রয়েছে, যা আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে। তবে বৈদিক সংহিতায় এমন অনেক মন্ত্র রয়েছে যেগুলির বিষয়বস্তু কোনওভাবেই এমন কোনও ব্যাখ্যাকে স্বীকার করে না, যা তাদের বলিদানের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। তবে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে এই মন্ত্রগুলিকে শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। কারণ, এই সমস্ত মন্ত্ররাশির শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত প্রদান করে থাকে। এই নীতির উপর দাঁড়িয়ে *বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ* এবং *ঋগ্বিধানের* মতো রচনাগুলি বৈদিক মন্ত্রগুলির বিনিয়োগকে (প্রয়োগকে) আচার ও অনুষ্ঠানের একটি বিস্তৃত বৃত্তে প্রসারিত করেছে। *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে* দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রাচীনকালে মন্ত্রগুলির উদ্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠানের জন্য।[৯৩] মীমাংসকগণ বিশ্বাস করেন যে যজ্ঞের কার্য সম্পাদন করা ছাড়া বেদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই।[৯৪] তাঁদের মতে, মন্ত্রগুলি নৈবেদ্যর বাদ্যযন্ত্র। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* একটি স্মৃতিপাঠ উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে সমস্ত বেদ অগ্নিহোত্রের জন্য। অধিযজ্ঞতত্ত্ব এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে ক্ষেত্রটিকে ধারণ করে রেখেছে।

আচার্য হলায়ুধভট্ট উবটাচার্যকে অনুসরণ করে শুধুমাত্র বেদের অধিযজ্ঞের উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর অন্তর্নিহিত বিশ্বাসই রাখেন না, বরং ছোটোখাটো ধর্মানুষ্ঠান এবং

---

[৯৩] পুরাকল্পে সমুৎপন্না মন্ত্রাঃ কর্মার্থমেব চ, বীরমিত্রোদয়, পরিভাষা., চৌখাম্বা, পৃ. ৮৭; চতুর্বর্গ., দানখণ্ড, বিবলিওটিকা ইণ্ডিকা, পৃ. ১০৪

[৯৪] আম্নায়স্য ক্রিযার্থত্বাৎ, মী. সূ., ১.২.১

দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে বৈদিক মন্ত্রের অর্থকে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে আরও এক ধাপ এগিয়ে যান। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* এমন ঘটনা বিরল নয়, যেখানে একই মন্ত্রের শব্দগুলি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ 'অভিষ্ঠয়ে' এবং 'পীতয়ে'- এই শব্দগুলি 'শন্নোদেবী' মন্ত্রের ক্ষেত্রে খাটতে পারে, যা শনৈশ্চর উপাসনার সঙ্গে এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সঙ্গেও আবৃত্তি করা হয়। আচার্য হলায়ুধভট্ট তাদের প্রেক্ষাপটের যাথার্থ্য অনুসারে ব্যাখ্যা করেছেন।[৯৫]

আবার, যখন 'বিষ্ণুঃ বিচক্রমে' মন্ত্রটিতে বিষ্ণুর তিনটি ধাপের বর্ণনা দিয়ে কর্দমাক্ত মাটির সঙ্গে নিজের শরীরকে শুদ্ধ করার জন্য নির্ধারিত হয়, তখন হলায়ুধ মন্ত্র এবং আচারকে এই বলে সংযুক্ত করেন যে পৃথিবী, যা বিষ্ণুর পদক্ষেপের সংস্পর্শে পবিত্র হয়ে উঠেছে, এখানে তার প্রশংসা করা হয়েছে যাতে তিনি আমাদের শরীরকে শুদ্ধ করতে পারেন।[৯৬]

'অম্বে অম্বিকে' ইত্যাদি আর একটি মন্ত্র যা অশ্বমেধ যজ্ঞের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা উবটাচার্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। এটি দেবী চণ্ডীর উপাসনার জন্য *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বিহিত করা হয়েছে, আচার্য হলায়ুধ মন্ত্রের এই পরিবর্তিত প্রয়োগটি উল্লেখ করেছেন।[৯৭] মন্ত্রটি হল–

"অম্বে অম্বিকেঽম্বালিকে ন মা নযতি কশ্চন।

---

[৯৫] যদা তু শনৈশ্চরপূজাযামস্য বিনিযোগস্তদা অভিষ্ঠযে অপেক্ষিতফলাবাপ্তযে। যদা শ্রাদ্ধে তদা পীতযে পিতৃণাং পানাযেতি বিশেষো বোদ্ধব্যঃ। দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ৯৩

[৯৬] বিষ্ণুপদসম্বন্ধেন ভুমিরতীব শুদ্ধেতি ভূমিস্তুতিঃ। ইত্যং স্তুতা ভূমিমৌ পাবযত্বিত্যভিপ্রেত্য মৃদ্গ্রহণামনেন ক্রিযতে। তদেব., পৃ. ৮৯

[৯৭] অস্য মন্ত্রস্যাশ্বমেধে পক্ষীবাচনে বিনিযোগে সত্যপি মন্ত্রলিঙ্গাশ্চণ্ডিকাপূজাযাং বিনিযোগ উচ্যতে। অনেন মন্ত্রেণ সৌভাগ্যকামযা স্ত্রিযা ভগবতী পূজ্যতে। তদেব., পৃ. ১৪৯

সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকা কাম্পীলবাসিনীম্।।"[৯৮]

এই মন্ত্রটি উচ্চারিত হয় যখন পুরোহিত অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজার স্ত্রীদেরকে প্রধান রাণির শয়ন-অনুষ্ঠানের জন্য নিহত ঘোড়ার দিকে নিয়ে যান। উবট এবং পরবর্তী ভাষ্যকারদের মতে রানী ঘোড়ার সঙ্গে অবিলম্বে মিলনে আগ্রহী। এখানে তাঁর তিন সঙ্গী-অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকাকে সম্বোধন করেছেন। তিনি দুঃখিত বোধ করেন যে, তাকে রক্ষা করার জন্য কেউ নেই।

আচার্য হলায়ুধভট্ট অবশ্য অম্বা, অম্বিকা এবং অম্বালিকার স্বামীকে লম্পট স্বামী হিসাবে দেখিয়েছেন। তিনি এটি একটি অভিযোগ করে তোলে যে, কেউ তাকে পুরুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসে না। তিনি এই ভেবে অসন্তুষ্ট যে, তার অনুপস্থিতিতে কাম্পিলার বৈচিত্রপূর্ণ শহর থেকে একজন শিল্পবান মহিলার সঙ্গে মিথ্যা বলার স্বাধীনতা রয়েছে। আচার্য হলায়ুধ বলেছেন- "অশ্বশব্দঃ স্বামীবচনঃ, ককারঃ কুৎসাযাম্, কুস্বামীত্যর্থঃ"।[৯৯]

অশ্ব মানে স্বামী, তার দুষ্টতা বোঝাতে 'ক' শব্দ যোগ করা হয়েছে। তাই, অশ্বককে একটি খারাপ স্বামী অর্থে ব্যবহার করা হয়। হলায়ুধের এই শব্দের ব্যাখ্যা কোনও পরিচিত ভাষ্যে দেখা যায়নি। শুধুমাত্র *মার্কণ্ডেয়পুরাণের* একটি অংশে তার সমর্থন পাওয়া যায়। সেই মন্ত্রের দেবীসূক্তের মতো নামকরণ হয়েছে এবং সেখানে একজন মহিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন।[১০০]

---

[৯৮] বা. সং., ২.৩.১৮

[৯৯] অশ্বশব্দঃ স্বামীবচনঃ, ককারঃ কুৎসাযাম্, কুস্বামীত্যর্থঃ। দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ১৪৯-১৫০

[১০০] তদেব, কাপি স্ত্রী পতিলাভায দেবীং সংস্তৌতি নামভিঃ। অম্বে অম্বিকেঽম্বালিকে ভক্তযা সম্বোধনস্ত্রযম্।। স্বামীনং দেহি ন মাং নযতি কশ্চন। অতোঽহং পূজযামি ত্বাং নয মাং পত্যুরন্তিকম্।।

আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর এই ব্যাখ্যার জন্য কোনও বৈদিক তথ্য খুঁজে পেয়েছেন কিনা স্পষ্ট নয়। তাঁর মতে, অশ্ব একটি বিশেষ ধরনের বিরল পুরুষত্বকে বোঝায, যা পুরুষত্বের মতো ঘোড়ার অবিশ্বাসী স্বামীর প্রতিনিধিত্ব করে। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, শব্দের অর্থটি পরবর্তী কোষগ্রন্থের রচনাগুলিতে লিপিবদ্ধ হতে দেখা যায়।[১০১]

এছাড়াও আরও কিছু মন্ত্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য আচার্য হলায়ুধ ধর্মশাস্ত্র এবং পৌরাণিক সাহিত্য ব্যবহার করেছেন। মন্ত্র ব্যাখ্যা করার সময় আচার্য হলায়ুধ 'অযম্' শব্দটির দ্বারা ভৌম বা মঙ্গলগ্রহকে বুঝিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* এবং *মৎস্যপুরাণ*কে তার প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে- "যাজ্ঞবল্ক্য-মৎস্যপুরাণাদাবস্য মন্ত্রস্য ভৌমপূজাযাম্ উপযোগাদ্ ভৌম-প্রকাশকত্বশ্রুতিঃ প্রতীযতে। অতোঽযমিতি পদেন ভৌমোঽভিধীযতে"।।[১০২]

আচার্য হলায়ুধ তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক আচার-উপচারগুলিকে শ্রুতির নিরিখে ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হয়েছেন। তবে তিনি প্রতি পদে পদে ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও *মহাভারত*াদির প্রসঙ্গকে উপস্থাপন করেছেন। এটাই তাঁর মন্ত্রব্যাখ্যার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

দন্তধাবন হল মানুষের একটি নিত্যকর্ম, যা প্রত্যহ প্রাতঃকালে করণীয় কর্মবিশেষ। কোনও কিছু ভক্ষণের পূর্বে মুখকে শোধন করার প্রক্রিয়াই হল দন্তধাবন। আচার্য হলায়ুধ কাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জনের বিধান দিয়েছেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করে না সে তার কৃত সমস্ত সৎকর্ম নষ্ট করে ফেলে। মুখ ধোয়ার পর

---

[১০১] অশ্বঃ পুংজাতিমেদে চ, মেদিনীকোষ ৫.৩

[১০২] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা স, পৃ. ১২৮

এই দন্তকাষ্ঠ বিবিক্তিপ্রদেশে অর্থাৎ শূন্যপ্রদেশে রাখা উচিত। তবে অমাবস্যা তিথিতে এই দন্তকাষ্ঠ ব্যবহারের ওপর নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে যদি কারও কাছে দন্তকাষ্ঠ না থাকে তবে তিনি বারো বার জলগণ্ডূষ করে মুখশুদ্ধি করতে পারেন। *পারস্করগৃহ্যসূত্রে* বলা হয়েছে, ডুমুরের কাষ্ঠ দিয়ে দন্তধাবন করা উচিত।[১০৩] এরপর আচার্য হলায়ুধভট্ট প্রাতঃস্নান, কাম্যপ্রাতঃস্নান, মার্জন মন্ত্র, আচমন মন্ত্র, সন্ধ্যোপাসনা মন্ত্র, প্রাতঃসন্ধ্যা মন্ত্র, গায়ত্রীমন্ত্র, অঘমর্ষণ মন্ত্র, দেবপূজাবিষয়ক মন্ত্র, শ্রাদ্ধমন্ত্র, সায়ংসন্ধ্যা মন্ত্র, সায়ংভজন মন্ত্র, সংস্কারাদিবিষয়ক এবং গৃহ্যকর্ম বিষয়ক মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যায় যেমন অগ্রসর হয়েছেন, তেমনি শ্রৌতকর্মবিষয়ক মন্ত্র যেমন- অগ্ন্যাধানবিধি বিষয়ক মন্ত্র, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ বিষয়ক মন্ত্র, আধান মন্ত্র, মণিকাবধান ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে করেছেন। এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন পুরাণ, *মহাভারত*, বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র এবং বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রেরও উদ্ধৃতি স্থানে স্থানে উপস্থাপন করেছেন।

### ৩.১.১৬. *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* উদ্ধৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা :

গায়ত্রী মন্ত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং অঘমর্ষণ মন্ত্রের চমৎকার ব্যাখ্যা ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে বিশেষ করে *যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি*র সঙ্গে আচার্য হলায়ুধের ঘনিষ্ঠ পরিচিতির সাক্ষ্য বহন করে। পুরুষালি লিঙ্গে 'ভগ' শব্দের ব্যাখ্যা সহ অসামান্য গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যার সমর্থনও *মৈত্রায়ণী আরণ্যকে*র মতো প্রাথমিক গ্রন্থেও লক্ষ্যণীয়।

সফল সন্তান জন্মের জন্য হলায়ুধের 'অবরাবপতন' মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিশেষ করে বৈদিক শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের ইঙ্গিত বহন করে।[১০৪] প্রসবের পর 'অবৈতু পৃশ্নি শৈবলম্' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি সন্তান মাতৃগর্ভ

---

[১০৩] পা. গৃ., ২.৬.১৭

[১০৪] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ২১৬

থেকে বেরিয়ে আসে কিন্তু প্লাসেন্টা নামতে দেরি করে, তাহলে উক্ত মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে। প্লাসেন্টা হল একটি স্পঞ্জি ও খুব ভাস্কুলার অঙ্গ, যা জরায়ুর তরলে সংযুক্ত থাকে। এটি নাভির দ্বারা এফসেটাসের সঙ্গে খুব ঢিলেঢালাভাবে থাকে। প্লাসেন্টা অনুরূপ, যেমন আচার্য হলায়ুধের ব্যাখ্যায় পৃশ্নি এবং শৈবাল হল দুটি সাধারণ জলজ উদ্ভিদ, তাদের শিকড় খুব পাতলা এবং আলাদা থাকে, বাকিটা পুকুরের জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে, তাই এটি সহজেই উচ্ছেদ করা যায়। আচার্য হলায়ুধের ব্যাখ্যায়, পৃশ্নি শব্দের অর্থ করা হয়েছে পর্ণী, এটি একটি পাতাযুক্ত জলের উদ্ভিদ, নীচের কোনও কিছুর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত না হয়ে, যা জলের পৃষ্ঠে বৃদ্ধি পায়। *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে- "মূলেন ক্বচিদস্যসংলগ্ন জলোপরিস্থিতম্'।[১০৫]

এই মন্ত্রটি অথর্ববেদের মধ্যেও দেখা যায়, সেখানে আচার্য সায়ণ শুভ্রবর্ণ অর্থের দ্বারা 'পৃশ্নি' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। শৈবাল মন্ত্রসম্পর্কিত সায়ণাচার্য প্লাসেন্টার প্রেক্ষাপটে শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন, যা তিনি আভ্যন্তরীণ অংশগুলির সঙ্গে সংযোগহীন জলের পৃষ্ঠে শৈবালদের মতো বর্ণনা করেছেন- "জলস্যোপরিস্থিতশৈবালবদান্তরাবযবাসম্বদ্ধম্"।[১০৬]

প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি আচমন-মন্ত্রেরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে আচার্য হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্বতে*। আচার্য হলায়ুধের এই ব্যাখ্যাত বিষয়টি *তৈত্তিরীয় আরণ্যকের* থেকে একটু আলাদা। আচার্য হলায়ুধ প্রথম মন্ত্রটির ক্ষেত্রে 'অহঃ' এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটির ক্ষেত্রে 'রাত্রি' পাঠ ব্যবহার করেছেন। এই পাঠ আরণ্যকের থেকে

---

[১০৫] এতেনৈতদুক্তং ভবতি – যথা প্রুশ্নি পর্ণী শৈবলং চ প্রসিদ্ধমেব মূলেন ক্বচিদপ্যসংলগ্নং জলোপরিস্থিতং সৎ ক্ষুদ্রবাতাদিপ্রেরণামাত্রেণাপ্যপগচ্ছতি তথা জরায়ু সুখেনাপগচ্ছতু। দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ২১৭

[১০৬] তদেব; অথর্ব., ১.১১.৪

আলাদা। আচার্য হলায়ুধ যেখানে বলেছেন- 'ইদমহমাপোঽমৃতযোগৌ' আরণ্যকে সেখানে পাঠ রয়েছে – 'ইদমহং মামমৃতযোনৌ'। কিন্তু তাই বলে হলায়ুধকে মোটেই স্বেচ্ছাচারী বলা যায় না। তিনি এই বিষয়ে সমর্থন পেয়েছেন শুধু বাংলার দুই পূর্বসূরি অনিরুদ্ধ ও গুণবিষ্ণুর থেকে তা নয়, পরোক্ষভাবে *গৌতমধর্মসূত্র* এবং তার ভাষ্যকার হরদত্তের *মিতাক্ষরার* থেকেও সমর্থন পেয়েছেন, যাঁরা সকালে এবং সন্ধ্যায় আচমনের সময় মন্ত্রপাঠের সঙ্গে জলে চুমুক দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। সপ্তদশ শতকের বাঙালি বেদ-ব্যাখ্যাকার রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি সম্পূর্ণ বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং তার পক্ষেও যুক্তি দিয়েছেন। তিনি আচার্য হলায়ুধ এবং অন্যান্যদের পাঠের ওপরে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এমনকি তিনি পরামর্শ দেন যে, এই পাঠগুলি সামবেদের এবং *যজুর্বেদের* কাণ্ব শাখার অনুগামীদের জন্য। অন্য পাঠগুলি মৈথিলীদের দ্বারা নির্ধারিত মাধ্যন্দিন যজুর্বেদের অনুগামীদের দ্বারা অনুসরণ করা উচিত।

*ব্রাহ্মণসর্বস্বের* বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্বোক্ত আলোচনাগুলিতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, আচার্য হলায়ুধের কাছে বৈদিক মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত গ্রন্থরাজি ছিল, বিশেষ করে আচার-অনুষ্ঠান ভিত্তিক মন্ত্রগুলির গ্রন্থরাজি। *ব্রাহ্মণসর্বস্বতে* যে মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলি সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়, সেখানে এই সমস্ত মন্ত্রগুলিকে একশ্রুতি স্বরে বা একতানে পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আচার্য হলায়ুধ নিজে স্বরের বিষয়ে আলোচনা করেননি। আচার্য হলায়ুধ তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* মন্ত্রব্যখ্যার ক্ষেত্রে পদপাঠের কথা উল্লেখ করেছেন মোট পাঁচবার। আচার্য হলায়ুধের লেখার গুণাগুণ অবশ্য আংশিকভাবে অনেকগুলি (অবিশ্বাস্যভাবে) ভুল পাঠ এবং বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যা *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* পাণ্ডুলিপিতে কোনও না কোনও ভাবে প্রবেশ করেছে। সেইসব ভুল পাঠ ও ব্যাখ্যাকে আচার্য হলায়ুধের সঙ্গে

যুক্ত করা খুবই কঠিন, যা বৈদিক সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে সুপরিচিত। এই ত্রুটিগুলি লিপিকরের ত্রুটি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে যা অন্যান্যরা সংশোধন ছাড়াই অনুলিপি করেছেন।

## ৩.২. *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা :

### ৩.২.১. ভারতীয় দর্শন ও বেদ :

দর্শন শব্দের সাধারণ অর্থ হল সত্যদর্শন বা তত্ত্বদর্শন। যে সত্য বা তত্ত্ব সমগ্র বিশ্বে নিহিত, যার থেকে এই বিশ্বের চেতন-অচেতন সকল কিছুই উদ্ভূত হয়, তাই দর্শন নামে পরিচিত। বেদ ও উপনিষদ হল প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ও দর্শন। বেদের ওপর ভিত্তি করেই ভারতীয় দর্শনকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা – আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন। আস্তিক এবং নাস্তিক শব্দ দুটি খুবই বিভ্রান্তিকর, কেননা শাস্ত্রকারগণ এই শব্দদুটিকে অভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেননি। পাণিনি সূত্রে বলা হয়েছে – 'অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ'[১০৭] অর্থাৎ আছে এমন বুদ্ধি যার সে আস্তিক, আর নেই এমন বুদ্ধি যার সে নাস্তিক। এখানে 'আছে' অর্থে 'পরলোক আছে' এবং 'নেই' অর্থে 'পরলোক নেই' এমন অর্থ করা হয়েছে। তাহলে, পাণিনির মতে যাঁরা পরলোকে বিশ্বাসী তাঁরাই আস্তিক এবং যাঁরা পরলোকে অবিশ্বাসী তাঁরাই নাস্তিক। কিন্তু এই প্রকার অর্থ ধরে ভারতীয় দর্শনের বিভাগটি করা হয়নি। কারণ, বৌদ্ধ দার্শনিকগণ পরলোকে বিশ্বাসী হলেও ভারতীয় দর্শনে তাঁদের নাস্তিক রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। অনেক শাস্ত্রকার আবার নাস্তিক শব্দটিকে ভিন্নার্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মতে, যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁরা আস্তিক এবং যাঁরা

---

[১০৭] অষ্টা., ৪.৪.৬০

ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী তাঁরাই নাস্তিক। এটাই আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের সাধারণ অর্থ, যা লোকসমাজে প্রচলিত। কিন্তু ওইপ্রকার অর্থ অবলম্বন করে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের আস্তিক ও নাস্তিক বিভাগটি করা হয়নি। কারণ, সাংখ্য ও কর্মমীমাংসা নিরীশ্বর দর্শন হলেও ভারতীয় দর্শনে তাঁরা আস্তিক্যবাদী নামে পরিচিত।

শাস্ত্রকার মনু বলেছেন– 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ'[১০৮] অর্থাৎ যাঁরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন তাঁরা আস্তিক আর যাঁরা বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন তাঁরা নাস্তিক। আস্তিক ও নাস্তিকের এই প্রকার অর্থ ধরেই ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের নামকরণ করা হয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে, আস্তিক দর্শন হল বৈদিক দর্শন আর নাস্তিক দর্শন হল অবৈদিক দর্শন।

সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত– এই ষড়্দর্শন হল আস্তিক দর্শন। কেননা এই সব দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়েছে। এই আস্তিক দর্শন আবার দুই প্রকারের হয়। যথা – বেদানুগত ও বেদস্বতন্ত্র। যে সব দর্শন সরাসরি বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁরা বেদানুগত দর্শন। মীমাংসাদর্শন ও বেদান্তদর্শন হল বেদানুগত দর্শন। কারণ, এই দুটি দর্শন সরাসরি বেদের উক্তিকে সত্য বলে স্বীকার করে এবং সেই স্বীকৃত তত্ত্বকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে। তবে এই দুই দর্শনের মধ্যে কিছুটা অমিলও রয়েছে। যেমন- মীমাংসাদর্শন বেদের কর্মকাণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর বেদান্তদর্শন জ্ঞানকাণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর যে সব দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেও বেদের ওপর সাক্ষাৎভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়, তাঁরা বেদস্বতন্ত্র দর্শন। যেমন – সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন হল বেদস্বতন্ত্র দর্শন। কারণ, এইসব দর্শন বেদ-

---

[১০৮] মনু., ২.১১

বিরোধী না হলেও বেদকে সরাসরিভাবে প্রামাণ্য বলেনি। অপরপক্ষে, নাস্তিক দর্শন হল বেদ-প্রামাণ্য বিরোধী দর্শন। যেমন – চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন হল বেদ-প্রামাণ্য বিরোধী দর্শন।

## ৩.২.২. দর্শন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ :

'দৃশ্যতে অনেনেতি দর্শনম্' এই অর্থে প্রেক্ষণার্থক দৃশ্ ধাতুর সঙ্গে ল্যুট্ প্রত্যয় করে, 'হলন্ত্যম্'[১০৯] সূত্র দ্বারা 'ট' ইৎ করে এবং 'তস্য লোপঃ'[১১০] সূত্র দ্বারা তার লোপ করে 'লশক্বতদ্ধিতে'[১১১] সূত্র দ্বারা 'ল' এর লোপ করে, 'যুবোরনাকৌ'[১১২] সূত্র দ্বারা 'যু'-এর স্থানে অন আদেশ করে 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ'[১১৩] সূত্রানুসারে গুণ সংজ্ঞা করে ('ঋ' এর 'অর্' গুণ) দর্শন শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উপনিষদগুলির তত্ত্ব সত্যদর্শনের নিমিত্ত 'দৃশ্' ধাতুর প্রয়োগ হয়েছে। জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা আত্মা, স্বর্গ, মুক্তি ইত্যাদি যে অলৌকিক বস্তুর গ্রহণ হয়, তাই দর্শন নামে পরিচিত।

## ৩.২.৩. মীমাংসাদর্শন :

মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসা-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। জৈমিনি রচিত দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের নাম হল *মীমাংসাসূত্র*। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে জৈমিনি *মীমাংসাসূত্র* রচনা করেন। *মীমাংসাসূত্রের* প্রধান ভাষ্যকার শবরস্বামী। আচার্য জৈমিনির প্রধান

---

[১০৯] অষ্টা., ১.৩.৩

[১১০] তদেব., ১.৩.৯

[১১১] তদেব., ১.৩.৮

[১১২] তদেব., ৭.১.১

[১১৩] তদেব., ৭.৩.৮৪

উদ্দেশ্য ছিল যাগযজ্ঞ সম্বন্ধীয় বেদ-বাক্যের ব্যাখ্যা করা এবং যজ্ঞতত্ত্বের দর্শনসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করা। বেদের কর্মতত্ত্ব বা যজ্ঞতত্ত্বই এই দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মীমাংসাদর্শন সাক্ষাৎভাবে বেদাশ্রিত দর্শন। বেদকে এই দার্শনিকগণ অপৌরুষেয় বলে স্বীকার করেছেন।[১১৪] বেদবাক্য কোনও পুরুষের বা ঈশ্বরের বচন নয়। বেদ নিত্য এবং বেদবাক্য স্বতঃপ্রামাণ্য। বেদের দুটি বিভাগ রয়েছে। যথা– কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। মীমাংসাদর্শন বেদের কর্মকাণ্ডের ওপর সাক্ষাৎভাবে নির্ভরশীল। কর্মকাণ্ডকে পূর্বকাণ্ডও বলা হয়ে থাকে। তাই মীমাংসাদর্শনকে পূর্বমীমাংসা-দর্শনও বলা হয়ে থাকে।

মীমাংসকদের মধ্যে আবার দুটি সম্প্রদায় রয়েছে। যথা – প্রাভাকর সম্প্রদায় ও ভাট্ট সম্প্রদায়। আচার্য প্রভাকরমিশ্রের অনুগামীদের প্রাভাকর এবং আচার্য কুমারিলভট্টের অনুগামীদের ভাট্ট বলা হয়। প্রভাকর মিশ্রের দার্শনিক মত গুরুমত এবং কুমারিলভট্টের দার্শনিক মতবাদ ভাট্টমত নামে পরিচিত। প্রাভাকর সম্প্রদায় পাঁচ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ করেন। যথা – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি। ভাট্ট সম্প্রদায় এই পাঁচটি প্রমাণ ছাড়াও অতিরিক্ত একটি ষষ্ঠ প্রমাণের উল্লেখ করেন এবং তার নাম হল অনুপলব্ধি। মুরারি মিশ্র তৃতীয় এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন যাঁরা ন্যায়মত সদৃশ। মীমাংসা অভিমত বলতে অবশ্য প্রাভাকর ও ভাট্টমতকেই বোঝায়।

---

[১১৪] অপৌরুষেযং বাক্যং বেদঃ। অর্থ., বিশ্বরূপ সাহা, সদেশ প্রকাশনি, পৃ. ২৮

## ৩.২.৪. মীমাংসা শব্দের অর্থ :

ছয়টি ভারতীয় আস্তিক দর্শনের মধ্যে সাক্ষাৎ বেদনির্ভর দর্শন হল মীমাংসাদর্শন। এই দর্শনের দুটি ভাগ রয়েছে। যথা – পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা। পূর্বমীমাসা সাধারণভাবে মীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা বেদান্তনামে প্রসিদ্ধ। মীমাংসা শব্দটিতে পূজার্থক 'মান্' ধাতুর উত্তর জিজ্ঞাসার্থে 'মান্বধদানশানেভ্যা দীর্ঘশ্চাভ্যাসস্য'[১১৫] – এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সন্ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। 'সন্যঙোঃ'[১১৬] সূত্র দ্বারা দ্বিত্ব ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় 'মীমাংস্' এই ধাতুদশায় স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ করে মীমাংসা পদটি নিষ্পন্ন হয়। এর অর্থ হল জিজ্ঞাসা বা জানার ইচ্ছা। ইচ্ছার কার্যরূপ পরিণতি বিচার হিসাবে ধরা হয়। তাই মীমাংসাশাস্ত্রকে বাক্যার্থনির্ণয়ানুকুলরূপ বিচারশাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আচার্য বাচস্পতি মিশ্র এই মীমাংসা শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন– 'পূজিতবিচার'। ব্রাহ্মণগ্রন্থে সংজ্ঞারূপ মীমাংসা শব্দ পাওয়া যায়। যদিও সেখানে মীমাংসা শব্দের ভিন্ন অর্থ লক্ষ করা গেছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে মীমাংসা পদের দ্বারা বিচার্য যাগহোমসম্পর্কিত সমস্যার বিবেচনা করা হয়েছে।

## ৩.২.৫. মীমাংসাদর্শনের প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও ভাষ্যগ্রন্থ :

বেদার্থ বিচার বৈদিক আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু বিচারপূর্বক যথার্থ বেদার্থনির্ণয় করে যাগাদিকর্মে প্রয়োগের জন্য বিশেষ শাস্ত্রের প্রয়োজন। সেই কারণেই মীমাংসাশাস্ত্র রচিত হয়েছে। এই শাস্ত্রের প্রধান আচার্য ছিলেন মহর্ষি জৈমিনি। কিন্তু জৈমিনির পূর্বে অনেক মীমাংসাচার্য ছিলেন যাঁদের উল্লেখ তিনি *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থে

---

[১১৫] অষ্টা., ৩.১.৬

[১১৬] তদেব., ৬.১.৯

করেছেন। সেই সব আচার্যেরা হলেন– আত্রেয়, আশ্মরথ্য, আলেখন, ঐতিশায়ন, কার্ষ্ণাজিনি, কামুকায়ন, বাদরায়ণ, বাদরি, লাবুকায়ন প্রমুখ। তবে এই সকল মীমাংসাশাস্ত্রকারদের বিষয়ে কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

*মীমাংসাসূত্রের* প্রধান ভাষ্যকার শবরস্বামী। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আদিত্যদেব। কথিত আছে জৈনদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে তিনি শবরদেব সঙ্গে বসবাস করেছিলেন, তাই তাঁর নাম হয় শবরস্বামী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পিক, নিম, চের প্রভৃতি ম্লেচ্ছশব্দের প্রামাণ্য তিনি প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের একটি অধিকরণে স্বীকার করেছেন। শবরস্বামী রচিত ভাষ্যের নাম শাবরভাষ্য। কুমারিল ভট্ট আবার শাবরভাষ্যের উপর তিনটি বার্ত্তিকগ্রন্থ রচনা করেছেন। যথা – ক. *শ্লোকবার্ত্তিক*, খ. *তন্ত্রবার্ত্তিক* ও গ. *টুপটীকা* (*অনুষ্টুপ টীকা*)। কুমারিল ভট্টের প্রধান শিষ্য হলেন মণ্ডনমিশ্র। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল– *বিধিবিবেক*, *ভাবনাবিবেক*, *বিভ্রমবিবেক*, *মীমাংসাসূত্রানুক্রমণী* ও *স্ফোটসিদ্ধি*। বাচস্পতি মিশ্র মীমাংসাদর্শনের ওপর যে গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন সেগুলি হল- *ন্যায়কণিকা* ও *তত্ত্ববিন্দু*। মাধবাচার্য রচনা করেছেন *জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর* নামে একটি গ্রন্থ। প্রভাকরের রচিত *বৃহতী* ও *লঘ্বী* বা *বিবরণ* নামে দুটি টীকা গ্রন্থ পাওয়া যায়। নারায়ণভট্ট রচনা করেছেন *তন্ত্রবার্ত্তিকনিবন্ধন* ও *মানমেয়োদয়* গ্রন্থদুটি। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টও মীমাংসাদর্শনের ওপর *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থটি রচনা করেছেন, যা আমাদের গবেষণার বিষয়।

## ৩.২.৬. *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটির বিষয়বস্তু :

*মীমাংসাসূত্র* বা *পূর্বমীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটি আনুমানিক ৩০০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত। ঋষি জৈমিনিরচিত প্রাচীন হিন্দু দার্শনিক গ্রন্থগুলির মধ্যে এই গ্রন্থটি অন্যতম।

এই গ্রন্থটি ভারতীয় দর্শনের ছয়টি আস্তিক দর্শনের মধ্যে প্রথম মীমাংসার ভিত্তি তৈরি করে। পরম্পরা অনুযায়ী, ঋষি জৈমিনি ছিলেন *মহাভারতের* রচয়িতা ঋষি বেদব্যাসের অন্যতম শিষ্য। *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটিতে বারোটি অধ্যায় রয়েছে।

'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা'[১১৭] সূত্র দিয়ে গ্রন্থটির সুচনা হয়েছে। ১২টি অধ্যায়ের পরে আরও ৪টি অধ্যায় রয়েছে, যা সঙ্কর্ষকাণ্ড নামে পরিচিত। কিন্তু আচার্য শবরস্বামী এই চারটি অধ্যায়ের উপর কোনও ভাষ্য রচনা করেননি, তাই এই অধ্যায়গুলি জৈমিনি প্রণীত নয় বলে অনেকে মনে করেন। বারোটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল– প্রথম অধ্যায়ের মূল বিষয় হল- বিধিপ্রামাণ্য। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন শব্দের সংকলন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল বিষয়- হল, বিধিনিহিত কর্মসমূহের ভেদ। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন আচারমূলক কার্যের পার্থক্য, ভুল প্রমাণের খণ্ডন ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের মূল বিষয় হল- বিহিত কর্মসমূহের অঙ্গাঙ্গিভাব সম্পর্ক। এই অধ্যায়ে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায়ের মূল বিষয় হল ক্রতুপ্রযুক্ত অনুষ্ঠেয় এবং পুরুষার্থপ্রযুক্ত অনুষ্ঠেয় কর্মসমূহের বিবরণ। এই অধ্যায়ে প্রধান এবং অধস্তন আচারের অন্যান্য আচারের উপর প্রভাব, জুহু এবং পাশা খেলার ফল এবং রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। পঞ্চম অধ্যায়ের মূল বিষয় হল- কর্মানুষ্ঠানের ক্রম। এই অধ্যায়ে শ্রুতির বিভিন্ন অনুচ্ছেদ, ত্যাগ ও তার অংশবিশেষ ইত্যাদির আপেক্ষিকক্রম বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূল বিষয় হল- অধিকার অর্থাৎ যজ্ঞকারী পুরুষের যোগ্যতা। এই অধ্যায়ে বলিদান প্রদানের যোগ্য ব্যক্তি, তাঁদের বাধ্যবাধকতা, যজ্ঞে ব্যবহৃত উপকরণের বিকল্প

[১১৭] মী. সূ, ১.১.১

এবং বিভিন্ন যজ্ঞের অগ্নি পরিষ্কার করা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের মূল বিষয় হল- প্রকৃতিযাগে উপদিষ্ট অঙ্গসমূহের বিকৃতিযাগে সামান্যাতিদেশ। এই অধ্যায়ে অনুষ্ঠানের স্থানান্তর ও এক যজ্ঞ থেকে অন্য যজ্ঞে গুণ দ্বারা স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের মূল বিষয় হল- প্রকৃতিযাগে উপদিষ্ট অঙ্গসমূহের বিকৃতিযাগে দ্রব্যদেবতাদি দ্বারা বিশেষাতিদেশ। এই অধ্যায়েও অনুষ্ঠানের স্থানান্তর ও এক যজ্ঞ থেকে অন্য যজ্ঞে গুণ দ্বারা স্থানান্তর আলোচিত হয়েছে। নবম অধ্যায়ের মূল বিষয় হল ঊহ। এই অধ্যায়ে স্তোত্রের ঊহ্য এবং সমান ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ের মূল বিষয় হল বাধ। এই অধ্যায়ে প্রাথমিক আচার-অনুষ্ঠান এবং গ্রহকে নৈবেদ্য না দেওয়া ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। একাদশ অধ্যায়ের মূল বিষয় হল তন্ত্র। এই অধ্যায়ে তন্ত্র, আবাপ ইত্যাদির বিষয় আলোচিত হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের মূল বিষয় হল প্রসঙ্গ।

## ৩.২.৭. আচার্য জৈমিনির পরিচয় :

জৈমিনি এই নামটি বেশ প্রাচীন। *সামবেদের* একটি জৈমিনীয় সংহিতা ও একটি জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ আছে। *সামবিধান-ব্রাহ্মণ* অনুসারে জৈমিনি ছিলেন পারাশর্যের শিষ্য এবং জৈমিনির শিষ্য ছিলেন পৌষ্পপিণ্ড্য।[১১৮] আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রেও জৈমিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। *মীমাংসাসূত্রে* পাঁচবার জৈমিনির নাম দু'ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে উত্তরপক্ষে চারবার এবং পূর্বপক্ষে একবার জৈমিনির নাম পাওয়া যায়। আচার্য জৈমিনির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে *পঞ্চতন্ত্রের* মিত্রপ্রাপ্তি নামক তন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'মীমাংসাকৃতমুন্মমাথ সহসা হস্তী মুনিং

[১১৮] সাম. ব্রা., ৩.৯.৬

জৈমিনিম্'[১১৯] অর্থাৎ মীমাংসাকার জৈমিনিকে হস্তী হঠাৎ পদদলিত করেছিল। আচার্য জৈমিনি সম্পর্কে শুধুমাত্র এইটুকুই তথ্য পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। জৈমিনির আবির্ভাবকাল নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। এ. বি. কীথ মহাশয় আচার্য জৈমিনিকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেন এবং পি. বি. কানে মহোদয় খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের সমসাময়িক বলে মনে করেন। অনেকে আবার খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের কাছাকাছি সময়কে আচার্য জৈমিনির কাল বলে মনে করেন। তবে তুলনামূলক আলোচনার নিরিখে একথা বলা যায় যে, ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণেরই সমসাময়িক ছিলেন আচার্য জৈমিনি।

## ৩.২.৮. মীমাংসাচর্চায় আচার্য হলায়ুধভট্ট :

আচার্য হলায়ুধভট্ট একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রকার।[১২০] তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিশারদ এবং তাঁর জ্ঞান বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত ছিল। হলায়ুধ-রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে *মীমাংসাসর্বস্ব* অন্যতম। এই গ্রন্থটি তাঁর মীমাংসাশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় প্রদানে সার্থক ভূমিকা নেয়।

## ৩.২.৯. *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন :

ষড়্বিধ আস্তিক দর্শনের মধ্যে অন্যতম হল মীমাংসাদর্শন। মীমাংসাদর্শনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল *মীমাংসাসূত্র*। আচার্য হলায়ুধ এই *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থকেই আশ্রয় করে

---

[১১৯] সিংহো ব্যাকরণস্য কর্তুঃ অহরৎ প্রাণান পির্যান পাণিনেঃ মীমাংসাকৃতম্ উন্মমাথ সহসা হস্তি মুনিং জৈমিনিম্। ছন্দো-জ্ঞান-নিধিং জঘান মকরো বেলাতটে পিঙ্গলম্ অজ্ঞানাবৃতচেতসাম্ অতিরুষাং কোঽর্থঃ তিরশ্চাং গুণৈঃ।। পঞ্চ., ২.৩৫

[১২০] কবি., প্রাক্কথন অংশ, হলায়ুধভট্ট, শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.)

*মীমাংসাসর্বস্ব* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থেও তিনি মীমাংসা দর্শনের মতোই অধ্যায়, পাদ, অধিকরণ ও সূত্রে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করেছেন।

বিহার ও ওড়িশার মুখপত্রে *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের সামান্য কিছু অংশ পাওয়া যায়। সেই অংশের আলোচনাই আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভাংশে উপস্থাপন করা হল। তবে বিহার ও উড়িশার মুখপত্রে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে হলায়ুধ রচিত *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থটির নামের পরিবর্তে *মীমাংসাশাস্ত্রসর্বস্ব* বলা হয়েছে।[১২১]

*মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটিকে পুরোপুরিভাবে অনুকরণ করে আচার্য হলায়ুধভট্ট *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটিতেও *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটির মতোই অধ্যায় বিভাজন রয়েছে। তবে এই গ্রন্থটির সম্পূর্ণ অংশ লাভ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি, শুধুমাত্র তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ পর্যন্ত অংশটুকু বিহার ও উড়িশার মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছে বলে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাই আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের সংগৃহীত অংশবিশেষেরই বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্যসমৃদ্ধপূর্ণ তত্ত্বান্বেষণের প্রয়াস করা হয়েছে। *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে কয়েকটি করে পাদ। প্রতিটি অধ্যায়ের আবার পৃথক নামকরণও করা হয়েছে। অধ্যায়গুলির মধ্যে রয়েছে কয়েকটি করে পাদ। পাদগুলির মধ্যে রয়েছে কয়েকটি করে অধিকরণ। সূত্রগুলিকে সেইসব অধিকরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হয়েছে। তবে *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটিতে যত সংখ্যক সূত্র রয়েছে, *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধভট্ট তদপেক্ষা কম সংখ্যক সূত্রেরই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সূত্র সংখ্যার দিক দিয়ে মূল গ্রন্থের সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি

---

[১২১] The journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol.XVII & XVIII, 1931.

পাদের প্রতিটি অধিকরণের প্রথম সূত্রটিকে আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থে পূর্বপক্ষী ও সিদ্ধান্তীর আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

## ৩.২.৯.১. *মীমাংসাসর্বস্বের* প্রথম অধ্যায় :

প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের নামকরণ করা হয়েছে তর্কপাদ। এই পাদের সূত্রগুলির বিষয় হল- ধর্মশাস্ত্রারম্ভপ্রতিজ্ঞাধিকরণ। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্র হল- ১. 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা'।[১২২] এই সূত্রটি ধর্মশাস্ত্রারম্ভপ্রতিজ্ঞাধিকরণ অংশে রয়েছে। এই সূত্রের অন্তর্গত অথ শব্দ আনন্তর্য্যবোধক। সুতরাং এর দ্বারা পূর্ববর্তী কোনও কর্মেরই অনন্তর বোঝায়। এখানে বেদাধ্যয়নই সেই পূর্বকর্ম এবং তার অনন্তর ধর্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ বেদার্থবিচার করা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, বেদ অধ্যয়ন না করলে বেদার্থবিচাররূপ ধর্মজিজ্ঞাসা করা যায় না। আর সূত্রে অথ শব্দ আনন্তর্য্যবোধক এবং সেই কারণেই বেদাধ্যয়নবিচারের কারণ রূপে অন্য অর্থ প্রকাশ করা কর্তব্য। আচার্য হলায়ুধ ধর্ম শব্দটিকে উপলক্ষণার্থে গ্রহণ করেছেন। অধর্মে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য জিজ্ঞাসা পদের প্রয়োগ হয়েছে এবং সেই জিজ্ঞাসা আবার চতুর্বিধ। যথা – ধর্ম, স্বরূপ, প্রমাণ এবং সাধন। পরবর্তী সূত্রটি হল– 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'।[১২৩] এই সূত্রটি ধর্মলক্ষণাধিকরণের মধ্যে পঠিত হয়ে থাকে। ধর্ম কি? ধর্মের লক্ষণ কি? এরূপ জিজ্ঞাসার বিষয়কে অবলম্বন করে ধর্মস্বরূপ বিষয়ে 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'[১২৪] সূত্রটির উপস্থাপন করা হয়েছে। পুরুষের ইষ্ট ফলের সাধন বলে যে ক্রিয়া বেদে

---

[১২২] মী. স, ১.১.১

[১২৩] তদেব., ১.১.২

[১২৪] তদেব

উপদিষ্ট হয়েছে, তাই হল ধর্ম। সুতরাং বেদ বিহিত যাগ, দান, হোম ইত্যাদি সকল ক্রিয়াবিশেষই হল ধর্ম। তার দ্বারাই পুরুষ অভিলষিত শ্রেয়লাভ করে থাকে।

লক্ষণ এবং প্রমাণ না থাকলে বস্তুর সত্তা অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। অর্থাৎ লক্ষণ এবং প্রমাণ থাকলেই বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ করা যায়। বলা হয়েছে, 'মানাধীনা মেয়সিদ্ধির্মানসিদ্ধিশ্চ লক্ষণাৎ'[১২৫] অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয় পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু ধর্মের কোনও লক্ষণ নেই। কেননা শুধুমাত্র লৌকিক বস্তুরই লক্ষণ হয়ে থাকে। ধর্ম অলৌকিক, তাই তার লক্ষণও নেই। আর ধর্মের কোনও প্রমাণও নেই। কেননা ধর্ম প্রত্যক্ষাদির বিষয় নয়।

'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'[১২৬] সূত্রে চোদনা শব্দের অর্থ হল প্রবর্ত্তনা ও নিবর্ত্তনা বিধায়ক বেদবাক্য। লক্ষণ শব্দের অর্থ হল যার দ্বারা লক্ষিত বা জ্ঞাপিত হয়। এখানে চোদনাকেইও ধর্মের লক্ষণ এবং প্রমাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্রের অর্থঃ পদটির দ্বারা অনর্থের ধর্মত্ব নিষেধ করা হয়েছে। আচার্য হলায়ুধভট্ট এই প্রসঙ্গে *শ্লোকবার্তিকের* চোদনাসূত্রের উল্লেখ করেছেন,

"দ্রব্যক্রিয়াগুণহীনাং ধর্মত্বং সমাপয়িষ্যতে।

তেষামৈন্দ্রিয়কত্ত্বেঽপি ন তাদ্বন্যেণ ধর্মতা।।

শ্রেয়ঃ সাধনতা হ্যেষাং নিত্যং বেদাৎপ্রতীয়তে।

---

[১২৫] তত্ত্ব., দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ, পৃ. ২১৭

[১২৬] মী. স., ১.১.২

তাদ্বণ্যেণ চ ধর্মত্বং তস্মান্নেন্দ্রিযগোচরঃ।।"[১২৭]

এরপর 'তস্য নিমিত্তং পরীষ্ঠিঃ'[১২৮] নামক সূত্রটি ধর্মপ্রমাণপরীক্ষাধিকরণে উল্লিখিত হয়েছে। ধর্মের নিমিত্ত বা কারণীভূত যে প্রমাণ তারই পরীক্ষা করার বিষয় সূত্রটিতে বলা হয়েছে।

প্রথম সূত্রে শাস্ত্রের প্রয়োজন বিষয়ে বলা হয়েছে আর দ্বিতীয় সূত্রে এই শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয় প্রতিপাদিত হয়েছে, তাই অতি সংক্ষিপ্তাকারে প্রতিজ্ঞাত হয়েছে। কিন্তু উপস্থিত প্রমেয় ধর্মেরই স্বরূপ বিচার করা হবে নাকি তার প্রমাণের বিচার করা হবে, এই প্রকার সংশয়ের স্থলে আলোচ্য সূত্রটি উপস্থাপিত হয়েছে। এই সূত্রে বলা হয়েছে, প্রমাণ থেকেই প্রমেয় সিদ্ধি হয়ে থাকে, আর সেই প্রমাণ যদি দুষ্ট হয় তাহলে তার দ্বারা প্রমেয় সিদ্ধি হতে পারে না। এই অধ্যায়ে যে প্রমাণ বিষয়ক পরীক্ষা করা হয়েছে তা এই সূত্র দ্বারাই বোধগম্য হয়ে থাকে।

'তস্য নিমিত্তং পরীষ্টিঃ'[১২৯] সূত্রে যে প্রমাণপরীক্ষার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, তার আরম্ভ 'সৎসম্প্রয়োগে...'[১৩০] সূত্রটির উপস্থাপনের দ্বারা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিদ্যমান বস্তুর সঙ্গে সন্নিকর্ষ অবশ্য অপেক্ষিত হয় বলে সেই প্রত্যক্ষ ধর্মতত্ত্বপ্রমিতির কারণ নয়, যেহেতু তা বিদ্যমান বস্তুরই উপলব্ধির কারণ হয়ে থাকে।

---

[১২৭] শ্লোক., চোদনাসূত্র, কারিকা. ১৩-১৪

[১২৮] মী. স., ১.১.৩

[১২৯] তদেব

[১৩০] তদেব., ১.১.৪

ধর্মতত্ত্বনিরূপণবিষয়ক প্রমাণের বিকল্প এবং সমুচ্চয় আশঙ্কা করে 'চোদনৈব প্রমাণম্' এই প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হলে এই সূত্রটির উপস্থাপন করা হয়েছে। অতএব বেদও যেমন ধর্মাধর্ম তত্ত্বনিরূপণে প্রমাণ, যোগিগণের প্রত্যক্ষও তেমনি ধর্মাধর্ম তত্ত্বনিরূপণের প্রমাণ। সূত্রস্থ সম্প্রয়োগ শব্দটির অর্থ হল সন্নিকর্ষ।

পূর্বসূত্রে ধর্মপ্রমিতিবিষয়ে প্রত্যক্ষ্যাদির অযোগ্যতা প্রতিপাদিত হয়েছে। যে বস্তু শব্দাতিরিক্ত কোনও প্রমাণের বিষয় নয়, তার বিষয়ে কেউ যদি কোনও কথা বলে তাহলে তিনি যত আপ্তই হোন না কেন, তার কথায় কেউই বিশ্বাস স্থাপন করে না। অর্থের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ অবশ্যই স্বাভাবিক। এই কারণে বেদবিধিই অগ্নিহোত্রাদিরূপ ধর্মের জ্ঞাপক। আর সেই বিধিবাক্যের উপদেশ অনুপলব্ধ বিষয়ক অর্থাৎ অজ্ঞাতজ্ঞাপক বলে এবং তৎসম্ভূত জ্ঞানের বিপর্যয় হয় না বলে তা প্রমাণ, যেহেতু তা অনপেক্ষ অর্থাৎ প্রমাণান্তর সাপেক্ষ নয়। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলে তার দ্বারা বেদের ধর্মপ্রতিপাদিত করা যায় না। অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা আকৃতির নিত্যতা সাধিত হয়ে থাকে মাত্র। পূর্বপদার্থের সম্বন্ধের দ্বারা অথবা বাক্যার্থের দ্বারা বেদের পৌরুষেয়তা প্রতিপাদিত হতে পারে না, তা পূর্বসূত্রেই দেখানো হয়েছে। তবে সমাখ্যাবলেও যে বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হতে পারে না, তা স্থাপন করার জন্য 'বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ'[১৩১] সূত্রে পূর্বপক্ষীর মত উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে চোদনার অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্মের যে প্রামাণ্য প্রতিস্থাপিত হয়েছে সেখানে সমগ্র বেদেরই প্রামাণ্য সূচিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পাদে পূর্বপক্ষীগণ শুধুমাত্র চোদনারই প্রামাণ্য মেনে নিয়ে 'আম্নাযস্য

[১৩১] মী. স., ১.১.২৭

ক্রিযার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে'[১৩২] সূত্রে প্রকারান্তরে বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন এবং সিদ্ধান্তীগণ 'বিধির্বা স্যাদপূর্বত্বাদ্বাদমাত্রং হ্যনর্থকম্'[১৩৩] ইত্যাদি সূত্রে তার পরিহার ও সিদ্ধান্ত করেছেন।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা'[১৩৪] – সূত্রে বলা হয়েছে যে, বেদার্থরূপ ধর্ম বিচার করা কর্তব্য। এই সূত্রের বিষয়ীভূত 'স্বাধ্যায়ঽধ্যেতব্যঃ' শ্রুতিবচন থেকে জানা যায় যে, সমগ্র বেদেই পুরুষার্থলাভের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। বেদ বিধি, মন্ত্র, নামধেয় এবং অর্থবাদ – এই চারভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে বেদের বিধিভাগই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষার্থের উপায় নির্দেশ করে বলে ক্রিয়াপ্রতিপাদনরত বিধি অংশকেই প্রমাণ হিসাবে ধরা হয়। তা 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ'[১৩৫] – এইরূপে আরম্ভ করে তদ্ ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নাযঃ' – এইভাবে উপসংহার করায় তা স্পষ্টতই বোঝা যায়। অতএব বেদের যে সমস্ত অংশ ক্রিয়া প্রতিপাদক নয়, সেগুলি অনর্থকই। আর যা কিছু অনর্থক, তার প্রামাণ্যের কোনও হেতু থাকতে পারে না।

মন্ত্র, নামধেয় এবং অর্থবাদের মধ্যে অর্থবাদের আলোচনায় প্রথম পাদের পরিসমাপ্তি হয়েছে বলে এবং অর্থবাদ সকল বিধিজন্য প্রবৃত্তি বিষয়ে বিশেষভাবে অপেক্ষিত বলে, প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে তারই বিচার করা হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদে অর্থবাদ দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে।

---

[১৩২] মী. স., ১.২.১

[১৩৩] তদেব., ১.২.১৯

[১৩৪] তদেব., ১.১.১

[১৩৫] তদেব., ১.১.২

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে সর্বসমেত চারটি অধিকরণ রয়েছে এবং প্রতিটি অধিকরণে একটি করে সূত্রের আলোচনা রয়েছে। দ্বিতীয় পাদে অর্থবাদ অধিকরণ, বিহিবন্নিগদাধিকরণ, হেতুবন্নিগদাধিকরণ এবং মন্ত্রলিঙ্গাধিকরণের আলোচনা রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে শাখান্তরিত বেদবিধি, মন্ত্র বা অর্থবাদমূলক স্মৃতির প্রামাণ্য বিষয়ে বিচার করা হয়েছে। স্মৃতি প্রমাণ নাকি অপ্রমাণ – এই প্রকার সংশয়ে 'ধর্মস্য শব্দমূলত্বাদশব্দমনপেক্ষ স্যাৎ'[১৩৬] ইত্যাদি সূত্রে পূর্বপক্ষীগণের মত উপস্থাপিত হয়েছে। সূত্রকার জৈমিনি 'হেতুদর্শনাচ্চ'[১৩৭] সূত্রটিকে কোনও অধিকরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি। কিন্তু আচার্য হলায়ুধ তার *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের এই সূত্রটিতেও এই অধ্যায়ের প্রথম অধিকরণের মত স্মৃতির প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরপর পদার্থপ্রাবল্যাধিকরণ নামক অধিকরণে প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি কোন স্থলে অপ্রমাণ আর কোন স্থলে প্রমাণ তার বিচার করা হয়েছে। অতঃপর শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ পদার্থপ্রামাণ্যাধিকরণে স্মৃতির প্রাবল্য ও দৌর্বল্য নিরূপণ প্রসঙ্গে শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে আর্য এবং অপভাষাপ্রয়োগকারী প্রাকৃত জনগণের যে বৈষম্য দেখা যায়, তারই প্রাবল্য ও দৌর্বল্য বিচার করা হয়েছে। ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধপদার্থপ্রামাণ্যাধিকরণ নামক অধিকরণে ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণীয় কি না এই বিষয়ে পূর্বপক্ষীগণ বলেন যে, পূর্ব অধিকরণে যেহেতু ম্লেচ্ছপ্রয়োগ গ্রহণীয় হয়নি সেহেতু এখানেও তা গ্রহণ করা যাবে না। তখন সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, আর্যপ্রসিদ্ধির সঙ্গে ম্লেচ্ছ ব্যবহারের বিরোধ থাকলে এই নিয়মই পালন করা উচিত। কিন্তু যদি আর্যগণের মধ্যে এই সমস্ত শব্দের অর্থ অপ্রসিদ্ধ হয় তখন ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধিই আদরণীয় বা গ্রহণীয় হয়। এরপর কল্পসূত্রাধিকরণে কল্পসূত্রাদি

---

[১৩৬] মী. স., ১.৩.১

[১৩৭] মী. সূ., ১.৩.৪; তদেব, ১.৩.৪

স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ কি না অর্থাৎ অপৌরুষেয় কিনা তার বিচার করা হয়েছে। যজ্ঞের প্রয়োগ কৌশল যে গ্রন্থে কল্পিত হয়েছে তারই নাম কল্প এবং সংজ্ঞা ও পরিভাষা দ্বারা যা যজ্ঞের প্রয়োগ সূচনা করে, তাই হল সূত্র। কল্প এবং সূত্র উভয়ে মিলে হয় কল্পসূত্র। এরপর সামান্যশ্রুতিকল্পনাধিকরণে শ্রুতিও যে দেশসংযুক্তই হবে সে কথাই বলা হয়েছে। এই অধিকরণকে হোলাকাধিকরণও বলা হয়ে থাকে।

সাধুপদপ্রযুক্ত্যাধিকরণে একটি শব্দ অনেক অর্থের বাচক হতে পারে কি না তার অলোচনা করা হয়েছে তৎপ্রসঙ্গে ব্যাকরণ ও স্মৃতি প্রমাণ কি না তারও বিচার করা হয়েছে। শাবরভাষ্যে এই অধিকরণকে ব্যাকরণপ্রামাণ্যাধিকরণ বলা হয়েছে। আকৃতিশক্ত্যাধিকরণে সাধুশব্দ নিরূপণের প্রসঙ্গে বিচার করা হয়েছে যে, বাচক শব্দের বাচ্য কি? কারণ শব্দের বাচ্য কি? এই সকল বিষয় না জানলে পদের সাধুতা এবং অসাধুতা বিচার করা যায় না। এইভাবে দেখা যায় যে, প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে সর্বসাকুল্যে ১০টি অধিকরণ রয়েছে। সেই সমস্ত অধিকরণের বিষয়ই সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হল।

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে ১৭টি অধিকরণ রয়েছে। উদ্ভিদা যজেত, বলভিদা যজেত, বিশ্বজিতা যজেত ইত্যাদি বিধিবাক্যের উদ্ভিদ, বলভিদ, বিশ্বজিৎ প্রভৃতি যে সমস্ত পদ আছে সেগুলি কীভাবে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হয়, তারই বিচার এই চতুর্থপাদে করা হয়েছে। পরবর্তী অধিকরণে বলা হয়েছে যে, উদ্ভিদ ইত্যাদি পদ নামধেয়ই হবে। কারণ, এর প্রথম শ্রবণকালে রূঢ় অর্থের প্রতীতি হয় না। আর তাতে মত্বর্থলক্ষণা হয়ে থাকে বলে গুণবিধিও হতে পারে না। অন্যান্য অধিকরণগুলি হল যথাক্রমে চিত্রাদি শব্দানাং যাগনামতাধিকরণ, যাগনামধেয়তাধিকরণ, শ্যেনাদিশব্দানাং যাগনামধেয়তাধিকরণ,

বাজপেয়াদিশব্দানাং নামধেয়তাধিকরণ, আগ্নেয়াদীনামতাধিকরণ, বহ্নিরাদিশব্দানাং জাতিবাচিতাধিকরণ, প্রোক্ষণ্যাদিশব্দানাং যৌগিকতাধিকরণ, নির্মন্থ্যশব্দস্য যৌগিকতাধিকরণ, বৈশ্বানরেষ্টত্বাদ্যর্থবাদতাধিকরণ, যজমানশব্দস্য প্রস্তরাদিস্তুত্যর্থত্বাধিকরণ, আগ্নেয়াদিশব্দানাং ব্রাহ্মণাদিস্তুত্যর্থতাধিকরণ, যূপাদিশব্দানাং গবাদিপ্রশংসার্থত্বাধিকরণ এবং ভূমাদিকরণে বাহুল্যেন সৃষ্টিব্যপদেশাধিকরণ। প্রায় প্রত্যেকটি অধিকরণেই ১টি করে সূত্রের উল্লেখ রয়েছে।

### ৩.২.৯.২. *মীমাংসাসর্বস্বের* দ্বিতীয় অধ্যায় :

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যেও রয়েছে প্রথম অধ্যায়ের মতো ৪টি পাদ। এই অধ্যায়ের বিষয় হল ধর্মের স্বরূপ এবং তার ভেদ বর্ণন। শব্দান্তর, অভ্যাস, সংখ্যা, নামধেয়, গুণ এবং প্রকরণ এই ৬টি কারণবশতঃ যে ধর্মের স্বরূপের ভেদ হয়, তার প্রতিপাদনপূর্বক ধর্মের স্বরূপ এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১৮টি অধিকরণ রয়েছে। প্রথম অধিকরণে ভাবনা, আখ্যাতার্থ এবং বিধি নিরূপণ করা হয়েছে। ১৮টি অধিকরণ হল যথাক্রমে অপূর্বস্যাখ্যাতপ্রতিপাদ্যত্বাধিকরণ, অপূর্বস্যাস্তি অধিকরণ, কর্মণাং গুণপ্রধানভাববিভাগাধিকরণ, স্তোত্রাদিপ্রাধান্যাধিকরণ, মন্ত্রাবিধায়কত্বাধিকরণ, মন্ত্রানির্বচনাধিকরণ, ব্রাহ্মণনির্বচনাধিকরণ, উপাদ্যমন্ত্রতাধিকরণ, ঋগ্লক্ষণাধিকরণ, সামলক্ষণাধিকরণ, যজুর্লক্ষণাধিকরণ, নিগদানাং যজুষ্টাধিকরণ, একবাক্যত্বলক্ষণাধিকরণ, বাক্যভেদাধিকরণ, অনুষঙ্গাধিকরণ, ব্যবেতাননুষঙ্গাধিকরণ। এই পাদের বেশ কয়েকটি অধিকরণে একটির বেশি সূত্রেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের বিষয় ধর্মের স্বরূপগত যে ভেদ তা ভাবনাভেদের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, এই কারণে ধর্মের স্বরূপগতভেদ নিরূপণ করতে হলে ভাবনাভেদ নিরূপণ করা আবশ্যক। এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে অপূর্বের স্বরূপ এবং তার ভেদ প্রভৃতি প্রতিপাদিত হয়েছে এবং তৎপ্রসঙ্গে ও অনুপ্রসঙ্গে অপরাপর বিষয়গুলিরও আলোচনা করা হয়েছে। আর এই দ্বিতীয় পাদেই ভাবনার ভেদ অর্থাৎ ধর্মের বা যাগাদি কর্মের ভেদ বিষয়েও বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে যে সমস্ত স্থলে কর্মের ভেদ হয় না, তা ভেদলক্ষণ নামক এই পাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে সর্বসাকুল্যে ২টি অধিকরণ রয়েছে। এখানে যাবজ্জীবন কর্মের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ অনুষ্ঠান করলে তবে একটি অগ্নিহোত্র কর্ম বা দশপূর্ণমাসকর্ম সমাপ্ত হয়, তারই আলোচনা এই পাদের মুখ্যবিষয়।

‘সর্বশাখাপ্রত্যয়ৈককর্মতাধিকরণ’ নামক অধিকরণে বেদের শাখাগত ভেদ থাকার কারণে প্রত্যেকশাখার উপদিষ্ট অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম ভিন্ন নাকি অভিন্ন, তার বিচারই এই পাদের মুখ্যবিষয়। পূর্বপক্ষীগণ এক্ষেত্রে বলেন যে, বিভিন্ন শাখায় উপদিষ্ট একই নামের কর্মসকল ভিন্নই হয়ে থাকে। তবে সিদ্ধান্তপক্ষীর মতে, শাখাভেদে কর্মের ভেদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, একই কর্ম বিভিন্ন স্থানে সমাপ্ত হতে পারে না। তাই শাখাভেদে কর্মের ভেদের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে বলেও শাখাভেদে কর্মের ভেদ নিরূপণ করা হয়েছে।

## ৩.২.৯.৩. *মীমাংসাসর্বস্বের* তৃতীয় অধ্যায় :

*মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ৪টি পাদ রয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে মোট ১৫টি অধিকরণ রয়েছে। এর পূর্বাধ্যায়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় ভেদলক্ষণ নামক অধ্যায়ে কর্মভেদবিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। আর এই তৃতীয় অধ্যায়ে শেষলক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ কাকে বলে? কি কারণে তা শেষ ? কীরূপেই বা তার বিনিয়োগ হয়, এই সকল প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। কর্মভেদবিষয়ক বিচার নিষ্পন্ন হওয়ার পর শেষশেষিভাবের বিচার করা অত্যন্ত আবশ্যক। কেননা শেষশেষিভাব কর্মভেদসাপেক্ষ। এই শেষ শব্দের অর্থ হল অঙ্গ এবং শেষী শব্দের অর্থ হল অঙ্গী বা প্রধান কর্তা।

এই অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১৫টি অধিকরণের মধ্যেই সূত্রগুলি আলোচিত হয়েছে। বেশিরভাগ অধিকরণে একটি সূত্রই আলোচিত হয়েছে তবে এর মধ্যে কয়েকটি অধিকরণে আবার ২টি বা তার বেশি সূত্রও আলোচিত হয়েছে। এই পাদের মূল আলোচনার বিষয় হল শ্রুতির বিনিয়োগ। প্রথম পাদের ১৫টি অধিকরণ হল যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাধিকরণ, শেষলক্ষণাধিকরণ, শেষলক্ষ্যাধিকরণ, নির্বাপণাদীনাং ব্যবস্থিতবিষয়তাধিকরণ, স্ফ্যাদীনাং সংযোগানুসারেণ ব্যবস্থিতত্বাধিকরণ, আরুণ্যাদিগুণানামসংকৌর্ণতাধিকরণ, গ্রহসম্মার্জনাধিকরণ, চমসাদৌ সংমার্গাদ্যপ্রয়োগাধিকরণ, সপ্রদশারত্নিতায়াঃ পশুধর্মতাধিকরন, অভিক্রমণাদীনা প্রয়োজনমাত্রাঙ্গতাধিকরণ, উপবীতস্য প্রাকরণিকাঙ্গতাধিকরণ, গুণানাং মিথোঽসম্বন্ধাধিকরণ, বার্চঘ্ন্যধিকরণ, হস্তাবনেজনাদীনাং কৃৎস্নপ্রাকরণিকাঙ্গতাধিকরণ ও চতুর্ধাকরণাদীনামাগ্নেয়মাত্রাঙ্গতাধিকরণ।

তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের মূল আলোচ্য বিষয় হল লিঙ্গের বিনিয়োগ বিচার। লিঙ্গ অর্থে এখানে মন্ত্র সকলের অর্থপ্রত্যায়ণসামর্থ্যকে বোঝানো হয়েছে। এই পাদে মোট ২০টি অধিকরণ রয়েছে। যার মূল আলোচ্য বিষয় হল লিঙ্গের বিনিয়োগ বিচার।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের মূল আলোচনার বিষয় হল বাক্যাদির বিনিয়োগ বিচার। এই পাদেও সর্বসাকল্যে ১৫টি অধিকরণ রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের মূল আলোচ্য বিষয় হল নিবীত, উপবীত ইত্যাদি। নিবীতের অর্থবাদত্ব বিচার এই পাদের মূল আলোচ্য বিষয়। এই পাদে সর্বসাকুল্যে ২১টি অধিকরণ রয়েছে। *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের উপলব্ধ অংশটুকুর ওপর ভিত্তি করেই এই বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হল।

## ৩.২.১০. *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের রচনাশৈলী :

আচার্য হলায়ুধভট্ট প্রণীত *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থটি মীমাংসা দর্শনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থবিশেষ। এটি মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়নে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের নিকট খুবই প্রয়োজনীয় একটি গ্রন্থ।

মীমাংসাদর্শনের প্রবর্তক জৈমিনি কর্তৃক রচিত *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটির মর্মোদ্ধার অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সেখানে বহুবিধ সূত্রের সমাবেশ লক্ষণীয়। তাই মীমাংসাশাস্ত্রে প্রথম পাঠার্থী অনুসন্ধিৎসু কোনও ব্যক্তি যদি *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেন তবে মীমাংসাশাস্ত্রের তত্ত্বগুলি তাঁর নিকট সহজেই বোধগম্য হবে। *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থে কোনও বিষয়ের বর্ণনায় অনেকগুলি সূত্রের উপস্থাপনা করার পরিবর্তে একটি বা কখনও দুটি

সূত্রের মধ্যে দিয়েই সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে সহজে বিষয়গুলি পাঠকের বোধগম্য হয়। বিষয়ব্যাখ্যায় অনেকগুলি সূত্রের সমাবেশে বর্ণনীয় বিষয় জটিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আচার্য হলায়ুধভট্ট গ্রন্থ রচনায় এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংক্ষিপ্তাকারে লেখা সূত্রশৈলী, যা মীমাংসাদর্শনে রয়েছে। *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থে সেই সূত্রগুলির সহজবোধ্য ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থাপিত করা হয়েছে। আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থে মীমাংসাদর্শনের সূত্রগুলির উল্লেখ অধিকরণের বিষয় অনুযায়ী বিন্যস্ত করার পর পূর্বপক্ষের মতের উপস্থাপন করেছেন এবং উত্তরপক্ষে স্বমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর ফলে গ্রন্থরচনায় শাস্ত্রালোচনা গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা পেয়েছে।

মীমাংসাদর্শনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *মীমাংসাসূত্র*কে আশ্রয় করে আচার্য হলায়ুধভট্ট *মীমাংসাসর্বস্ব* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থটি সূত্রাকারে রচিত এবং তার গ্রন্থবিন্যাসসূচী অধ্যায়ে বিভাজিত হয়েছে। আর এই গ্রন্থবিন্যাসসূচীকে অনুসরণ করে আচার্য হলায়ুধভট্ট *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। তবে সামান্য কয়েকটি দিক দিয়ে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, যা হলায়ুধের *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের অসাধারণত্বের পরিচায়ক। এই গ্রন্থে *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থের অধ্যায় বিভাজনকে অনুকরণ করা হলেও সবগুলো সূত্র কিন্তু আচার্য হলায়ুধভট্ট গ্রহণ করেননি। হলায়ুধভট্ট অধিকরণের বিষয়কে শিরোনাম হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন সূত্রসমূহের আলোচনার পূর্বেই কিন্তু মূল *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থে সেরকমটা পরিলক্ষিত হয় না। সেখানে মূলত সূত্রগুলি রচনার সমাপ্তিতে অধিকরণের নামের উল্লেখ করা হয়েছে। *মীমাংসাসূত্র* গ্রন্থে যেখানে

এক একটি অধিকরণের মধ্যে অনেকগুলি সূত্রের ব্যবহার রয়েছে আচার্য হলায়ুধভট্ট সেখানে শুধুমাত্র একটি মূল সূত্রেরই উল্লেখ ও তার ব্যাখ্যা *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থে করেছেন। এটাই এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা আচার্য হলায়ুধভট্টের কৃতির অসাধারণত্বের পরিচায়ক।

## ৩.৩. *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের হলায়ুধবৃত্তি* বা *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* বিশেষ পর্যালোচনা:

### ৩.৩.১. বেদাঙ্গ :

বেদের অঙ্গকে বেদাঙ্গ বলা হয়। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে বেদের মন্ত্রগুলি প্রচলিত ছিল। কালক্রমে সেগুলি যাতে বিকৃত না হয় এবং বেদের পাঠ ও অর্থবোধনে যাতে সহায়ক হয়, এমন কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সেই গ্রন্থগুলিকেই বেদাঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বৈদিক শব্দের ব্যাকরণগত টীকা, ভাষ্য, তাৎপর্য, যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট তিথি নক্ষত্রাদির সম্যক্ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল। তাই এই বেদাঙ্গগুলিকে পৌরুষেয় বলা যায়। বিভিন্ন ঋষি নিজ নিজ প্রতিভার আলোকে বেদের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে এই গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে যেমন একজন অঙ্গীর দেহের পূর্ণতা লাভ হয়ে থাকে, তেমনি এই অঙ্গগুলি বেদের অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধিতে পূর্ণতা দান করে থাকে। বেদাঙ্গের সংখ্যা হল ছয়টি। যথা – শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। *পাণিনীয়শিক্ষা গ্রন্থে* বেদাঙ্গগুলিকে বেদপুরুষের ছয়টি অঙ্গরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।

জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।

শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।

তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।"[১৩৮]

অর্থাৎ ছন্দ হল বেদপুরুষের পাদদ্বয়, কল্প হল হস্তদ্বয়, জ্যোতিষ হল চক্ষুদ্বয়, নিরুক্ত হল কর্ণদ্বয়, শিক্ষা হল ঘ্রাণ এবং ব্যাকরণকে বেদপুরুষের মুখরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

বেদের সহায়ক গ্রন্থগুলিকে বলা হয় বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ ছয়প্রকার– শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। *মুণ্ডকোপনিষদে* অপরাবিদ্যার স্বরূপ বর্ণনকালে বেদাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে ছন্দকে পঞ্চম বেদাঙ্গ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৯] তবে *পাণিনীয় শিক্ষা* গ্রন্থে ছন্দকে বেদ-পুরুষের পাদযুগলের সঙ্গে তুলনা করে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪০] এ থেকে সহজেই ছন্দের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ঋষি, ছন্দ ও দেবতা ইত্যাদি সম্যক না জেনে যদি বেদপাঠ করা হয় তাহলে তা মন্ত্রকণ্টক দোষ বলে বিবেচিত হয়।[১৪১] বস্তুত, যথাযথরূপে ছন্দ না জেনে বেদপাঠ বা অর্থবোধ কোনওটাই সম্ভব নয়। ছন্দ যজমান বা হোতার পাপকে আচ্ছাদন করে থাকে। বৈদিক ছন্দগুলি মূলত অক্ষরাত্মক। বেদে মূলত সাতপ্রকার ছন্দ পাওয়া যায়, যথা- গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী।

---

[১৩৮] পা. শি., ৪১-৪২

[১৩৯] মুণ্ডক., ১.৫.৫

[১৪০] ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে । জ্যোতিষাময়নং চক্ষু নিরুক্তং শ্রোত্রম্ উচ্যতে ।। শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণম্ স্মৃতম্ । তস্মাদ সাঙ্গম্ অধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।। পা. শি., ৪১-৪২

[১৪১] ঋষিচ্ছন্দো দৈবতানি ব্রাহ্মণার্থং স্বরাদ্যপি। অবিদিত্বা প্রযুঞ্জানো মন্ত্রকন্টক উচ্যতে।। সর্বা., ষড়গুরুশিষ্য ভাষ্য. ১.২

বেদের অর্থ জানার জন্য ছন্দ বেদাঙ্গের প্রয়োজন রয়েছে। ছন্দঃ শব্দের প্রাতিপদিক হল ছন্দস্। এই ছন্দস্ শব্দের মূলে যে ধাতুটি বর্তমান তার সম্পর্কে নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। *কৃষ্ণযজুর্বেদের* অন্তর্গত তৈত্তিরীয় সংহিতার বিবরণ অনুযায়ী ছন্দস্ শব্দের মূলে ছদ্ ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪২] *তৈত্তিরীয় সংহিতার* বিবরণে বলা হয়েছে, প্রজাপতির নিকটে দেবতারা প্রথমে অগ্রসর হতে পারছিলেন না। পরে তাঁরা নিজেদের ছন্দ দ্বারা আবৃত করে তাঁর নিকটে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেহেতু ছন্দের দ্বারা তাঁরা নিজেদের আচ্ছাদিত করতে পেরেছিলেন, তাই নাম হয়েছে ছন্দ।[১৪৩]

*ছান্দোগ্যোপনিষদের* বিবরণ অনুযায়ী দেবতারা মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে ত্রয়ী বিদ্যার মধ্যে প্রবেশ করে ছন্দের দ্বারা আত্মগোপন করেছিলেন, তাই এগুলির নাম হয়েছে ছন্দ।[১৪৪] যাস্কাচার্য রচিত *নিরুক্ত* গ্রন্থেও ছন্দ শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'ছন্দাংসি ছাদনাৎ' অর্থাৎ আচ্ছাদন হেতু ছন্দ নাম হয়েছে।[১৪৫] এই বিবরণগুলি থেকে ছন্দের ছন্দস্ত্ব বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, যার দ্বারা আত্মগোপন করা যায় এবং যা মৃত্যু হতে রক্ষা করে, তাই ছন্দ নামে পরিচিত।

## ৩.৩.২. ছন্দ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থবিচার :

ছন্দ শব্দের ব্যুৎপত্তি হল চন্দি (আহ্লাদন) + অস্ (অসুন)। কর্তৃবাচ্যে চ স্থানে ছ আদেশ হয়েছে। ছন্দঃ শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গে *সিদ্ধান্তকৌমুদীতে* বলা হয়েছে, 'চন্দয়তি

---

[১৪২] ধাতু., ছদি সংবরনে, সূত্র সংখ্যা, ১৫৭৭; ছদ অপবারণে, সূত্র, ১৮৩৮, ১৯৩৫

[১৪৩] তৈ. সং., ৫.৬.৬.১

[১৪৪] ছা. উ., ১.৪.২

[১৪৫] নি., ৭.৩.১২

হ্লাদয়তি ইতি ছন্দঃ'।[১৪৬] আনন্দদান করে বলেই একে ছন্দ বলে। *ছন্দোগ্যোপনিষদে* বলা হয়েছে, ছন্দ মন্ত্রের দোষকে আচ্ছাদন করে থাকে। যাস্কাচার্যের *নিরুক্তেও* 'ছন্দাংসি ছাদনাৎ' প্রায় একইরকম বক্তব্য পাওয়া যায়।[১৪৭] এখানে চুরাদিগণীয় ছদ্ বা ছদি ধাতু থেকে ছন্দ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে অথবা সংবরণার্থক ছদ ধাতু থেকে ছন্দ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। *নিরুক্তে* উল্লিখিত ছন্দঃ সংজ্ঞার টীকায় দুর্গাচার্যের অভিমত হল, 'যদেভিরাত্মানমাচ্ছাদয়ন দেবাঃ মৃত্যোর্বিভ্যতঃ তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্'[১৪৮]। *ঋগ্বেদে* আনন্দদান অর্থেই ছন্দ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। বলা হয়েছে, 'শ্রিয়ে ছন্দে ন স্ময়তে'[১৪৯]। সুতরাং ঋগ্বৈদিক ভাবনায় আনন্দদান করাই হল ছন্দের ধর্ম। বেদকেও ছন্দস্ বলা হয়ে থাকে। এ থেকেই বোঝা যায়, সুপ্রাচীনকালেও ছন্দের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ছন্দোজ্ঞান বর্জিত হয়ে মন্ত্রপাঠ করলে যজমানের যে ক্ষতি হত সেকথা শিক্ষা গ্রন্থেও বলা হয়েছে। *পাণিনীয় শিক্ষায়* বলা হয়েছে, 'স বাগ্বজ্র যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রু স্বরতো'পরাধাৎ'।[১৫০] বেদার্থের সম্যক্ উপলব্ধির জন্যে যে ছয়টি বেদাঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল ছন্দ।

*ঐতরেয় আরণ্যকে* বলা হয়েছে, 'ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্মণঃ ছন্দঃ'[১৫১] অর্থাৎ পাপকাজ থেকে মনুষ্যকে রক্ষা করার জন্য এর নাম হয়েছে ছন্দ। *তৈত্তিরীয় সংহিতায়* বলা হয়েছে – "প্রজাপতিরগ্নিমচিনুত। স ক্ষুরপবির্ভূত্বা ইতিষ্ঠৎ। তং

---

[১৪৬] সি. কৌ., দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৪৬১

[১৪৭] নি., ৭.৩.১২

[১৪৮] ছা. উ., ১.৪.২

[১৪৯] ঋ. স., ১.৯২.৬

[১৫০] পা. শি., ৫২

[১৫১] ঐ. আ., ২.৫

দেবো বিভ্যতো লোপায়ন্। তে ছন্দোভিরাত্মানং ছায়য়িত্বোপায়ন। তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বমিতি।"[১৫২] এখানে ছন্দ হল দেবতাদের রক্ষাকারী। কাত্যায়ন তাঁর *ঋগ্বেদ সর্বানুক্রমণী* গ্রন্থে ছন্দের লক্ষণ বিষয়ে বলেছেন, 'যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ'।[১৫৩] এই লক্ষণের মধ্যেই অক্ষরাত্মক ছন্দের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অযত্নবিন্যস্ত শব্দের দ্বারা কাব্য রচনা করা যায় না। ছন্দ অর্থাৎ চলার সৌন্দর্য বা গতির সৌন্দর্য। কাব্য রচনার মধ্যে এই সৌন্দর্যতার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। সুন্দর বাণী সুষমায় কাব্য সুখশ্রাব্য হয়ে থাকে।

## ৩.৩.৩. বৈদিক ছন্দ :

*পাণিনীয় শিক্ষায়* ছন্দকে বেদের পাদযুগলের সঙ্গে তুলতা করে বলা হয়েছে, 'ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য'।[১৫৪] বস্তুতঃ পা হল এগিয়ে চলার অঙ্গ, আর এই ছন্দরূপ পায়ের সাহায্যে এগিয়ে চলে বেদ। বৈদিক সূক্তগুলিতে প্রতি ছন্দেরই একজন করে দেবতা রয়েছেন। ছন্দ হল সেই দেবতাদের বাহন। আর এই ছন্দের রথেই এগিয়ে চলেছেন বৈদিক ঋষি কবিগণের মানস উল্লাস।

বৈদিক কর্মকাণ্ডের কিছু কিছু বিধি নির্ভরশীল ছিল ছন্দের উপর। বস্তুতঃ একটি সূক্তকে জানার জন্য ঐ সূক্তের ঋষি, ছন্দ, দেবতা বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।[১৫৫]

---

[১৫২] তৈ. সং., ৫.৬.৬.১

[১৫৩] সর্বা., ২.৬

[১৫৪] পা. শি., ৪১

[১৫৫] পি. ছ. সূ, হলায়ুধবৃত্তি, প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভ অংশ; বৃহদ্., ৮.১৩৬

ছন্দোনির্ভর বিধি যেমন- 'অনুষ্টুভা যজতি, বৃহত্যা গায়তি, গায়ত্র্যা স্তৌতি'[১৫৬] ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। ছন্দের নিয়মগুলি যথাযথভাবে মানা না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মের বাঞ্ছিত ফললাভ সম্ভব নয়। শৌনক তাঁর *ঋক্প্রাতিশাখ্য* গ্রন্থে সাতটি প্রধান বৈদিক ছন্দের উল্লেখ করেছেন,

"গাযত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপচ বৃহতী চ প্রজাপতেঃ।

পঙ্ক্তিস্ত্রিষ্টুব্জগতী চ সপ্তছন্দাংসি তানি হ।।"[১৫৭]

এই সাতটি ছন্দ হল – গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। বেদে এই প্রধান ছন্দোগুলি ছাড়া আরও সাতটি অতিচ্ছন্দ এবং সাতটি বৃহচ্ছন্দ রয়েছে। অতিচ্ছন্দগুলি হল– অতিজগতী, শক্করী, অতিশক্করী, অষ্টি, অত্যষ্টি, ধৃতি ও অতিধৃতি। আর বৃহচ্ছন্দগুলি হল– কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি, সংকৃতি, অতিকৃতি ও উৎকৃতি।

সাতটি প্রধান বৈদিক ছন্দ আবার আর্ষী, দৈবী, আসুরী, প্রাজাপত্যা, যজুঃ, সাম্নী, আর্চী ও ব্রাহ্মী ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। মূল বৈদিক ছন্দ ৭টি, অতিচ্ছন্দ ৭টি এবং বৃহচ্ছন্দ ৭টি মিলে মোট একুশটি ছন্দের কোনও একটিতে এক অক্ষর কম হলে নিচৃৎ আর এক অক্ষর বেশী হলে ভুরিক্ বিশেষণ যুক্ত হয়ে থাকে।

---

[১৫৬] পি. ছ. সূ, হলায়ুধবৃত্তি, প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভ অংশ

[১৫৭] ঋ. প্রা., ষোড়শ পটল, ১

## ৩.৩.৪. ছন্দঃশাস্ত্রের মূল :

অপৌরুষেয় বেদরাশিতে গায়ত্র্যাদি ছন্দের যজ্ঞকর্মে বিনিযোগ করার জন্য এবং বৈদিক মন্ত্রের জ্ঞানলাভের জন্যে ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে তাদের পাদসংখ্যা এবং অক্ষরসংখ্যা নির্দিষ্ট হয়েছে। পাদসংখ্যা ও অক্ষরসংখ্যামাত্রের দ্বারা বৈদিক গায়ত্র্যাদি ছন্দঃশাস্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়েছে। সেখানে কিছু কিছু ঊনত্ব এবং আধিক্যের কারণে ছন্দোহানি ঘটে থাকে। *সাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে* বলা হয়েছে, 'ন হ্যৈকেনাক্ষরেণান্যচ্ছন্দো ভবতি, ন দ্বাভ্যাম্'।[১৫৮] ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও প্রায় একই রকমভাবে বলা হয়েছে, 'ন বা একেনাক্ষরেণ ছন্দাংসি বিযন্তি, ন দ্বাভ্যাম্'।[১৫৯]

## ৩.৩.৫. ছন্দঃশাস্ত্রের প্রাচীনতা :

*ঋকপ্রাতিশাখ্যে, সামবেদের নিদানসূত্রে, শাঙ্খায়নসূত্রে,* বিভিন্ন *অনুক্রমণী* গ্রন্থে এবং *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রে* বৈদিক ছন্দের আলোচনা নিহিত রয়েছে। এছাড়াও কাশ্যপ, কাত্যায়ন, মাণ্ডব্য, সৈতব, ভুজগাধিপ, বিষধর, বৃদ্ধকবি, শালবাহন, হাল প্রমুখ প্রাচীন ছন্দঃশাস্ত্র-রচয়িতাগণের নামও পাওয়া যায়। *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের* প্রথম চারটি অধ্যায়ে বৈদিক ছন্দের আলোচনা থাকলেও পরবর্তী অধ্যায়গুলি জুড়ে লৌকিক ছন্দের আলোচনাই রয়েছে। তবুও তাকেই ছন্দঃ নামক বেদাঙ্গ গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণের* টীকায় *ষড়্গুরুশিষ্যে* পিঙ্গলাচার্যকে পাণিনির ছোট ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১৫৮] সা. ব্রা., ২৭.১

[১৫৯] ঐ. ব্রা., ১.৬

সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের আদি লেখক হিসাবে পিঙ্গলের নামটিই সর্বপ্রথমে উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু পিঙ্গলের রচনাতেই ক্রৌষ্টুকী, তণ্ডী, যাস্ক, রাত, মাণ্ডব্য, কাশ্যপ প্রভৃতি পূর্ববর্তী ছান্দসিকগণের উল্লেখের দ্বারা প্রমাণিত যে আচার্য পিঙ্গলের বহু আগেই ছন্দঃশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। তাই ধ্রুপদীযুগের কবিগণ যে কেবল আচার্য পিঙ্গলকেই অনুসরণ করেছিলেন এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে অনস্বীকার্য যে, পিঙ্গলের *ছন্দঃসূত্র* অসামান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং সারস্বতসমাজে বিপুল বিস্তারলাভও করেছিল। তাছাড়া পিঙ্গলের পূর্ববর্তী ছান্দসিকগণের কোনও ছন্দোগ্রন্থও উপলব্ধ হয় না। পিঙ্গল মুনিরূপে, আচার্যরূপে, নাগরূপে উল্লিখিত হয়েছেন। এ. বি. কীথ্ মহোদয় আচার্য পিঙ্গলকে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পূর্ববর্তী বলেছেন। সুতরাং পিঙ্গলকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের ছন্দঃশাস্ত্রকার বলা যেতে পারে।

## ৩.৩.৬. *পিঙ্গলছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের বিষয়বস্তু :

পিঙ্গলাচার্য রচিত ছন্দঃশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ হল *ছন্দঃসূত্র*। এই গ্রন্থটি ছন্দঃশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ ছন্দের আলোচনাই রয়েছে। *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুগত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হল-

**প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় :**

প্রথম অধ্যায়ে গণের পরিভাষা, গণসংজ্ঞা, গণসংখ্যা, গণদেবতা, লঘুসংজ্ঞা, গুরুসংজ্ঞা, লঘু-গুরু বর্ণের লক্ষণ ও স্বরূপ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

**দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় :**

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গায়ত্রী ছন্দের লক্ষণ, স্বরূপ ও তার ভেদ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়।

**তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় :**

তৃতীয় অধ্যায়ে গায়ত্রী ইত্যাদি সাতটি বৈদিক ছন্দ বিষয়ক আলোচনা পাওয়া যায়। যথা – গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে ছন্দের লক্ষণ, অবান্তরভেদ, পাদের অক্ষর সংখ্যা ইত্যাদির বর্ণনাও পাওয়া যায়।

**চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় :**

চতুর্থ অধ্যায়ে (জগতী ছন্দের পরবর্তীতে) চার সংখ্যা বাড়িয়ে উৎকৃতি নামে ছন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। উৎকৃতি থেকে আরম্ভ করে চারটি চারটি করে অক্ষর সংখ্যা বৃদ্ধি করে অন্যান্য সব ছন্দ গঠিত হয়ে থাকে। সেগুলি হল যথাক্রমে– অভিকৃতি, সংকৃতি, বিকৃতি, আকৃতি, প্রকৃতি। এইভাবে ধৃতি, অতিধৃতি, অষ্টি, অত্যষ্টি, শক্করী, অতিশক্করী, জগতী, অতিজগতী ইত্যাদি বৈদিক ছন্দের বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। তার সঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বৈদিক মন্ত্রগুলির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এই অধ্যায়েই এরপর রয়েছে অনেক লৌকিক ছন্দের বিবরণ। লৌকিক ছন্দ মাত্রা (জাতি-পদ-বাক্য) ও বর্ণ (বৃত্ত-পদ-বাক্য) ভেদে দুই প্রকার। মাত্রাছন্দের উদাহরণ হল- আর্যা (দ্বিপদী), পথ্যা, বিপুলা, চপলা, মুখচপলা, জঘনচপলা, গীতি, উপগীতি ও আর্যাগীতি।

বৈতালীয় ছন্দগুলি চারটি পাদবিশিষ্ট। বৈতালীয়, ঔপচ্ছন্দসক, আপাতলিকা, প্রাচ্যবৃত্তিক, উদীচ্যবৃত্তিং, প্রবৃত্তিক, অপবান্তক, চারুহাসিনী, মাত্রাসমক, উপচিত্রা, বিশ্লোক, চিত্রা, বানবাসিকা, পাদাকুলক, শিখা, চুলিকা ইত্যাদি বৈতালীয় ছন্দের উদাহরণ সহ বিশদীকৃত হল।

**বর্ণিকছন্দাংসি (গণাক্ষরচ্ছন্দাংসি) :** এগুলি আবার সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত ভেদে ত্রিবিধ। এইসব ছন্দের বর্ণনাও এই অধ্যায়েই রয়েছে।

**পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় :**

এই অধ্যায়ে সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত ছন্দের সংখ্যা, সমানী, প্রমাণী, বিতান, অনুষ্টুপ বক্ত্র, পথ্যা, বিপরীতা পথ্যা, চপলা, বিপুলা, (সমবৃত্ত) পদচতুরুদ্ধ, আপীড়, প্রত্যাপীড় ইত্যাদি দ্বাদশ অর্ধসমবৃত্তের অবান্তরভেদগুলি পাওয়া যায়।

**ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় :**

এই অধ্যায়ে যতিলক্ষণ, যতিনিয়ম, উক্তা, অত্যুক্তা, মধ্যা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ছন্দগুলি যথাক্রমে একাক্ষর, দ্ব্যাক্ষর, ত্র্যক্ষর, চতুরক্ষর, পঞ্চাক্ষর পরিমিত হয়ে থাকে। তনুমধ্যা, কুমারললিতা, মানবকাক্রীড়িতক, ভুজগশিশুসৃজ, শুদ্ধবিরাট, ইন্দ্রবজ্রা, জগতী, বংশস্থ, উপজাতি, দোধক, শালিনী ইত্যাদি লৌকিক ছন্দের ভেদও পাওয়া যায়।

**সপ্তম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় :**

এই অধ্যায়ে অতিজগতী, শক্করী, অতিশক্করী, অষ্টি, অত্যষ্টি, ধৃতি ও অতিধৃতি- এই সাতটি অতিচ্ছন্দের একটি করে অক্ষরসংখ্যা বৃদ্ধি করে যথাক্রমে উদাহরণ সহযোগে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে অতিজগতীর মধ্যে প্রহর্ষিণী, রুচিতা, মত্তময়ুর,

গৌরী ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। শক্করীর মধ্যে অসম্বাধা, অপরাজিতা, প্রহরণকলিকা, বসন্ততিলক, সিংহোন্নতা ও উদ্ধর্ষিণী ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। অতিশক্করীর মধ্যে চন্দ্রবর্তা (মালা, মণিগুণনিকর), মালিনী ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। অষ্টির মধ্যে ঋষভগজবিলসিত, অত্যষ্টির মধ্যে হরিণী, পৃথ্বী, বংশপত্রপতিত, মন্দাক্রান্তা, শিখরিণী ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। ধৃতির মধ্যে কুসুমিতলতাবেল্লিতা, অতিধৃতির মধ্যে শার্দুলবিক্রীড়িত ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। এই অধ্যায়ে এইসব বিষয়ের আলোচনার পর কৃতি, প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি, সংকৃতি, অভিকৃতি ও উৎকৃতি শ্রেণীর সাতটি কৃতি ছন্দ যথাক্রমে একাক্ষর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কৃতির মধ্যে সুবদনা, বৃত্ত, প্রকৃতির মধ্যে স্রগ্ধরা, আকৃতির মধ্যে ভদ্রক, বিকৃতির মধ্যে অশ্বলালিত, মত্তাক্রীড়া, সংকৃতির মধ্যে তন্বী, অভিকৃতির মধ্যে কৌঞ্চপদা, উৎকৃতির মধ্যে ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত, অপবাহক ইত্যাদির আলোচনার পর দণ্ডকজাতি বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। যার প্রতিপাদে দুটি ‘ন’ গণ ও সাতটি ‘র’ গণ থাকে, তাকে দণ্ডক নামক বৃত্ত বলে। দণ্ডক সপ্তবিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট ছন্দ। দণ্ডক আবার দুই প্রকার – চন্দ্রবৃষ্টিপ্রপাত ও প্রচেতা। এখানে রেফোপলক্ষিত অক্ষর ত্রয়ের দ্বারা সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে।

**অষ্টম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তু :**

এই অধ্যায়ে গাথার ভেদ উদাহরণ সহযোগে উপস্থাপিত হয়েছে। শাস্ত্রে যে সমস্ত ছন্দের নাম উল্লিখিত হয়নি, কিন্তু তার প্রয়োগ দেখা যায় তাকে গাথা বলে জানা হয়। ত্রিষ্টুপ গাথার মধ্যে কুড্মলদন্তী, জগতী গাথার মধ্যে বরতনু, জলধরমালা, গৌরী, ললনা, অতিজগতী গাথার মধ্যে কনকপ্রভা, কুটিলগতি, শক্করী গাথার মধ্যে বরসুন্দরী, কুটিলা, অষ্টিগাথার মধ্যে শৈলশিখা, বরযুবতী, অত্যষ্টি গাথার মধ্যে অতিশয়িনী, অবিতথাঃ,

কোকিলক, ধৃতি গাথার মধ্যে বিবুধাপ্রিয়া, নারাচক, অতিধৃতি গাথার মধ্যে বিস্মিতা, কৃতি গাথার মধ্যে শশিবদনা ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। এরপর প্রস্তর ইত্যাদির প্রত্যয়, প্রকার ও প্রস্তার, মেরু প্রস্তার ইত্যাদির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

## ৩.৩.৭. পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য :

বেদে সম্ভাব্য প্রাচীনতম ছন্দঃশাস্ত্র হিসেবে পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্র*কেই ধরা হয়। ছন্দ বেদাঙ্গের প্রতিনিধি গ্রন্থ হল *ছন্দঃসূত্র*। উল্লেখ্য, উক্ত গ্রন্থটিকে বেদাঙ্গ হিসেবেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থটি সূত্রশৈলীতে রচিত হওয়ার কারণে এর অধ্যয়নে পাঠকবর্গের কোনওরূপ অসুবিধাই হয় না। এই গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম সূত্র পর্যন্ত বৈদিক ছন্দের লক্ষণ প্রদত্ত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টম সূত্র থেকে অষ্টম অধ্যায়ের সমস্ত সূত্রেই লৌকিক ছন্দের বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থে বৈদিক ছন্দের প্রয়োগ যেমন রয়েছে তেমনি লৌকিক ছন্দেরও প্রয়োগ রয়েছে। তবে পিঙ্গলাচার্যের গ্রন্থে লৌকিকছন্দই অধিক আলোচিত হয়েছে। তিনি ছন্দালোচনায় বীজগাণিতিক প্রতীক প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেছেন।

পিঙ্গল ছন্দঃশাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছন্দ নির্ধারিত হত শ্লোকপাদে অক্ষরসংখ্যার দ্বারা।

## ৩.৩.৮. ছন্দঃশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

### ৩.৩.৮.১. *বৃত্তোক্তিরত্ন* :

পিঙ্গলের *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থকে অনুসরণ করে জনৈক নারায়ণাচার্য রচনা করেছেন *বৃত্তোক্তিরত্ন*। এই গ্রন্থকে পণ্ডিতগণ পিঙ্গলের *ছন্দঃসূত্রে*রই অনুরূপ বলে থাকেন।

### ৩.৩.৮.২. *বৃত্তমৌক্তিক* :

*বৃত্তমৌক্তিক* গ্রন্থের নামান্তর হল *বৃত্তিমৌক্তিক*। এই গ্রন্থটিও আচার্য পিঙ্গলের গ্রন্থ অবলম্বনেই রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা হলেন চন্দ্রশেখর। অনেকে *বৃত্তমৌক্তিক*কে পিঙ্গলের *ছন্দঃসূত্রে*র বার্তিক বলে থাকেন।

### ৩.৩.৮.৩. *নাট্যশাস্ত্র* :

ভরত রচিত *নাট্যশাস্ত্রে*র চতুর্দশ থেকে ষোড়শ এবং দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে ছন্দ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে আচার্য ভরত বলেছেন, 'ইতি ভারতীযে নাট্যশাস্ত্রে ছন্দোবিচিতির্নামা ষোড়শোঽধ্যায়ঃ'।[১৬০] এই অধ্যায়টির নাম ছন্দোবিচিতি। এই শব্দটি ছন্দঃশাস্ত্রেরই দ্যোতক। এই অধ্যায়ে মুদ্রা দ্বারা ছন্দোগুলির নামের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে প্রাকৃতভাষায় উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাচিকাভিনয় সহ ছন্দের বিভাগ দেখানো হয়েছে।[১৬১] ষোড়শ এবং দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ের ছন্দ বর্ণনায় পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন সাধারণ কাব্যে এবং নাটকে এই ছন্দোগুলির ব্যবহার হবে। তবে দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত ছন্দোগুলি গানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ভরতের মতানুসারে, বৃত্ত বলতে পাঠ্য কিন্তু গীত বলতে গেয়কেই বোঝাবে।

### ৩.৩.৮.৪. *অগ্নিপুরাণ* :

সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের ইতিহাসে *অগ্নিপুরাণে*র যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই গ্রন্থের ৩২৮ অধ্যায় থেকে ৩৩৫ অধ্যায় পর্যন্ত মোট ৮টি অধ্যায়ে লৌকিকছন্দের আলোচনা

---

[১৬০] নাট্য., ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্তি অংশ।

[১৬১] তদেব., ১৫.৩৩-১১৯

রয়েছে। তবে *অগ্নিপুরাণের* ছন্দ সম্পর্কিত আলোচনাতেও পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্রের* প্রভাব লক্ষিত হয়।

### ৩.৩.৮.৫. *জয়দেবচ্ছন্দ* :

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতকের বিখ্যাত ছন্দঃশাস্ত্রকার জয়দেবের লেখা *জযদেবচ্ছন্দ* গ্রন্থটি ছন্দঃশাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। জয়দেব ছন্দ বিষয়ে পিঙ্গলাচার্যের প্রণালী অনুসরণ করলেও পিঙ্গলের অনুল্লিখিত প্রত্যয়ধ্বনাদি ছটি প্রত্যয়ের কথা বলেছেন। *জয়দেবচ্ছন্দ* গ্রন্থের প্রথম তিন অধ্যায়ে বৈদিক ছন্দ, তারপরে মাত্রাবৃত্ত, বিষমবৃত্ত ও অর্ধসমবৃত্তগুলি এবং তারপরে সমবৃত্তসমূহ, পরিশেষে ছয়টি প্রত্যয়ের লক্ষণ ও বিচারাদি উপস্থাপিত হয়েছে।

### ৩.৩.৮.৬. *ছন্দোবিচিতি* :

আনুমানিক ৫৮০-৬১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত জনাশ্রয়ের *ছন্দোবিচিতি* গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে রচিত। এই গ্রন্থে বিষম, সম, অর্ধসম, বৃত্ত, জাতি, বৈতালীয় আর্যা ও প্রস্তারের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। লেখক তাঁর গ্রন্থমধ্যে প্রাচীন ছন্দোশাস্ত্রগণের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতির প্রয়োগ করেছেন। ষষ্ঠ শতকের পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ ছন্দঃশাস্ত্রকারদের উল্লেখ জনাশ্রয়ের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পিঙ্গল তাঁর *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থে যতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ায় জনাশ্রয় তাঁর সমালোচনা করেছেন। জনাশ্রয়ের ছন্দোগুলি ১৮টি সাংকেতিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সূত্রসমূহের প্রতীক তাদের শেষ অক্ষরগুলি। এর মধ্যে ১১টি সূত্র শব্দের আদিতে বিদ্যমান স্বরের সাহায্যেই উপস্থাপিত হয়েছে।

### ৩.৩.৮.৭. *শ্রুতবোধ* :

সুদীর্ঘকাল থেকে মহাকবি কালিদাসের রচনা হিসাবে চলে আসছে *শ্রুতবোধের* নাম। এই গ্রন্থখানি ছন্দঃশাস্ত্রবিষয়ক হলেও এর মধ্যে কবিত্বের দ্যোতনা আছে। এ কারণে কবি কালিদাসের নামাঙ্কিত হতে কোনও বাধার সন্মুখীন হয়নি। গ্রন্থটির নামকরণের ব্যাপারেও কোনও অস্পষ্টতা নেই। গ্রন্থের শুরুতেই কবি লিখেছেন –

"ছন্দসাং লক্ষণং যেন শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে।

তমহং সংপ্রবক্ষামি শ্রুতবোধমবিস্তরম্।।"[১৬২]

### ৩.৩.৮.৮. *বৃত্তরত্নাবলী* :

কালিদাসের নামে প্রচলিত অন্য একখানি ছন্দোগ্রন্থের নাম *বৃত্তরত্নাবলী*। কারও মতে, এই গ্রন্থটি অষ্টাদশ শতকের ছন্দশাস্ত্রকার রামচন্দ্র চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য কর্তৃক বিরচিত। আসলে এই গ্রন্থের শেষে 'ইতি শ্রীকালিদাস বিরচিতে বৃত্তরত্নাবলী সম্পূর্ণা' পঙ্ক্তিটি উল্লিখিত হওয়ায় এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

### ৩.৩.৮.৯. *ছন্দোবিচিতি* :

এই ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থখানির রচয়িতা হিসাবে দণ্ডীর নাম প্রচারিত হলেও কীথ মহোদয় তা স্বীকার করেননি। তাঁর বিবেচনায় এই গ্রন্থখানির প্রণেতা হলেন ভামহ। কারও কারও মতে *ছন্দোবিচিতি* কোনও গ্রন্থবিশেষকে নির্দেশ করে না, এটি সাধারণভাবে ছন্দঃশাস্ত্রের নির্দেশক। যেমন *নাট্যশাস্ত্রে* দৃষ্ট হয় 'ইতি ভারতীয়ে নাট্যশাস্ত্রে

---

[১৬২] শ্রুত., শ্লোক-১

ছন্দোবিচিতির্নাম ষোড়শ২ধ্যায়'।[১৬৩] *ছন্দোবিচিতি* নামক গ্রন্থের লেখক হিসাবে মিত্রধরের নামও জানা যায়। তবে ডঃ জেকোবি এবং পিটারসনের মতে, দণ্ডীর তৃতীয় প্রবন্ধ গ্রন্থটি হল *ছন্দোবিচিতি*।

### ৩.৩.৮.১০. *সুবৃত্ততিলক* :

কেউ কেউ এই গ্রন্থটিকে *সুবৃত্তিতিলক*ও বলেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, প্রসিদ্ধ লেখকগণের প্রত্যেকেই বিশেষ কোনও না কোনও ছন্দের অনুরাগী হয়ে থাকেন। যেমন পাণিনির প্রিয় ছন্দ হল উপজাতি, কালিদাসের মন্দাক্রান্তা, ভারবির বংশস্থবিল, ভবভূতির শিখরিণী প্রভৃতি। *সুবৃত্ততিলক* গ্রন্থের লেখক আচার্য ক্ষেমেন্দ্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই লৌকিক ছন্দের আলোচনা করেছেন।

### ৩.৩.৮.১১. *বৃত্তরত্নাকর* :

বিখ্যাত ছন্দঃশাস্ত্রকার কেদারভট্ট *বৃত্তরত্নাকর* নামক ছন্দঃশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থটি রচনা করেছেন। কেদারভট্টের *বৃত্তরত্নাকরে* ১৩৬টি ছন্দের আলোচনা পাওয়া যায়। গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এই গ্রন্থের টীকা রচনা করেছেন- নারায়ণ, শ্রীনাথ, জনার্দন, দিবাকর, রামচন্দ্রকবিভারতী, পণ্ডিত চিন্তামণি, গোবিন্দভট্ট, তারানাথ, ভাস্কররায়, কুলহণ, কৃষ্ণবর্মা প্রমুখ।

### ৩.৩.৮.১২. *বৃত্তমালা* :

গৌড়দেশীয় পণ্ডিত রামচন্দ্র কবিভারতী দেশত্যাগ করে সিংহলে বসবাস করেন। তৎকালীন সিংহলাধিপতি দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু তাঁকে গুরুপদে বরণ করে

---

[১৬৩] নাট্য., ষোড়শ অধ্যায়ের সমাপ্তি অংশ।

বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। রামচন্দ্র বহু শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ছন্দঃশাস্ত্র বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থখানির নাম *বৃত্তমালা*। কেদারভট্টের প্রসিদ্ধ ছন্দোগ্রন্থ *বৃত্তরত্নাকরের* উপর বিখ্যাত টীকা গ্রন্থখানির নাম *বৃত্তরত্নাকরপঞ্জিকা*। এই টীকাগ্রন্থটির রচনাকাল ১২৪৫ খ্রিঃ। *বৃত্তমালা* বঙ্গদেশের নৈহাটীর কাঞ্চনপল্লীর (বর্তমান কাঁচরাপাড়া) কবি পরমানন্দ সেনের রচনা, যিনি কবিকর্ণপুর নামেই সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত *বৃত্তমালা* গ্রন্থের পুঁথি কোলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত রয়েছে।

**৩.৩.৮.১৩. *ছন্দঃসারসংগ্রহ* :**

এই গ্রন্থটির রচয়িতার নাম চন্দ্রমোহন ঘোষ। ইনি বঙ্গদেশ নিবাসী ছিলেন।

**৩.৩.৮.১৪. *পদ্যমুক্তাবলী* :**

বঙ্গদেশ নিবাসী গৌরীচরণ চৌধুরীর পুত্র কাশীনাথ বিরচিত *পদ্যমুক্তাবলী* নামক ছন্দোগ্রন্থখানি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। এই গ্রন্থটি ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছে।

**৩.৩.৮.১৫. *ছন্দোমঞ্জরী* :**

এই গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক গঙ্গাদাস প্রদত্ত আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানতে পারা যায় যে, তিনি ছিলেন বৈদ্যগোপাল দাস ও সন্তোষার পুত্র। তিনি সম্ভবতঃ মুরারির পরবর্তীকালের কোনও এক সময়ের কবি। কারণ, তাঁর *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে মুরারির *অনর্ঘরাঘবের* উদ্ধৃতি রয়েছে।

গঙ্গাদাস *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁর রচিত গ্রন্থটি বিবিধ ছন্দোগ্রন্থের সারসংকলন। সমবৃত্ত, অর্ধসমবৃত্ত, বিষমবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত– এই কয়েকটি বিষয় ছাড়াও গদ্যপ্রকরণ নামক একটি অংশের সন্নিবেশও এই গ্রন্থে রয়েছে। এই গ্রন্থের

একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এর অধিকাংশ উদাহরণ শ্লোকই গ্রন্থকারের মৌলিক রচনা এবং শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বৃন্দাবন লীলাবিষয়ক। *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। এই গ্রন্থে মোট ২৮০টি ছন্দ উল্লিখিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

### ৩.৩.৮.১৬. *প্রস্তারচিন্তামণি* :

জ্যোতিষশাস্ত্রকার চিন্তামণি ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে *প্রস্তারচিন্তামণি* নামে একটি ছন্দোগ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত।

তাঁর রচিত সংস্কৃত ছন্দোশাস্ত্র বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল- *বৃত্তদর্পণ, বৃত্তকল্পদ্রুম, বৃত্তকৌতুক, বৃত্তকৌমুদী, ছন্দঃসমুদ্র, সমবৃত্তসার, ছন্দোঽনুশাসন* ইত্যাদি।

## ৩.৩.৯. ছন্দঃসূত্রকার পিঙ্গলাচার্য :

ছন্দঃশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতা হিসাবে পিঙ্গলাচার্যেরই নাম পাওয়া যায়। তিনি পিঙ্গলনাগ, পিঙ্গলমুনি নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। জনশ্রুতি অনুয়ায়ী পতঞ্জলিরই নামান্তর ছিল পিঙ্গলাচার্য। প্রাকৃতভাষার ছন্দোগ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের থেকে পিঙ্গলনাগ নামটি গৃহীত হয়েছে। যথা–

"জো বিবিহমত্তসাঅরপারং পত্তো বিবিহমই হেলং।

প্রঢমং ভাসতরণ্ডো নাম্নো সো পিঙ্গলো জঅঈ।।"[১৬৪]

প্রাকৃতভাষাকে আশ্রয় করে পিঙ্গলনাগ রচিত *প্রাকৃতপৈঙ্গল* গ্রন্থে বিবিধমাত্রাবিন্যাসযুক্ত ছন্দঃসাগরে প্রথমে পিঙ্গলের জয়গান সূচিত হয়েছে। প্রথম শব্দের

---

[১৬৪] প্রা. পৈ., প্রথম পরিচ্ছেদ, মঙ্গলচরণ শ্লোক- ১

উপাদান থেকে ছন্দঃশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতা পিঙ্গলনাগই ছিলেন। একদা পিঙ্গলনাগকে দেখে ভক্ষণ করতে উদ্যত গরুড়কে পিঙ্গলনাগ বললেন- ওহে গরুড়, আমার ছন্দোবিদ্যার কৌশল দেখ, আমার দ্বারা একবার লেখা হয়ে গেলে যদি পুনর্বার লেখা আরম্ভ হয়, তাহলে তুমি আমাকে ভক্ষতে করতে পারো। পিঙ্গলনাগের এইরূপ আলোচনা চলাকালীনই লঘু ও গুরু রেখার বিশ্বাস প্রদর্শনের ছলনায় ভূতলপ্রদেশ ক্রমশঃ সমুদ্রে পরিণত হতে শুরু করেছিল।

এই পিঙ্গলনাগের দ্বারাই বৈদিক ও লৌকিক ছন্দের যে সমস্ত সূত্রগুলি করা হয়েছে তাদের অর্থবোধের জন্য বহু বিদ্বদ্জনেরা নানা টীকা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হল *বৃত্তোক্তিরত্ন* নামের টীকা, যার রচয়িতা নারায়ণভট্ট। দ্বিতীয় টীকা গ্রন্থ হল *পিঙ্গলপ্রকাশ,* যার রচয়িতা হলেন শ্রীবিশ্বরথ। কিন্তু এগুলির কোনওটিই আজ উপলব্ধ হয় না, শুধুমাত্র টীকা ও টীকাকারের নামই জানা যায়। ছন্দোশাস্ত্রের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ টীকা গ্রন্থ হল *মৃতসঞ্জীবনী,* যার রচয়িতা হলেন আচার্য হলায়ুধভট্ট।

*মহাভারতের* জৈমিনীয় সর্পসত্রে দগ্ধনাগের মধ্যে পিঙ্গল নামের একজনকে দেখা যায়। *মহাভারতের* আদিপর্বে বলা হয়েছে – 'নিষ্ঠানকো হেমগুহো নহুষঃ পিঙ্গলস্তথা।'[১৬৫] তবে ইনি ছন্দঃশাস্ত্র প্রণেতা পিঙ্গলাচার্য হতে পারেন না, কারণ, তিনি মুনি নন। কিন্তু *মৎস্যপুরাণে* অঙ্গিরস বলেছেন, 'বোধির্নগঃ সৌগমাক্ষিক্ষীরয়োরিকিরেব চ'।[১৬৬] এই শ্রুতি অনুসারে নগের পুত্র ছিলেন পিঙ্গল, সেইরূপ 'জ্ঞাত্বাযনো হরির্বাশ্যঃ পৈঙ্গলশ্চ তথৈব

[১৬৫] মহাভা., আদি, ৩৫.৯

[১৬৬] মৎস্য., ১৯৬.৬

চ।'[১৬৭] এই শ্রুতি অনুসারে পৈঙ্গলের পিতা ছিলেন এই পিঙ্গলনাগ। এর দ্বারা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিই পিঙ্গল নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। পরন্তু *মহাভাষ্যের* নবাহ্নিকে 'পৈঙ্গলকাণ্ব' শব্দটি দেখা যায়।[১৬৮] এই *মহাভাষ্য* গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে, প্রাচীন *ঋগ্বেদসর্বানুক্রমণীতে* ছন্দঃশাস্ত্রীয় অনুবাদের প্রভাব থাকার কারণে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির থেকে পিঙ্গলের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হয়।

*বামনপুরাণে* বর্ণিত হয়েছে যে, 'সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দনঃ সনাতনোঽপ্যাসুরিপিঙ্গলৌ চ।'[১৬৯] আসুরি সাহচর্যবশতঃ এই নাম সংকীর্তন প্রায়শই তাঁর সম্পর্কে দেখা যায়। *স্কন্দপুরাণের* কাশীখণ্ডেও বলা হয়েছে যে,

"গণেন পিঙ্গলাখ্যেন পিঙ্গলেশাখ্যসংজ্ঞিতম্।

লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতং শম্ভোঃ কপর্দীশাদুদগ্দিশি।।"[১৭০]

এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানেও পিঙ্গলের নাম জানা যায়। *সর্বানুক্রমণীর* টীকা *ষড়্গুরুশিষ্যে* বলা হয়েছে যে, আচার্য পিঙ্গল ছিলেন পাণিনির অনুজ। কিন্তু এই বিষয়ে কোনওরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং তিনি ছিলেন পাণিনির পূর্বাচার্য। কিন্তু সম্প্রতি 'যথা মকারেণাপিঙ্গলস্য সর্বগুরুস্ত্রিকঃ প্রতীয়তে'[১৭১] এইরূপ বচন দর্শন হেতু শবরস্বামী তাঁকে পাণিনির পূর্ববর্তী বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

---

[১৬৭] তদেব., ১৯৬.৩২

[১৬৮] মহা., আহ্নিক, ৯. সূত্র, ৭৩

[১৬৯] বামন., ১৪.২৫

[১৭০] স্কন্দ., কাশীখণ্ড, ৫৫.২

[১৭১] শ. ভা., ১.১.৫

## ৩.৩.১০. আচার্য পিঙ্গলের নিবাসস্থল :

পিঙ্গলাচার্যের নিবাসস্থল ছিল পশ্চিমদিকের সমুদ্র তীরবর্তী প্রদেশ। তাঁর দেশে প্রচলিত স্ত্রীজাতীয় অপরান্তিকা[১৭২] ও বানবাসিকা[১৭৩] রূঢ়শব্দগুলি ছন্দঃশাস্ত্রে বৃত্তনামে প্রযুক্ত হয়েছে। অপরান্তিকা বিষয়ে বলা হয়েছে, 'পশ্চিমসমুদ্রসমীপঽপরান্তদেশঃ, তত্র ভবাঃ'।[১৭৪] বানবাসিকা বিষয়ে বলা হয়েছে, 'কোঙ্কণবিষয়াৎ পূর্বেণ বনবাসবিষয়ঃ, তত্র ভবাঃ'। [১৭৫] এইরূপ বাৎস্যায়নসূত্রব্যাখ্যা *জয়মঙ্গলা*তেও দেখা যায়। প্রাচ্যবৃত্তিঃ, উদীচ্যবৃত্তিঃ এইরূপ সংজ্ঞাও অনুকূল অর্থজ্ঞাপক।[১৭৬] মহাসমুদ্রের তীরবর্তী বাসস্থান হওয়ায় *পঞ্চতন্ত্রে* বলা হয়েছে, 'ছন্দোজ্ঞাননিধিং জঘান মকরো বেলাতটে পিঙ্গলম্'।[১৭৭] সুতরাং দক্ষিণকোঙ্কণপ্রদেশকেই আচার্য পিঙ্গলের নিবাসস্থান বলা যেতে পারে।

## ৩.৩.১১. পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্রে*র ব্যাখ্যাগ্রন্থ :

*ছন্দঃসূত্র* পিঙ্গলাচার্য দ্বারা রচিত ছন্দঃশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি সূত্রশৈলীতে রচিত। তবে বলাই বাহুল্য যে, এই গ্রন্থটি ভাষ্য ছাড়া পাঠ করা অত্যন্ত কঠিন। এই গ্রন্থের অনেক টীকা ও ভাষ্যগ্রন্থ রয়েছে। আচার্য হলায়ুধভট্ট এই গ্রন্থের উপর *মৃতসঞ্জীবনী* নামে একটি বৃত্তি রচনা করেছেন।

---

[১৭২] পি. ছ. সূ, ৪.৪১

[১৭৩] তদেব., ৪.৪৩

[১৭৪] বাৎস্যায়নসূত্রব্যাখ্যা জয়মঙ্গলা, ২.৫.২৬

[১৭৫] তদেব., ২.৫.৩২

[১৭৬] পি. ছ. সূ, ৪.৩৭; ৪.৩৮

[১৭৭] পঞ্চ., ২.২৬

এই গ্রন্থের উপর রচিত অন্যান্য ভাষ্য গ্রন্থগুলি হল- চিত্রসেনের *পিঙ্গলটীকা*, রবিকরের *পিঙ্গলসারবিকাসিনী*, রাজেন্দ্রদশাবধানের *পিঙ্গলতত্ত্বপ্রকাশিকা*, লক্ষ্মীনাথসুতচন্দ্রশেখরের *পিঙ্গলভাবোদ্যত*, বংশীধরের *পিঙ্গলপ্রকাশ* এবং বামনাচার্যেরও *পিঙ্গলপ্রকাশ* ইত্যাদি। এছাড়াও শ্রীহর্ষশর্মা, বাণীনাথ, যাদবপ্রকাশ, দামোদর প্রমুখ শাস্ত্রকারেরাও ছন্দঃশাস্ত্রের ওপর টীকা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

## ৩.৩.১২. বৃত্তিকার হলায়ুধ :

ভট্টনারায়ণের বংশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু আচার্য হলায়ুধভট্ট। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রীধনঞ্জয়ভট্ট। ভট্টনারায়ণের বংশের দ্বাদশ পুরুষ ছিলেন আচার্য হলায়ুধভট্ট। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গণনা অনুসারে লক্ষ্মণসেন খ্রিস্টাব্দে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব আচার্য হলায়ুধভট্টও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালীন পণ্ডিত ছিলেন। আচার্য হলায়ুধভট্ট বিবিধ বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের* ওপর *মৃতসঞ্জীবনী* নামক একটি বৃত্তি রচনা করেছেন।

## ৩.৩.১৩. *পিঙ্গলছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের *হলায়ুধবৃত্তির* বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন :

আচার্য হলায়ুধভট্ট পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্রের* ওপর একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন। আচার্য পিঙ্গলের রচিত *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থটি সূত্রাকারে রচিত। এই গ্রন্থটি ছন্দঃশাস্ত্র বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ছাড়া ছন্দঃশাস্ত্রের আর কোনও প্রাচীন গ্রন্থের নাম জানা যায় না। তবে পরবর্তীকালে ছন্দঃশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে যেগুলিতে পিঙ্গলের *ছন্দঃসূত্রের* স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আর হলায়ুধভট্ট তাঁর ভাষ্য গ্রন্থের নাম করেছেন *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*। পিঙ্গলের *ছন্দঃসূত্রের* ওপর আচার্য হলায়ুধের বৃত্তির গুরুত্ব পরবর্তী আচার্য ও শিষ্যগণের নিকট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদি আচার্য হলায়ুধভট্ট মৃতসঞ্জীবনী বৃত্তিটি রচনা না করতেন তাহলে *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের* অধ্যয়ন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ত।

আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর বৃত্তি রচনার প্রারম্ভে নমস্কারাত্মক মঙ্গলাচরণের দ্বারা ভগবান শিবের স্তুতি করেছেন। গ্রন্থ নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্যই এই মঙ্গলাচরণ করা হয়ে থাকে, যা সংস্কৃত শাস্ত্রের মঙ্গলসূচক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। আচার্য পিঙ্গল রচিত ছন্দঃশাস্ত্রের ওপরই হলায়ুধভট্ট তাঁর বৃত্তি রচনার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। বৃত্তির প্রারম্ভে তিনি বলেছেন, ছন্দঃশাস্ত্র হল বেদের প্রথম অঙ্গ, যা কিনা কবিদের নয়নস্বরূপ। যেমনভাবে সমুদ্র মন্থনে উত্থিত অমৃত দেবতা ও দানবদের দ্বারা ভাগাভাগি হয়েছিল ঠিক তেমনি ছন্দরূপ সাগরে পিঙ্গলাচার্য রচিত *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থটি অমৃতস্বরূপ।[১৭৮]

আচার্য হলায়ুধভট্ট ১০টি গণের কথা বলেছেন। যথা – ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, ল ও গ। শুধু তাই নয়, তিনি গুরু, লঘু বিচারও গ্রন্থারম্ভেই করেছেন। 'ম' গণের তিনটি অক্ষরেই গুরু, 'য' গণের আদি লঘু, অন্ত ও মধ্য গুরু। 'র' গণের আদি ও অন্ত গুরু, মধ্য লঘু। 'স' গণের আদি ও মধ্য লঘু এবং অন্ত গুরু। 'ত' গণের আদি ও মধ্য গুরু এবং অন্ত লঘু। 'জ' গণের আদি ও অন্ত লঘু এবং মধ্য গুরু। 'ভ' গণের আদি গুরু এবং মধ্য ও অন্ত লঘু। 'ন' গণের তিনটি অক্ষরই লঘু। এভাবে তিনটি অক্ষর বিশিষ্ট আটটি গণ রয়েছে। যথা- ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন। একাক্ষর বিশিষ্টও দুটি গণ দেখা যায়। যথা – 'ল' গণ ও 'গ' গণ।

---

[১৭৮] ক্ষীরাব্ধেরমৃতং যদ্বদুদ্ধৃতং দেবদানবৈঃ। ছন্দোঽব্ধেঃ পিঙ্গলাচার্য্যশ্ছন্দোঽমৃতং তথোদ্ধৃতম্।। পি. ছ. সূ, প্রথম অধ্যায়. মঙ্গলাচরণ শ্লোক-৩

এই দশটি অক্ষরই যাবতীয় ছন্দ শিক্ষার মূল। এই দশটি অক্ষর দ্বারাই সমস্ত ছন্দ বিষয়ক সংকেত সুব্যক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক ছন্দঃশাস্ত্র প্রণেতা সংকেত দ্বারাই ছন্দের লক্ষণ করে থাকেন। আচার্য পিঙ্গল রচিত *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থেও তার অন্যথা ঘটেনি। তিনটি অক্ষরের সমূহকে বলা হয় গণ, যার দ্বারা ছন্দ নির্ধারিত হয়ে থাকে। পিঙ্গলাচার্য সহজ উপায়ে ছন্দঃশাস্ত্রের বোধের জন্য সূত্রাকারে সংজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন।

*ছন্দঃসূত্রের* প্রথম অধ্যায়ে পিঙ্গলাচার্য ছন্দের সাধারণ সংজ্ঞা বিষয়ে যে সূত্রগুলির উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল – ১. ধীশ্রীস্ত্রী ম্ ২. বরা সা য্ ৩. কা গুহা র্ ৪. বসুধা স্ ৫. সাতেক্ব ত্ ৬. কদা স জ্ ৭. কিং বদ ভ্ ৮. ন হস ন্ ৯. গৃ ল্ ১০. গন্তে ১১. ধ্রাদিপরঃ ১২. হে ১৩. লৌ সঃ ১৪. গ্লৌ ১৫. অষ্টৌ বসব ইতি। এই সূত্রগুলিই যাবতীয় ছন্দ শিক্ষার মূল।

এই সূত্রগুলির মূল অর্থ বৃত্তির মাধ্যমে জানতে পারা যায়। 'ধীশ্রীস্ত্রী ম্'[১৭৯] পিঙ্গলকৃত এই সূত্রটির বৃত্তিতে আচার্য হলায়ুধভট্ট বলেছেন, ম সংজ্ঞা বোঝাবার জন্য তিনটি গুরু বর্ণকে বুঝতে হবে। সূত্রকার আচার্য পিঙ্গল সেই কারণেই ম সংজ্ঞার সূত্র করেছেন তিনটি গুরু বর্ণ ধী (ঈ), শ্রী (ঈ), স্ত্রী (ঈ) দিয়ে। এছাড়াও আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর বৃত্তিতে 'ম' সংজ্ঞা বোঝানোর জন্য গুরুত্রয়ং পদের প্রয়োগ করেছেন। গুরু বর্ণের চিহ্ন হল (s) এবং লঘু বর্ণের চিহ্ন হল (I)।

আচার্য হলায়ুধভট্ট প্রতিটি গণসম্বলিত সংজ্ঞার বৃত্তি রচনাকালে প্রয়োজনস্থল বিষয়েও আলোকপাত করেছেন, যা অন্যান্য টীকাকারগণ তাঁদের টীকা বা বৃত্তি বা ভাষ্য বা ব্যাখ্যা গ্রন্থে আলোচনা করেণনি। 'ম' নামক গণ সংজ্ঞার প্রয়োজনস্থল বিষয়ে

---

[১৭৯] পি. ছ. সূ, ১.১

'বিদ্যুন্মালা' ছন্দকে নির্দেশ করা হয়েছে। অন্যান্য টীকাকারগণ বা ছন্দঃশাস্ত্র প্রণেতাগণ তাঁদের ছন্দ বিষয়ক আলোচনায় সূত্র না বলে লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। এরপর আচার্য পিঙ্গলের 'য' নামক গণ সংজ্ঞার সূত্র বিষয়ে হলায়ুধভট্ট তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন, 'বরা সা য্'[১৮০] অর্থাৎ লঘু, গুরু এবং গুরু– এই ক্রমানুসারে যে গণ সংজ্ঞা হয় তার নাম হল য। এই সংজ্ঞার প্রয়োজনস্থল বিষয়ে আচার্য হলায়ুধভট্ট বলেছেন, 'ভুজঙ্গপ্রয়াতং যঃ' অর্থাৎ য নামক গণ সংজ্ঞার নামকরণ করেছেন ভুজঙ্গপ্রয়াত। 'কা গুহা র্'[১৮১] অর্থাৎ গুরু, লঘু, গুরু– এই ক্রমানুসারে যে তিনটি অক্ষরের সমূহ থাকে তার র-নামক গণ সংজ্ঞা হয়। এর প্রয়োজনস্থল হল 'স্রগ্বিণী রঃ'। 'বসুধা স্'[১৮২] সূত্রে লঘু, লঘু ও গুরু ক্রমে 'য' গণ হয়েছে। তার প্রয়োজনস্থল হল ত্রোটক। 'সা তে ক্ক ত্'[১৮৩] অর্থাৎ গুরু, গুরু, লঘু– এই ক্রমানুসারে 'ত' গণ হয়েছে। এর প্রয়োজনস্থল হল তনুমধ্যা। 'কদা স জ্'[১৮৪] অর্থাৎ লঘু, গুরু, লঘ– এই ক্রমানুসারে 'জ' গণ হয়েছে। এর প্রয়োজনস্থল হল 'কুমারললিতা জসৌ গ'। 'কিং বদ ভ্'[১৮৫] অর্থাৎ গুরু, লঘু, লঘু– এই ক্রমানুসারে 'ভ' গণ হয়েছে। এর প্রয়োজনস্থল হল 'চিত্রপদা শৌ গৌ'। 'ন হস ন্'[১৮৬] অর্থাৎ লঘু, লঘু, লঘু– এই ক্রমানুসারে 'ন' গণ হয়েছে। এর প্রয়োজনস্থল হল 'দণ্ডকো গৌ রঃ'। 'গৃ ল্'[১৮৭] সূত্রের বৃত্তিতে ল-শব্দের লঘুবাচক অর্থ করা হয়েছে। এই ল-সংজ্ঞার

---

[১৮০] পি. ছ. সূ., ১.২

[১৮১] তদেব., ১.৩

[১৮২] তদেব., ১.৪

[১৮৩] তদেব., ১.৫

[১৮৪] তদেব., ১.৬

[১৮৫] তদেব., ১.৭

[১৮৬] তদেব., ১.৮

[১৮৭] তদেব., ১.৯

প্রয়োজনস্থল হল 'লঃ সমুদ্রা গণঃ'। 'গন্তে'[১৮৮] নামক সূত্র দ্বারা পদের অন্তে অবস্থিত লঘু বর্ণের গুরু সংজ্ঞা অতিদিষ্ট হয়েছে। এই সংজ্ঞার প্রয়োজন স্থল হল 'গাবন্ত আপীড়ঃ'। 'ধ্রাদিপরঃ' [১৮৯] অর্থাৎ সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ববর্ণ, অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় বর্ণের পূর্ব লঘু বর্ণের গুরু সংজ্ঞা অতিদিষ্ট হয়েছে। 'হে'[১৯০] সূত্রে দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘ বর্ণের গ অর্থাৎ গুরু সংজ্ঞা হয়। 'লৌ সঃ'[১৯১] এই সূত্রে দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট গুরুকে দুটি লঘুরূপে গণনা করা হয়েছে। 'গ্লৌঃ'[১৯২] সূত্রে বিশেষ বিধি পরিত্যাগ করে গ্রন্থসমাপ্তি পর্যন্ত গ্লৌ এই বর্ণটি অধিকৃত হয়েছে। 'আসুরী পঞ্চদশ'[১৯৩] সূত্রে বৃত্তিকার হলায়ুধভট্ট বলেছেন, 'তানি চ অক্ষরাণি গ্লৌ ইত্যধিকারবশাৎ গুরুণি লঘুনি চ'।[১৯৪] লোকপ্রসিদ্ধ শব্দ গ্রহণের উপলক্ষণ 'অষ্টৌ বসব ইতি'[১৯৫] সূত্রটি দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন- বসু শব্দ দ্বারা লঘু, গুরু ৮টি বর্ণকে বোঝাচ্ছে। তদ্রুপ, সমুদ্র শব্দ দ্বারা ৪, ইন্দ্রিয় দ্বারা ৫ ইত্যাদি সংখ্যাকে বোঝানো হয়েছে।

যে যে অর্থে যে যে শব্দ লোকপ্রসিদ্ধ রয়েছে, এই ছন্দঃশাস্ত্রেও সেই সেই অর্থে সেই সেই শব্দের প্রয়োজন রয়েছে। এই লোকপ্রসিদ্ধ শব্দগুলি ছন্দের যতি নির্মাণে সহায়ক হয়ে থাকে। আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে একথাই উল্লেখ করেছেন।

---

[১৮৮] পি. ছ. সূ., ১.১০

[১৮৯] তদেব., ১.১১

[১৯০] তদেব., ১.১২

[১৯১] তদেব., ১.১৩

[১৯২] তদেব., ১.১৪

[১৯৩] তদেব., ২.৪

[১৯৪] তদেব., হলায়ুধবৃত্তি, ২.৪

[১৯৫] তদেব., ১.১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্র হল 'ছন্দঃ'[১৯৬]। শাস্ত্রপরিসমাপ্তি পর্যন্ত অধিকার সূত্ররূপে 'ছন্দঃ' সূত্রটির প্রয়োগ হবে। এখানে ছন্দ শব্দের দ্বারা অক্ষরসংখ্যাকে বোঝানো হয়ে থাকে। দ্বিতীয় সূত্রটি হল 'গাযত্রী'[১৯৭]। এই গায়ত্রী সূত্রটির অধিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ সূত্র পর্যন্ত থাকবে। আচার্য হলায়ুধভট্ট বলেছেন, 'তান্যুষ্ণিক্' সূত্রের পূর্ব পর্যন্ত ছন্দের গায়ত্রী সংজ্ঞা হয়ে থাকে। তৃতীয় সূত্রটি হল 'দৈব্যেকম্'[১৯৮]। একাক্ষর ছন্দকে দৈবী গায়ত্রী বলে। গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী– এই সাতপ্রকার ছন্দের প্রত্যেকটাই আর্ষী, দৈবী, আসুরী, প্রাজাপত্য, যাজুষী, সাম্নী, আর্চী, ব্রাহ্মী ভেদে আট প্রকার হয়ে থাকে। আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর বৃত্তিতে একটি মণ্ডলের সাহায্যে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের প্রকারভেদ স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'আসুরী পঞ্চদশ'[১৯৯] সূত্রে পঞ্চদশাক্ষরবিশিষ্ট গায়ত্রী ছন্দের কথা বলা হয়েছে। তখন সেই মণ্ডলের তৃতীয় পঙ্ক্তির প্রথম ঘরে আসুরী নামটি লিখে দ্বিতীয় ঘরে ১৫ সংখ্যাটি বসাতে হবে। 'প্রাজাপত্যাঽষ্টৌ'[২০০] সূত্রে অষ্টাক্ষরবিশিষ্ট প্রাজাপত্যা গায়ত্রী ছন্দের কথা বলা হয়েছে। তখন সেই মণ্ডলের চতুর্থ পঙ্ক্তির প্রথম ঘরে প্রাজাপত্যা নামটি লিখে দ্বিতীয় ঘরে ৮ সংখ্যাটি বসাতে হবে। এরপর 'যজুষাং ষট্'[২০১] সূত্রে ষড়ক্ষরবিশিষ্ট যাজুষী গায়ত্রী ছন্দের কথা বলা হয়েছে। তখন মণ্ডলটির পঞ্চম পঙ্ক্তির প্রথম ঘরে যাজুষী

---

[১৯৬] পি. ছ. সূ., ২.১

[১৯৭] তদেব., ২.২

[১৯৮] তদেব., ২.৩

[১৯৯] তদেব., ২.৪

[২০০] তদেব., ২.৫

[২০১] তদেব., ২.৬

নামটি লিখে দ্বিতীয় ঘরে ৬ সংখ্যাটি বসাতে হবে। 'সান্নাং দ্বিঃ'[২০২] সূত্রের বৃত্তিতে হলায়ুধভট্ট পূর্বসূত্র থেকে ষট্ পদটিকে অনুবৃত্তির কথা বলেছেন। ফলে সান্নী গায়ত্রী ছন্দটি দ্বাদশাক্ষরবিশিষ্ট হয়ে থাকে। তখন মণ্ডলের ষষ্ঠ পঙ্ক্তির প্রথম ঘরে সান্নী নামটি লিখে দ্বিতীয় ঘরে ১২ সংখ্যাটি বসাতে হবে। এরপর আর্চী গায়ত্রী ছন্দের কথা বলা হয়েছে। এই অষ্টাদশাক্ষরবিশিষ্ট ছন্দের সূত্র হল, 'ঋচাং ত্রিঃ'[২০৩]। এখানেও যজুষাং ষট্ সূত্রটি থেকে ষট্ পদটির অনুবৃত্তির কথা আচার্য হলায়ুধভট্ট বলেছেন। সেই মণ্ডলের সপ্তম পঙ্ক্তির প্রথম ঘরে আর্চী নামটি লিখে দ্বিতীয় ঘরে ১৮ সংখ্যাটি বসাতে হবে। 'দ্বৌ দ্বৌ সান্নাং বর্দ্ধেত'[২০৪] সূত্রে গায়ত্রী পদটির অনুবৃত্তি করা হয়েছে। এই সূত্রে সান্নী গায়ত্রী থেকে দুই দুই করে অক্ষর সংখ্যা বৃদ্ধি করে তৃতীয় ঘরে ১৪, চতুর্থ ঘরে ১৬, পঞ্চম ঘরে ৮, ষষ্ঠ ঘরে ২০, সপ্তম ঘরে ২২ ও অষ্টম ঘরে ২৪ সংখ্যাটি বসাতে হবে। 'ত্রীংস্ত্রীনৃচাম্'[২০৫] সূত্রেও গায়ত্রী পদটির অনুবৃত্তি হয়েছে। পূর্ব সূত্রে যেমন সান্নী গায়ত্রীর কথা বলা হয়েছিল তেমনভাবেই এখানেও আর্চী গায়ত্রীর কথা বলা হয়েছে। এই সূত্রে সপ্তম পঙ্ক্তির আর্চী গায়ত্রীর তিন তিন করে অক্ষর সংখ্যা বৃদ্ধি করে তৃতীয় ঘর থেকে অষ্টম ঘর পর্যন্ত ক্রমানুসারে বসাতে হবে। 'চতুশ্চতুরঃ প্রাজাপত্যাযাঃ'[২০৬] সূত্রে বলা হয়েছে, চতুর্থ পঙ্ক্তির প্রাজাপত্যা গায়ত্রী থেকে চার চার করে অক্ষর সংখ্যা বৃদ্ধি করে তৃতীয় ঘর থেকে অষ্টম ঘর পর্যন্ত বসাতে হবে। এরপর 'একৈকং শেষে'[২০৭] সূত্রে যে

---

[২০২] পি. ছ. সূ., ২.৭

[২০৩] তদেব., ২.৮

[২০৪] তদেব., ২.৯

[২০৫] তদেব., ২.১০

[২০৬] তদেব., ২.১১

[২০৭] তদেব., ২.১২

সমস্ত গায়ত্রীর সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিধান করা হয়নি, তাদের (দৈবী ও যাজুষী) ক্ষেত্রে এক এক করে অক্ষর সংখ্যা বৃদ্ধি করে তৃতীয় ঘর থেকে সপ্তম ঘর পর্যন্ত বসাতে হবে। 'জহ্যাদাসুরী'[২০৮] সূত্রের বৃত্তিতে পূর্ব সূত্র থেকে একৈকং পদটির অনুবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। এই সূত্রে তৃতীয় পঙ্ক্তির আসুরী গায়ত্রীর এক এক করে অক্ষর সংখ্যা বর্জনের কথা বলা হয়েছে। ফলে তৃতীয় পঙ্ক্তির দ্বিতীয় ঘর থেকে অষ্টম ঘর পর্যন্ত এক এক করে অক্ষর সংখ্যা বর্জন করে যথাক্রমে (অক্ষর সংখ্যা) বসাতে হবে। এরপর 'তান্যুষ্ণিগনুষ্টুব্বৃহতীপঙ্ক্তিত্রিষ্টুব্জগত্যঃ'[২০৯] সূত্রে দ্বিতীয়াদি ঘরের সংখ্যানুসারেই যথাক্রমে গায়ত্রী ছন্দের মতো উষ্ণিক্ প্রভৃতি ছন্দের প্রকারভেদ বুঝতে হবে। 'তিস্রস্তিস্রঃ সনাম্না একৈকা ব্রাহ্ম্যাঃ'[২১০] সূত্রে ব্রাহ্মী ছন্দের কথা বলা হয়েছে। যাজুষী, সাম্নী ও আর্চীর সঙ্গে গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দ একত্রিত হয়ে যথাক্রমে ব্রাহ্মী গায়ত্রী, ব্রাহ্মী উষ্ণিক্, ব্রাহ্মী অনুষ্টুপ্, ব্রাহ্মী বৃহতী, ব্রাহ্মী পঙ্ক্তি, ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ ও ব্রাহ্মী জগতী ছন্দ হয়ে থাকে। এরপর 'প্রাগ্যজুষামার্ষ্য ইতি'[২১১] সূত্রে আর্ষী ছন্দের কথা বলা হয়েছে। প্রাজাপত্য, আসুরী ও দৈবীর সঙ্গে গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী একত্রিত হয়ে যথাক্রমে আর্ষী গায়ত্রী, আর্ষী উষ্ণিক, আর্ষী অনুষ্টুপ, আর্ষী বৃহতী, আর্ষী পঙ্ক্তি, আর্ষী ত্রিষ্টুপ ও আর্ষী জগতী ছন্দ হয়ে থাকে।

---

[২০৮] পি. ছ. সূ., ২.১৩

[২০৯] তদেব., ২.১৪

[২১০] তদেব., ২.১৫

[২১১] তদেব., ২.১৬

*পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্র হল 'পাদঃ'[২১২]। এই সূত্রটিকে আচার্য হলায়ুধভট্ট অধিকারসূত্র বলে উল্লেখ করেছেন। অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত আলোচ্য সূত্রটির অধিকার থাকার কথা আচার্য হলায়ুধ তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন। এমনকি এই সূত্রটির প্রয়োগ কোথা থেকে আরম্ভ হবে সে বিষয়েও আচার্য হলায়ুধ তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন, 'বক্ষ্যতি চ – গাযত্র্যা বসবঃ ইতি'[২১৩] অর্থাৎ 'পাদঃ'[২১৪] এই অধিকার সূত্রটির প্রয়োগ আরম্ভ হবে 'গাযত্র্যা বসবঃ'[২১৫] সূত্রটি থেকে।

'পাদঃ'[২১৬] সূত্রের পরবর্তী সূত্র হল 'ইযাদিপূরণঃ'।[২১৭] পূর্ব সূত্র থেকে পাদঃ পদটির অনুবৃত্তির কথা হলায়ুধ সূত্রটির বৃত্তিতে বলেছেন। 'ইযাদিপূরণঃ' সূত্রের আদি পদের দ্বারা ইব, উব ইত্যাদিকে বুঝতে হবে। 'ইযাদিপূরণঃ' অর্থাৎ ইযাদি দ্বারা ছন্দের অক্ষরসংখ্যা বৃদ্ধি করাকে বোঝানো হয়। আচার্য হলায়ুধভট্ট এর উদাহরণে বলেছেন, 'তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্'।[২১৮] আলোচ্য উদাহরণে গায়ত্রী ছন্দের এক অক্ষর কমে গিয়ে ৭ অক্ষর হওয়ায় 'ইযাদিপূরণঃ' সূত্র দ্বারা ইযাদি পূরণ করে 'তৎসবিতুর্ব্বরেণিযম্' মন্ত্রটি পাওয়া যায়।

---

[২১২] পি. ছ. সূ., ৩.১

[২১৩] তদেব., হলায়ুধ বৃত্তি, ৩.১

[২১৪] তদেব., ৩.১

[২১৫] তদেব., ৩.৩

[২১৬] তদেব., ৩.১

[২১৭] তদেব., ৩.২

[২১৮] ঋ. সং. ৩.৬২.১০

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় সূত্র হল 'গাযত্র্যা বসবঃ'।[২১৯] এই সূত্রের বৃত্তিতে আচার্য হলায়ুধ বলেছেন, গায়ত্রী পাদের উল্লেখ মাত্রই অষ্টাক্ষরের গ্রহণ হবে। জগতী পাদের উল্লেখ মাত্রই দ্বাদশাক্ষর, বৈরাজপাদের উল্লেখে দশাক্ষর, ত্রিষ্টুপ্ পাদের উল্লেখে একাদশাক্ষরের গ্রহণ করতে হবে। আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*তে 'গায়ত্র্যা বসবঃ'[২২০] (৩.৩), 'জগত্যা আদিত্যাঃ',[২২১] 'বিরাজো দিশঃ'[২২২] এবং 'ত্রিষ্টুভো রুদ্রঃ'[২২৩] – এই চারটি সূত্রকে পরিভাষাসূত্র বলে উল্লেখ করেছেন।

পাদের অক্ষর সংখ্যা বলার পর পাদের সংখ্যা বিষয়েও *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রে* সূত্র করা হয়েছে, 'একদ্বিত্রিচতুষ্পাদুক্তপাদম্'।[২২৪] আচার্য হলায়ুধের বৃত্তি থেকে জানা যায় যে, গায়ত্রী ছন্দের তিনটি পাদ থাকে। কিন্তু কোন ছন্দগুলির একটি বা দুটি বা চারটি পাদ হবে তার নির্দেশ আচার্য হলায়ুধ এই সূত্রের বৃত্তিতে বলেননি। কারণ, এর পরবর্তী সূত্রই হল 'আদ্যং চতুষ্পাদৃতুভিঃ'।[২২৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই সূত্রেই চতুষ্পাদের উল্লেখ রয়েছে। সূত্রটির বৃত্তিতে আচার্য হলায়ুধ বলেছেন, আদ্যং বলতে আর্ষী গায়ত্রীকেই বুঝতে হবে এবং সূত্রের ঋতু পদের দ্বারা ষডক্ষর বোঝাবে। অর্থাৎ ষডক্ষর বিশিষ্ট চারটিপাদে চতুর্বিংশতি অক্ষরের আর্ষী গায়ত্রী ছন্দ হয়ে থাকে। বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, প্রত্যেক সূত্রের উদাহরণগুলি আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর বৃত্তিতে উল্লেখ করেছেন। আবার

---

[২১৯] পি. ছ. সূ, ৩.৩

[২২০] তদেব., ৩.৩

[২২১] তদেব., ৩.৪

[২২২] তদেব., ৩.৫

[২২৩] তদেব., ৩.৬

[২২৪] তদেব., ৩.৭

[২২৫] তদেব., ৩.৮

সপ্তাক্ষরবিশিষ্ট তিনটি পাদেও একবিংশতি অক্ষরের গায়ত্রী ছন্দ পরিলক্ষিত হয়। এর জন্য *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রে* 'ক্বচিৎত্রিপাদৃষিভিঃ'[২২৬] সূত্রটির উল্লেখ রয়েছে। এই ত্রিপাদে একবিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দের নামকরণ করা হয়েছে পাদনিচৃৎ। তার জন্য সূত্র হল 'সা পাদনিচৃৎ'।[২২৭] পাদনিচৃৎ বলতে প্রত্যেক পাদের একাক্ষর করে অক্ষর সংখ্যার হ্রাসকে বোঝায়। পাদনিচৃৎ বলার পর অতিপাদনিচৃৎ গায়ত্রী ছন্দের বিষয়েও বলা হয়েছে। অতিপাদনিচৃৎ গায়ত্রী ছন্দের সূত্র হল 'ষট্কসপ্তকযোর্মধ্যেঽষ্টাবতিপাদনিচৃৎ'।[২২৮] হলায়ুধ তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন, যে গায়ত্রী ছন্দের প্রথম পাদে ষডক্ষর, দ্বিতীয় পাদে অষ্টাক্ষর এবং তৃতীয় পাদে সপ্তাক্ষর থাকে, তাকে অতিপাদনিচৃত গায়ত্রী বলা হয়। নাগী গায়ত্রী বিষয়ক সূত্র হল 'দ্বৌ নবকৌ ষট্কশ্চ নাগী'।[২২৯] আচার্য হলায়ুধ তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন, যে গায়ত্রী ছন্দের প্রথম দুই পাদে নয় অক্ষর এবং তৃতীয় পাদে ছয় অক্ষর থাকে, তাকে নাগী গায়ত্রী বলে। এরপর বারাহী গায়ত্রী ছন্দের সূত্র হল 'বিপরীতা বারাহী'।[২৩০] বৃত্তিতে হলায়ুধভট্ট বলেছেন, বারাহী গায়ত্রী ছন্দের প্রথম পাদে ছয় অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে নয়টি করে অক্ষর সংখ্যা বিদ্যমান। বর্দ্ধমানা গায়ত্রী ছন্দের সূত্র হল 'ষট্কসপ্তকাষ্টকৈর্বর্দ্ধমানা'।[২৩১] এই সূত্রের বৃত্তিতে বলা হয়েছে, বর্দ্ধমানা গায়ত্রী ছন্দের প্রথম পাদে ছয়, দ্বিতীয় পাদে সাত এবং তৃতীয় পাদে অষ্টাক্ষর বিদ্যমান।

---

[২২৬] পি. ছ. সূ., ৩.৯

[২২৭] তদেব., ৩.১০

[২২৮] তদেব., ৩.১১

[২২৯] তদেব., ৩.১২

[২৩০] তদেব., ৩.১৩

[২৩১] তদেব., ৩.১৪

প্রতিষ্ঠা গায়ত্রী ছন্দের সূত্র হল 'বিপরীতা প্রতিষ্ঠা'।[২৩২] এই সূত্রের বৃত্তিতে বলা হয়েছে, এই ছন্দের প্রথম পাদে অষ্টাক্ষর, দ্বিতীয় পাদে সাত অক্ষর ও তৃতীয় পাদে ছয় অক্ষর বিদ্যমান। সূত্রের বিপরীতা পদটির দ্বারা পূর্বসূত্রের বিপরীত অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। এরপর দ্বিপাদ বিরাট নামক গায়ত্রী ছন্দের সূত্র করা হয়েছে 'তৃতীয়ং দ্বিপাজ্জাগতগাযত্র্যাভ্যাম্'। [২৩৩] বৃত্তিকার বলেছেন, জগতী ছন্দের দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট একপাদ এবং গায়ত্রী ছন্দের অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট একপাদ নিয়ে দ্বিপাদ্ বিরাট্ নামক গায়ত্রী ছন্দ হয়ে থাকে। ত্রিপাদ্ বিরাট্ গায়ত্রী ছন্দের সূত্র হল 'ত্রিপাত্ত্রৈষ্টুভৈঃ'।[২৩৪] বৃত্তিতে বলা হয়েছে, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের একাদশাক্ষর বিশিষ্ট তিনটি পাদ হল ত্রিপাদ্ বিরাট্ গায়ত্রী। এই পর্যন্ত 'গায়ত্র্যা বসবঃ'[২৩৫] সূত্রটির অধিকার বর্তমান।

গায়ত্রী বিষয়ে আলোচনা করার পর উষ্ণিক ছন্দের বিষয়ে *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রে* সূত্র প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে উষ্ণিক্ ছন্দের সূত্র করা হয়েছে, 'উষ্ণিগ্গাযত্রৌ জাগতশ্চ'।[২৩৬] বৃত্তিকার বলেছেন, যে ত্রিপাদবিশিষ্ট ছন্দের দুইটি পাদ অষ্টাক্ষর এবং একটি পাদ দ্বাদশাক্ষর, তাকে বলে উষ্ণিক্ ছন্দ। উল্লেখ্য যে, এই সূত্রে অষ্টাক্ষর এবং দ্বাদশাক্ষর পাদের মধ্যে আগে পরের কোনও ক্রমবিবক্ষা নেই। ককুভ্ উষ্ণিক্ ছন্দের সুত্র হল 'ককুভ্মধ্যে চেদন্ত্যঃ'।[২৩৭] বৃত্তিকার বলেছেন, ককুভ্ নামক উষ্ণিক্ ছন্দের প্রথম ও শেষ পাদ অষ্টাক্ষর এবং মধ্যপাদ দ্বাদশাক্ষর হয়ে থাকে। পুর উষ্ণিক্ ছন্দের সূত্র হল

---

[২৩২] পি. ছ. সূ., ৩.১৫

[২৩৩] তদেব., ৩.১৬

[২৩৪] তদেব., ৩.১৭

[২৩৫] তদেব., ৩.৩

[২৩৬] তদেব., ৩.১৮

[২৩৭] তদেব., ৩.১৯

‘পুর উষ্ণিক্ পরতঃ’।[২৩৮] এই সূত্রের বৃত্তিতে বলা হয়েছে, পুর উষ্ণিক্ ছন্দের প্রথম পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং শেষ দুইটি পাদ অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। ‘পরোষ্ণিক্ পরতঃ’[২৩৯] এই সূত্র দ্বারা পরোষ্ণিক্ ছন্দ হয়ে থাকে। বৃত্তিকারের মতে, এই ছন্দের প্রথম দুইটি পাদ অষ্টাক্ষর এবং শেষ পাদটি দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এছাড়াও সপ্তাক্ষর বিশিষ্ট চারটি পাদও উষ্ণিক্ ছন্দ নামে পরিচিত। এর জন্য সূত্র করা হয়েছে, ‘চতুষ্পাদৃষিভিঃ’।[২৪০] এই সূত্র পর্যন্ত উষ্ণিক্ ছন্দের অধিকার বিদ্যমান থাকবে।

উষ্ণিক্ ছন্দের আলোচনার পর অনুষ্টুপ্ ছন্দের বিষয়ে আলোচনা করা হল। অনুষ্টুপ্ ছন্দের সূত্র করা হয়েছে, ‘অনুষ্টুব্ গাযত্র্যৈঃ’।[২৪১] অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট চতুষ্পাদ ছন্দের নাম হল অনুষ্টুপ্। আবার ‘ত্রিপাত্ ক্বচিজ্জাগতাভ্যাঞ্চ’[২৪২] সূত্র দ্বারা অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট একপাদ এবং দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট দুইপাদ ছন্দেরও অনুষ্টুপ্ নাম হয়ে থাকে। ‘মধ্যেঽন্ত্যে চ’[২৪৩] সূত্র দ্বারাও অনুষ্টুপ্ ছন্দ হয়ে থাকে। বৃত্তিকারের মতে, এই ছন্দের প্রথম ও শেষ পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং মধ্যপাদ অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট অথবা প্রথম দুইটি পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং অন্তপাদটি অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। ‘অনুষ্টুব্ গাযত্র্যৈঃ’[২৪৪] থেকে ‘মধ্যেঽন্ত্যে চ’[২৪৫] সূত্র পর্যন্ত অনুষ্টুপ্ ছন্দের অধিকার বিদ্যমান।

---

[২৩৮] পি. ছ. সূ., ৩.২০

[২৩৯] তদেব., ৩.২১

[২৪০] তদেব., ৩.২২

[২৪১] তদেব., ৩.২৩

[২৪২] তদেব., ৩.২৪

[২৪৩] তদেব., ৩.২৫

[২৪৪] তদেব., ৩.২৩

[২৪৫] তদেব., ৩.২৫

বৃহতী ছন্দের বিষয়ে *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রে* সূত্র করা হয়েছে, 'বৃহতী জাগতস্ত্রযশ্চ গাযত্র্যাঃ'।[২৪৬] বৃত্তিকার বলেছেন, এই ছন্দের একপাদ দ্বাদশাক্ষর এবং তিনটি পাদ অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। পথ্যা বৃহতীর সূত্র হল 'পথ্যা পূর্বশ্চেত্তৃতীযঃ'।[২৪৭] বৃত্তিকার হলায়ুধ বলেছেন, পথ্যা বৃহতী ছন্দের তৃতীয় পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং অন্য তিনটি পাদ অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। অপর একটি বৃহতী ছন্দ হল ন্যঙ্কুসারিণী। এই ছন্দের জন্য *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রে* সূত্র করা হয়েছে, 'ন্যঙ্কুসারিণী দ্বিতীযঃ'।[২৪৮] বৃত্তিকার বলেছেন, এই ছন্দের দ্বিতীয় পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং অন্য তিনটি পাদ অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এরপরের সূত্রটি হল 'স্কন্ধোগ্রীবী ক্রৌষ্টুকেঃ'।[২৪৯] এই সূত্রের বৃত্তিতে হলায়ুধভট্ট বলেছেন, ন্যঙ্কুসারিণী বৃহতী ছন্দকেই আচার্য ক্রৌষ্টুকি স্কন্ধোগ্রীবী নামক ছন্দ বলেছেন। হলায়ুধভট্টের মতে, এই সূত্রে আচার্য পদটি পূজার্থে গৃহীত হয়েছে। এর পরবর্তী সূত্র হল 'উরোবৃহতী যাস্কস্য'।[২৫০] আচার্য হলায়ুধভট্ট এই সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন, আচার্য যাস্কের মতে উক্ত ন্যঙ্কুসারিণী বৃহতী ছন্দই উরোবৃহতী নামে পরিচিত হয়ে থাকে। উপরিষ্টাৎ বৃহতী ছন্দের সূত্র হল 'উপরিষ্টাদ্বৃহত্যন্তে'।[২৫১] বৃত্তিকারের মতে, এই ছন্দের প্রথম পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং শেষ তিনটি পাদ অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বৃত্তিকার এই ছন্দের উদাহরণে সামবেদ থেকে মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। এর পরবর্তী বৃহতী ছন্দ হল

---

[২৪৬] পি. ছ. সূ., ৩.২৬

[২৪৭] তদেব., ৩.২৭

[২৪৮] তদেব., ৩.২৮

[২৪৯] তদেব., ৩.২৯

[২৫০] তদেব., ৩.৩০

[২৫১] তদেব., ৩.৩১

পুরস্তাৎ বৃহতী। *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রে* উল্লেখিত এই ছন্দের সূত্র হল 'পুরস্তাদ্বৃহতী পুরঃ'।[২৫২] হলায়ুধ তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন, এই ছন্দের প্রথম পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং শেষ তিনটি পাদ অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বৃত্তিকার হলায়ুধ এই ছন্দের উদাহরণে সামবেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। কোনও কোনও বেদ মন্ত্রে নয় অক্ষর বিশিষ্ট চারটি পাদেও 'ক্বচিন্নবকাশ্চত্বারঃ'[২৫৩] সূত্রানুসারে বৃহতী ছন্দ হয়ে থাকে। আবার 'বৈরাজী গাযত্রী চ'[২৫৪] এই সূত্রানুসারে প্রথম দুইপাদ দশাক্ষর এবং শেষের দুই পাদ অষ্টাক্ষর হলেও বৃহতী ছন্দ হয়ে থাকে। 'ত্রিভির্জাগতৈর্ম্মহাবৃহতী'[২৫৫] এই সূত্রানুসারে দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট তিনটি পাদকে মহাবৃহতী ছন্দ বলা হয়। 'সতোবৃহতী তাণ্ডিনঃ'[২৫৬] সূত্রানুসারে তাণ্ডী নামক মুনির মতে মহাবৃহতী ছন্দই সতোবৃহতী নামে পরিচিত হয়ে থাকে। এইভাবে দেখা যায় যে, 'বৃহতী জাগতস্ত্রযশ্চ গাযত্র্যাঃ'[২৫৭] সূত্র থেকে 'সতোবৃহতী তাণ্ডিনঃ'[২৫৮] পর্যন্ত সূত্রগুলি বৃহতী ছন্দের অধিকারে পঠিত হয়েছে।

পঙ্ক্তি ছন্দের প্রথম সূত্র হল 'পঙ্ক্তির্জাগতী গাযত্রৌ'।[২৫৯] আচার্য হলায়ুধভট্ট এই সূত্রের বৃত্তিতে অক্ষর সংখ্যা বোঝানোর জন্য জাগতী এবং গাযত্র্যৌ পদদুটি ব্যবহার করেছেন। জাগতী পদের দ্বারা দ্বাদশাক্ষর এবং গাযত্র্যৌ পদের দ্বারা অষ্টাক্ষরকে বোঝানো হয়েছে। যে ছন্দের দুইপাদ দ্বাদশাক্ষর এবং দুইপাদ অষ্টাক্ষর হয়, তাকে

---

[২৫২] পি. ছ. সূ., ৩.৩২

[২৫৩] তদেব., ৩.৩৩

[২৫৪] তদেব., ৩.৩৪

[২৫৫] তদেব., ৩.৩৫

[২৫৬] তদেব., ৩.৩৬

[২৫৭] তদেব., ৩.২৬

[২৫৮] তদেব., ৩.৩৬

[২৫৯] তদেব., ৩.৩৭

পঙ্ক্তি নামক ছন্দ বলা হয়ে থাকে। 'পূর্বৌ চেদযুজৌ সতঃপঙ্ক্তি'[২৬০] সূত্রানুসারে যে পঙ্ক্তি ছন্দে প্রথম ও তৃতীয় পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ অষ্টাক্ষর, তাকে সতঃপঙ্ক্তি ছন্দ বলা হয়। আবার প্রথম ও তৃতীয় পাদ অষ্টাক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ দ্বাদশাক্ষর হলেও 'বিপরীতৌ চ'[২৬১] সূত্রানুসারে সতঃপঙ্ক্তি নামে ছন্দ হয়ে থাকে। 'আস্তারপঙ্ক্তিঃ পরতঃ'[২৬২] সূত্রানুসারে যে ছন্দে প্রথম দুই পাদ অষ্টাক্ষর এবং শেষ দুই পাদ দ্বাদশাক্ষর হয়, তাকে আস্তারপঙ্ক্তি ছন্দ বলা হয়ে থাকে। এই ছন্দগুলির প্রত্যেকটির উদাহরণ আচার্য হলায়ুধ *ঋগ্বেদ* থেকে গ্রহণ করেছেন। 'প্রস্তারপঙ্ক্তিঃ পরতঃ'[২৬৩] সূত্রানুসারে এই প্রস্তারপঙ্ক্তি ছন্দের প্রথম দুই পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং শেষ দুই পাদ অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। 'বিস্তারপঙ্ক্তিরন্তঃ' [২৬৪] সূত্রানুসারে এই বিস্তারপঙ্ক্তি ছন্দের প্রথম ও চতুর্থ পাদ অষ্টাক্ষর এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। 'সংস্তারপঙ্ক্তির্বহিঃ'[২৬৫] সূত্রানুসারে সংস্তারপঙ্ক্তি ছন্দের প্রথম ও চতুর্থ পাদ দ্বাদশাক্ষর এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এরপর অক্ষরপঙ্ক্তি বিষয়ে 'অক্ষরপঙ্ক্তিঃ পঞ্চকাশ্চত্বারঃ'[২৬৬] সূত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে। হলায়ুধের মতে, চারটি পাদ বিশিষ্ট পঞ্চাক্ষর ছন্দকে অক্ষরপঙ্ক্তি বলা হয়ে থাকে। আচার্য হলায়ুধভট্ট 'দ্বাবপ্যল্পশঃ'[২৬৭] সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন, পূর্বসূত্র থেকে পঞ্চপদের

---

[২৬০] পি. ছ. সূ, ৩.৩৮

[২৬১] তদেব., ৩.৩৯

[২৬২] তদেব., ৩.৪০

[২৬৩] তদেব., ৩.৪১

[২৬৪] তদেব., ৩.৪২

[২৬৫] তদেব., ৩.৪৩

[২৬৬] তদেব., ৩.৪৪

[২৬৭] তদেব., ৩.৪৫

গ্রহণ করা হয়েছে। অল্পশঃপঙ্ক্তি ছন্দের ক্ষেত্রে প্রতিপাদে পঞ্চাক্ষর বিদ্যমান। এছাড়াও 'পদপঙ্ক্তিঃ পঞ্চ'[২৬৮] সূত্রানুসারেও পঞ্চাক্ষর বিশিষ্ট পাঁচটি পাদে পদপঙ্ক্তি নামক ছন্দ হয়ে থাকে। 'চতুষ্কষট্কৌ ত্রযশ্চ'[২৬৯] সূত্রানুসারে যে ছন্দের প্রথম পাদে চারটি অক্ষর, দ্বিতীয় পাদে ছয় অক্ষর এবং পরের তিনটি পাদে পাঁচটি করে অক্ষর থাকে, তাকেও পদপঙ্ক্তি নামক ছন্দ বলা হয়। 'পথ্যা পঞ্চভির্গাযত্রেঃ'[২৭০] সূত্রানুসারে যে ছন্দে প্রতিপাদে আটটি করে অক্ষর থাকে, তাকে পথ্যা নামক পঙ্ক্তি ছন্দ বলা হয়। অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট ছয়টি পাদে 'জগতী ষড্ভিঃ'[২৭১] সূত্রানুসারে জগতী নামক পঙ্ক্তি ছন্দ হয়ে থাকে। আচার্য হলায়ুধ এই সূত্রের বৃত্তিতে গাযত্র্যেঃ পদটির অনুবৃত্তির কথা বলেছেন।

এরপর ত্রিষ্টুপ ছন্দের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই 'একেন ত্রিষ্টুব্জ্যোতিষ্মতী'[২৭২] সূত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায়। আচার্য হলায়ুধ সূত্রটির বৃত্তিতে বলেছেন, একাদশাক্ষর বিশিষ্ট একটি পাদ এবং অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট চারটি পাদ থাকলে জ্যোতিষ্মতী নামক ত্রিষ্টুপ ছন্দ হয়ে থাকে। এরপর 'তথা জগতী'[২৭৩] সূত্রানুসারে দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট একপাদ এবং অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট চারটি পাদ যে ছন্দে থাকে, তাকে জ্যোতিষ্মতী জগতী ছন্দ বলা হয়। 'পুরস্তাজ্জ্যোতিঃ প্রথমেন'[২৭৪] সূত্রানুসারে যে ছন্দে প্রথম পাদে একাদশাক্ষর এবং শেষ চারটি পাদে অষ্টাক্ষর থাকে তাকে পুরস্তাজ্জ্যোতি

---

[২৬৮] পি. ছ. সূ., ৩.৪৬

[২৬৯] তদেব., ৩.৪৭

[২৭০] তদেব., ৩.৪৮

[২৭১] তদেব., ৩.৪৯

[২৭২] তদেব., ৩.৫০

[২৭৩] তদেব., ৩.৫১

[২৭৪] তদেব., ৩.৫২

নামক ত্রিষ্টুপ ছন্দ বলা হয় এবং যে ছন্দের প্রথম পাদে দ্বাদশাক্ষর এবং শেষ চারটি পাদে অষ্টাক্ষর থাকে, তাকে পুরস্তাজ্জ্যোতি নামক জগতী বলা হয়। এরপর 'মধ্যেজ্যোতিঃ মধ্যমেন'[২৭৫] সূত্রানুসারে যে ছন্দের প্রথম দুইপাদ ও শেষ দুইপাদ অষ্টাক্ষর এবং মধ্যের পাদ একাদশাক্ষর বিশিষ্ট হয়, তাকে মধ্যেজ্যোতি নামক ত্রিষ্টুপ্ বলে আবার যে ছন্দের প্রথম দুইপাদ ও শেষ দুইপাদ অষ্টাক্ষর এবং মধ্যপাদ দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট হয়, তাকে মধ্যেজ্যোতি নামক জগতী ছন্দ বলা হয়। এরপর 'উপরিষ্টাজ্জ্যোতিরন্তেন'[২৭৬] সূত্রানুসারে যে ছন্দের প্রথম চারটি পাদ অষ্টাক্ষর ও শেষ পাদে একাদশাক্ষর থাকে, তাকে উপরিষ্টাজ্জ্যোতি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ বলা হয় আবার যে ছন্দের প্রথম চারটি পাদে অষ্টাক্ষর ও শেষ পাদে দ্বাদশাক্ষর থাকে, তাকে উপরিষ্টাজ্জ্যোতি নামক জগতী ছন্দ বলা হয়।

এরপর কিছু বিশেষ প্রকার গায়ত্রী ছন্দের বিষয়ে পিঙ্গলাচার্য সূত্র নিরূপণ করেছেন। প্রথমে শঙ্কুমতী নামক গায়ত্রী ছন্দের সূত্র করেছেন 'একস্মিন্ পঞ্চকে ছন্দঃ শঙ্কুমতী'।[২৭৭] পঞ্চাক্ষর বিশিষ্ট একটি পাদ এবং ষডক্ষর বিশিষ্ট তিনটিপাদ যে ছন্দে থাকে, তাকে শঙ্কুমতী গায়ত্রী ছন্দ বলা হয়। আচার্য হলায়ুধভট্ট এই সূত্রের বৃত্তি আলোচনাকালে বলেছেন, যদিও পূর্বসূত্রের ছন্দঃ পদের অধিকার রয়েছে, তা সত্ত্বেও পুনরায় ছন্দঃ শব্দের গ্রহণের দ্বারা সামান্য ছন্দের বোধগম্যতা হয়। 'ষট্কৈ ককুভ্মতী'[২৭৮] সূত্রানুসারে ষডক্ষর বিশিষ্ট একপাদের সঙ্গে মিলিত হলে পূর্বের সমস্ত

---

[২৭৫] পি. ছ. সূ., ৩.৫৩

[২৭৬] তদেব., ৩.৫৪

[২৭৭] তদেব., ৩.৫৫

[২৭৮] তদেব. ৩.৫৬

ছন্দের ককুভ্মতী নাম হয়ে থাকে। এরপর 'ত্রিপাদনিষ্ঠমধ্যা পিপীলিকমধ্যা'[২৭৯] সূত্রানুসারে যে ছন্দের প্রথম ও অন্তপাদ অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট এবং মধ্যপাদ তিন অক্ষর বিশিষ্ট হয়, তাকে পিপীলিকমধ্যা গায়ত্রী ছন্দ বলা হয়। আবার অন্যান্য যে সমস্ত তিনপাদবিশিষ্ট ছন্দের মধ্যপাদ অল্পাক্ষর হয়ে থাকে, তাকেও পিপীলিকমধ্যা গায়ত্রী ছন্দ বলা হয়। এরপর যবমধ্যা ছন্দের বিষয়ে সূত্র করা হয়েছে 'বিপরীতা যবমধ্যা'।[২৮০] যে ছন্দের প্রথম ও অন্তপাদ অল্পাক্ষর এবং মধ্যপাদ বহু অক্ষরবিশিষ্ট হয়ে থাকে, তাকে যবমধ্যা বলে। পরবর্তী সূত্র হল 'ঊনাধিকৈনৈকেন নিচৃদ্ভূরিজৌ|'[২৮১] এই সূত্রানুসারে যে গায়ত্রী ছন্দে ২৪ অক্ষরের পরিবর্তে ২৩টি অক্ষর বর্তমান থাকে, তাকে নিচৃৎ আর ২৫ অক্ষর বর্তমান থাকলে ভূরিক নাম হয়ে থাকে। পরবর্তী 'দ্বাভ্যাং বিরাট্ স্বরাজৌ'[২৮২] সূত্রানুসারে যদি গায়ত্রী ছন্দের দুইটি অক্ষর কম থাকে, তাহলে তাকে বিরাট এবং যদি দুটি অক্ষর বেশী থাকে, তাহলে তাকে স্বরাট গায়ত্রী ছন্দ বলা হয়ে থাকে। 'আদিতঃ সন্দিগ্ধে'[২৮৩] সূত্রানুসারেও স্বরাট গায়ত্রী ছন্দ এবং বিরাট উষ্ণিক ছন্দ হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে আদি পদটি থাকায় বুঝতে হবে, যদি গায়ত্রীর প্রথমপাদ হয় তবে গায়ত্রী এবং যদি উষ্ণিকের প্রথমপাদ হয় তবে উষ্ণিক ছন্দ হয়ে থাকে। এরপর 'দেবতাদিতশ্চ'[২৮৪] সূত্রানুসারে দেবতাদি শব্দের দ্বারাও সংশয় স্থলের ছন্দোনির্ণয় করার বলা বলা হয়েছে। হলায়ুধ বলেছেন, আদি শব্দটি এখানে স্বরাদির পরিগ্রাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

[২৭৯] পি. ছ. সূ., ৩.৫৭

[২৮০] তদেব., ৩.৫৮

[২৮১] তদেব., ৩.৫৯

[২৮২] তদেব., ৩.৬০

[২৮৩] তদেব., ৩.৬১

[২৮৪] তদেব., ৩.৬২

এরপর দেবতাদি শব্দের ছন্দনির্ণয় বিষয়ে 'অগ্নিঃ সবিতা সোমো বৃহস্পতির্ম্মিত্রাবরূণাবিন্দো বিশ্বেদেবা দেবতাঃ'[২৮৫] সূত্রানুসারে অগ্নি দেবতা দ্বারা গায়ত্রী ছন্দ, সবিতা দ্বারা উষ্ণিক্, সোম দ্বারা অনুষ্টুপ্ বৃহস্পতি দ্বারা বৃহতী, মিত্রাবরূণ দ্বারা পঙ্ক্তি, ইন্দ্র দ্বারা ত্রিষ্টুপ এবং বিশ্বেদেবা দেবতা দ্বারা জগতী ছন্দকে নির্দেশ করা হয়েছে। 'স্বরাঃ ষড্জাদয়ঃ'[২৮৬] সূত্রানুসারে গায়ত্রী থেকে শুরু করে জগতী পর্যন্ত সাতটি ছন্দের স্বরগুলি যথাক্রমে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এরপর গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দের বর্ণবিষয়ে 'সিতসারঙ্গপিশঙ্গকৃষ্ণনীললোহিতগৌরা বর্ণাঃ'[২৮৭] সূত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের গোত্র বিষয়ে 'অগ্নিবেশ্য কাশ্যপগৌতমাঙ্গিরসভার্গবকৌশিকবাশিষ্ঠানি গোত্রাণি'[২৮৮] সূত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে।

*পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে অতিচ্ছন্দগুলির বিষয়ে সূত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রথম সূত্র হল 'চতুঃশতমুৎকৃতিঃ'।[২৮৯] ১০৪টি অক্ষর থাকলে উৎকৃতি নামক ছন্দ হয়। পরবর্তী সূত্র হল 'চতুরশ্চতুরস্ত্যজেদুৎকৃতেঃ'।[২৯০] এই সূত্রানুসারে উৎকৃতি ছন্দ থেকে চারটি করে অক্ষর সংখ্যা বাদ দিয়ে ৪৮ অক্ষর পর্যন্ত ছন্দগুলি হয়ে থাকে। পরবর্তী সূত্র হল 'তান্যভিসংব্যাপ্রেভ্যঃ কৃতিঃ'।[২৯১] এই সূত্র দ্বারা কৃতি শব্দের আগে অভি, সম্, বি, আঙ্ ও প্র যোগ করে উৎকৃতির পরবর্তী পাঁচটি ছন্দের নাম হবে। এর

---

[২৮৫] পি. ছ. সূ., ৩.৬৩

[২৮৬] তদেব., ৩.৬৪

[২৮৭] তদেব., ৩.৬৫

[২৮৮] তদেব., ৩.৬৬

[২৮৯] তদেব., ৪.১

[২৯০] তদেব., ৪.২

[২৯১] তদেব., ৪.৩

দ্বারা বোঝা যায় যে, ১০০ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দের নাম অভিকৃতি, ৯৬ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দের নাম সংকৃতি, ৯২ অক্ষবিশিষ্ট ছন্দের নাম বিকৃতি, ৮৮ অক্ষবিশিষ্ট ছন্দের নাম আকৃতি ও ৮৪ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দের নাম প্রকৃতি হয়ে থাকে। চতুর্থ সূত্র হল 'প্রকৃত্যা চোপসর্গবর্জ্জিতঃ'।[২৯২] এই সূত্রানুসারে দ্বিতীয় সূত্র দ্বারা পূর্বোক্ত ৮৪ অক্ষর থেকে ৪ অক্ষর বাদ দেওয়ায় ৮০ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দের নাম হয় কৃতি। 'ধৃত্যষ্টিশক্করীজগত্যঃ'[২৯৩] সূত্রানুসারে কৃতি ছন্দের পরবর্তীতে ধৃতি, অষ্টি, শক্করী ও জগতী ছন্দগুলি হয়ে থাকে। 'পৃথক্ পৃথক্ পূর্বত এতান্যেবৈষাম্'[২৯৪] সূত্রানুসারে ধৃতি প্রভৃতি শব্দের পূর্বে পৃথক, পৃথক, ধৃতি প্রভৃতি শব্দগুলিই সংযুক্ত করতে হবে। এইভাবে ধৃতি ইত্যাদি শব্দের পূর্বে ধৃতি ইত্যাদি শব্দই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই ধৃতি ইত্যাদি শব্দগুলি 'দ্বিতীয়ং দ্বিতীয়মতিতঃ'[২৯৫] সূত্রানুসারে অতি শব্দের পরে সংযুক্ত হয়ে থাকে। তাহলে ৪৮ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দের নাম হবে জগতী এবং ৫২ অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দের নাম অতিজগতী হয়ে থাকে। এইভাবে অন্যান্য ছন্দগুলির ক্ষেত্রেও অতি শব্দ যোগ করে পৃথক পৃথক ছন্দের নাম পাওয়া যায়। এইভাবে চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তম সূত্র পর্যন্ত বৈদিক ছন্দের আলোচনা পাওয়া যায়। এই অধ্যায়েই এরপর লৌকিক ছন্দের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভাংশে শুধুমাত্র বৈদিক ছন্দগুলির বিষয়েই আলোচনা করা হল।

---

[২৯২] পি. ছ. সূ., ৪.৪

[২৯৩] তদেব., ৪.৫

[২৯৪] তদেব., ৪.৬

[২৯৫] তদেব., ৪.৭

## ৩.৩.১৪. *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তির* গুরুত্ব :

হলায়ুধের কৃতিসমূহের মধ্যে *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনী* ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই বৃত্তিতেই মেরু প্রস্তারের বর্ণনা পাওয়া যায়। বৃত্তিটি প্রতিপাদনের দিক থেকেও অসাধারণ। *ছন্দঃসূত্রের* অন্যান্য ব্যাখ্যা থেকে এর গুরুত্ব আলাদা। কারণ, পরবর্তীকালের অনেক ছন্দঃশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থেই এই ব্যাখ্যার প্রভাব লক্ষণীয়।

ছন্দঃশাস্ত্রের প্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থরূপে হলায়ুধ প্রণীত *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* কেই ধরা হয়। এই *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি হলায়ুধবৃত্তি* নামেও পরিচিত। তবে এই গ্রন্থটি কোনও লিখিত টীকা বা পুস্তক নয়।

গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণের রীতির প্রচলন আচার্য হলায়ুধভট্টও তাঁর *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের বৃত্তিতে করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থ রচনার পরম্পরাকে অনুসরণ করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি ভগবান শিবের প্রতি নমস্কার করেছেন। এর দ্বারা বোধ্য যে, এই গ্রন্থে নমস্কারাত্মক মঙ্গলাচরণ হয়েছে। এছাড়াও মঙ্গলাচরণের পরেই তিনি বলেছেন যে, আচার্য পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃশাস্ত্রের* বৃত্তি তিনি রচনা করতে চলেছেন। সুতরাং তিনি ছিলেন একজন বৃত্তিকার। সংস্কৃত সাহিত্যে টীকা, ভাষ্য, ব্যাখ্যা, বৃত্তি ইত্যাদি বলে বিভিন্ন Commentary হয়। তন্মধ্যে এই গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধভট্ট স্বয়ং বৃত্তির কথাই বলেছেন।

হলায়ুধের বৃত্তিতে যে ব্যাখ্যা রয়েছে সেখানে গণ শব্দটির উল্লেখ না করে বেশিরভাগ স্থলে সংজ্ঞা শব্দটির উল্লেখই করা হয়েছে। প্রত্যেক সংজ্ঞার ফলরূপে পৃথক ছন্দেরও উল্লেখ করা হয়েছে। বৈয়াকরণাচার্য পাণিনি যেমন কোনও কোনও সূত্রকে অধিকার সূত্র বলে ধরেছেন হলায়ুধও তাঁর বৃত্তিতে ছন্দ বিষয়ক বেশ কিছু অধিকার

সূত্রের উল্লেখ করেছেন, যা অন্যান্য ব্যাখ্য গ্রন্থগুলিতে একেবারেই বিরল। ছন্দঃশাস্ত্রের আর যে সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে সেখানে সমস্ত দিক গুলি এভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়নি। শুধুমাত্র *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*তেই তার সমস্ত দিক যেমন- ভাষা, ব্যাকরণ, অপর ব্যাখ্যাকারদের মত খণ্ডন এবং স্বমত স্থাপন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে পরিবেশন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো হয়েছে তা সত্যই প্রশংসার দাবি রাখে। আচার্য গঙ্গাদাস যেমন ছন্দঃশাস্ত্রের যতি নির্ধারণের জন্য কতকগুলি বিশেষ শব্দের গ্রহণ করেছেন এবং তার মাধ্যমে সংখ্যা নির্দিষ্ট করেছেন। যে সংখ্যা দ্বারা যতি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। হলায়ুধবৃত্তি থেকেই জানা যায় যে, বৈদিক ছন্দের ক্ষেত্রেও কতকগুলি সংজ্ঞা ব্যবহার করা হত, যা পরবর্তী লৌকিক সংস্কৃতে গণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। এ থেকে মনে হয় যে, এই *হলায়ুধবৃত্তি*ই হয়তো পরবর্তী ছান্দসিকদের পথিকৃত গ্রন্থরূপে স্থান পেয়েছে। আচার্য পিঙ্গল শুধুমাত্র সূত্রই রচনা করেছেন, তার কোনওরকম ব্যাখ্যা তিনি করেননি। হলায়ুধ যদি এই *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের ব্যাখ্যা না করতেন তাহলে পাঠকবর্গকে খুবই সমস্যার সন্মুখীন হতে হত অর্থাৎ ছন্দঃশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন থেকে মরুভূমির পথিকদের মত তৃষ্ণার্তই থাকতে হত। পিঙ্গল 'ইযাদিপূরণঃ'[২৯৬] নামে যে সূত্র করেছেন হলায়ুধভট্ট তাঁর বৃত্তিতে ইযাদি বলতে ইয এবং উবকে বুঝিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পাদপুরণ করার যে প্রণালী তাও তিনি তাঁর বৃত্তিতে উল্লেখ করেছেন। পিঙ্গলাচার্য বৈদিক ছন্দগুলির অক্ষরসংখ্যা দেবতাবাচক শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট না করলেও হলায়ুধভট্ট কিন্তু *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*তে দেবতাবাচক শব্দের দ্বারা বিভিন্ন ছন্দের চিহ্নিতসূচক পাদের সংখ্যাগুলি নির্দিষ্ট করেছেন। হলায়ুধভট্টের বৃত্তিতে যে সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শন করা হয়েছে তার অনেকগুলিই পরবর্তী ছন্দঃশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে প্রয়োগ হয়েছে।

---

[২৯৬] পি. ছ. সূ., ৩.২

আচার্য হলায়ুধ তাঁর বৃত্তিতে ছন্দের লক্ষণ বোঝাবার জন্য ছন্দের নামগুলিকেই ব্যবহার করেছেন। ছন্দের অক্ষরসংখ্যা বোঝাবার জন্য কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ বিশেষ শব্দের উল্লেখ করেছেন। হলায়ুধভট্ট তাঁর বৃত্তিতে *ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ* ইত্যাদি থেকে ছন্দগুলির উদাহরণ দিয়েছেন।

## ৩.৩.১৫. *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি*র রচনাশৈলী :

সংস্কৃত সাহিত্যজগতে বেদব্যাখ্যার দিক দিয়ে আচার্য হলায়ুধভট্ট যেমন অনন্য ব্যক্তিত্ব তেমনি আবার বেদাঙ্গ বিষয়ক ছন্দঃশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্রের* বৃত্তি রচনায়ও তিনি অনন্য ও অগ্রগণ্য।

পিঙ্গলপ্রণীত ছন্দঃশাস্ত্রের সূত্রগুলির ব্যাখ্যা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। *পিঙ্গলছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের অনেকগুলি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হল হলায়ুধপ্রণীত বৃত্তি। হলায়ুধকৃত *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের* বৃত্তির নামকরণ করা হয়েছে *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*।

হলায়ুধকৃত *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের* বৃত্তিটি *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* নামে যতটা না প্রসিদ্ধ তার থেকে বেশি হলায়ুধবৃত্তি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থটি সূত্রাকারে রচিত। তাঁর এই গ্রন্থের অধ্যয়ন করার জন্য টীকাগ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়াই শিক্ষার্থীদের পক্ষে স্বাভাবিক। আর টীকা গ্রন্থের কথা উঠলে সর্বপ্রথম হলায়ুধবৃত্তির কথাই মাথায় আসে। এই বৃত্তিটি সহজ ও সরল ভাষায় রচিত। পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থটি প্রথমে বৈদিক ও পরে লৌকিক ছন্দের বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ। তাই তার বৃত্তিরচনা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হলেও আচার্য হলায়ুধভট্ট কিন্তু তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন।

লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আরও বেশ কিছু সর্বস্ব নামধারী গ্রন্থ এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি অধুনা উপলব্ধ নয়। তাই সেই গ্রন্থগুলির বিষয়ে আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে আমাদের নীরবই থাকতে হয়েছে।

'একোনেঽধ্বা'[২৯৭] সূত্রটি বৈদিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হয়নি। 'অত্রানুক্তং গাথা'[২৯৮] সূত্রটির পর 'হংসরুতং ম্লৌ গৌ',[২৯৯] 'ততং নৌ মরৌ'[৩০০] সূত্রগুলি বৈদিক পাঠের বিরুদ্ধে গিয়ে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু এইরকম ব্যাখ্যাপ্রণালী প্রাচীন বেদ শাস্ত্রে অসম্ভব ব্যাপার। কোথাও কোথাও সূত্রগুলির যথার্থ অর্থ অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আচার্য হলায়ুধের দ্বারা ব্যাখ্যা ছন্দঃশাস্ত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যা বলে কথিত। অদ্যাবধি এই ছন্দরূপ বেদাঙ্গশাস্ত্রের আর কোনও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাওয়া যায় না। 'মযরসতজভনলগসম্মিতং' ইত্যাদি যে ষষ্ঠ শ্লোকটি ছন্দঃশাস্ত্রের মঙ্গলাচরণে দৃষ্ট হয়, তা প্রাচীন ব্যাখ্যানেই প্রস্তাবনারূপে ছিল। অনুমান করা হয় যে, এই শ্লোকটি হলায়ুধের দ্বারা ব্যাখ্যাত নয় বরং বৈদিক শাস্ত্রের ব্রহ্মযজ্ঞেই তা প্রতীকরূপে বিদ্যমান ছিল। *দেবী ভাগবতে* বলা হয়েছে-

"অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পঞ্চসংবৎসরেতি চ।

---

[২৯৭] পি. ছ. সূ., ৮.৩৩, পৃ. ১৯৪ কেদারনাথ (সম্পা.)

[২৯৮] তদেব., ৮.১

[২৯৯] তদেব., ৬.৭

[৩০০] তদেব., ৬.৩৬

মযরসজভনেত্যেব গৌর্গ্যা ইত্যেব কীর্তযেৎ।।"[৩০১]

আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে কেদারভট্ট *বৃত্তরত্নাকর* নামে ছন্দঃশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা অবৈদিক ছন্দে রচিত। তবে এই গ্রন্থটি কিন্তু *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের* ভাষ্য নয়, এটি একটি স্বতন্ত্র রচনা। তিনি এই গ্রন্থের অন্তিম অধ্যায়ে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) পিঙ্গলাচার্যের থেকে পুরোপুরিই ভিন্ন কিছু নিয়মের উল্লেখ করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আচার্য হলায়ুধভট্ট পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্রের* উপর *মৃতসঞ্জীবনী* নামক একটি বৃত্তি লিখেছেন, যেখানে আচার্য হলায়ুধভট্ট পিঙ্গলাচার্য কৃত বিধিগুলির আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। পিঙ্গলকৃত *ছন্দঃসূত্রের* অষ্টম অধ্যায়ে ৩৫টি সূত্র রয়েছে। তার মধ্যে অন্তিম ১৬টি সূত্রই (৮.২০ সূত্র - ৮.৩৫ সূত্র পর্যন্ত) সংযোজকের সঙ্গে যুক্ত।

## অধ্যায়সংক্ষেপ :

**লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধ রচিত নির্বাচিত কয়েকটি গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা** নামক এই অধ্যায়ে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, *মীমাংসাসর্বস্ব* এবং *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* নামক তিনটি গ্রন্থের বিশেষ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

[৩০১] দেবী ভাগবত, ১১.২০.৯

চতুর্থ অধ্যায়

# লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন

## ৪.১. অবতরণিকা :

আগেই বলা হয়েছে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি হলায়ুধভট্ট ভিন্ন ব্যক্তি এবং উভয়ের গ্রন্থসমূহও ভিন্ন ভিন্ন। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব, ছন্দঃসূত্রের হলায়ুধবৃত্তি* বা *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* ইত্যাদি গ্রন্থগুলির প্রণেতা। অপরদিকে রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি হলায়ুধভট্ট *অভিধানরত্নমালা, কবিরহস্য, ক্রিয়ানিঘণ্টু, হলায়ুধ-স্তোত্র* ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা। এছাড়াও *সেক-শুভোদয়া* নামে আর একটি গ্রন্থও আচার্য হলায়ুধভট্টের নামে পাওয়া যায়। যদিও গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও ঘটনাপরম্পরার দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, লক্ষ্মণসেনের কালেই এইসব ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু এর ভাষা ব্যবহার খুবই নিম্নমানের এবং এই গ্রন্থে বহু অশুদ্ধ সংস্কৃতভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, যা সংস্কৃতানুরাগীদের নিকট কখনই কাম্য নয়। এই কারণে *সেক-শুভোদয়া* গ্রন্থের লেখক হলায়ুধমিশ্রকে কখনই লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারীর সঙ্গে এক করা যায় না। এছাড়া আরও কয়েকটি গ্রন্থের নাম হলায়ুধভট্টের নামে পাওয়া যায়। যেমন– *দ্বিজনয়ন, মত্স্যসূক্ততন্ত্র, দুর্গোত্সববিবেক* ইত্যাদি। কিন্তু এই গ্রন্থগুলি অনুপলব্ধ, তাই সঠিকভাবে কোন হলায়ুধকৃত রচনা তা নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, সংস্কৃত সাহিত্যজগতে যে হলায়ুধই এই অনুপলব্ধ অথচ সাহিত্য-

সমালোচকদের দ্বারা উল্লিখিত এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির রচয়িতা হোন না কেন তিনি যে একজন খ্যাতনামা শাস্ত্রকার সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে বঙ্গদেশের সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধেরই বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁর রচিত উপলব্ধ গ্রন্থগুলির রচনাশৈলীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি মূলত সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় নিজ বক্তব্য উপস্থাপনে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রত্যেকটি গ্রন্থেই আচার্য হলায়ুধভট্ট কিছু মৌলিকতা বা নিজস্বতা প্রতিপাদন করেছেন, যা তাঁর গ্রন্থগুলিকে অন্যান্যদের রচনা থেকে পৃথক ও গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা প্রদান করেছে। তাঁর রচিত প্রত্যেকটি গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা প্রদানকালে তিনি অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকদের শরণাপন্ন হয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র ও পুরাণ, *রামায়ণ, মহাভারত* ইত্যাদি থেকে প্রচুর উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছেন। ভাষ্যগ্রন্থ রচনার সময় বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রকারদের এবং তাঁদের লিপিবদ্ধ তথ্যসূত্রগুলির উল্লেখও তিনি করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যজগতে বেদভাষ্য রচনাকালে আচার্য হলায়ুধভট্ট যেভাবে শ্রৌতকর্ম ও গৃহ্যকর্মবিষয়ক বেশ কিছু মন্ত্রের আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে বেদব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আর কেউই হয়তো এইরকম পন্থা অবলম্বন করেননি। এদিক দিয়ে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

## ৪.২. সংস্কৃত সাহিত্যজগতের শাখা-প্রশাখায় লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের অবদান :

সংস্কৃত সাহিত্য বলতে এক সুবিশাল সাহিত্যসম্ভারকে বোঝানো হয়, যা অন্যান্য ভাষার সাহিত্যকৃতির মতো শুধুমাত্র এক শ্রেণীর রচনাসম্ভারের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার বিস্তৃতি বহুমাত্রিক। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে একটা হল বৈদিক সাহিত্য যার মধ্যে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও তার অন্তর্গত শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ- এই ষড়্বেদাঙ্গ অন্তর্ভুক্ত। তার অন্য একটা দিক হল মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গদ্যকাব্য, চম্পূকাব্য ইত্যাদি শ্রব্যকাব্য এবং নাটক-প্রকরণ প্রভৃতি রূপক-উপরূপক-সমন্বিত দৃশ্যকাব্য ইত্যাদির মহাসম্ভার। এছাড়া দর্শনশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত কিছুই সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইংরেজি Literature শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে সাহিত্য শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ভাষার সৌন্দর্য ও আবেগের ক্রিয়াশীলতা শব্দের আশ্রয়ীভূত হয়ে যখন সম্পূর্ণ নতুনরূপ লাভ করে তখনই সাহিত্যের জন্ম হয়। মানুষের ভাষার মাধ্যমে সৃষ্ট লিখিত শিল্পকর্মকেই সাহিত্য বলা হয়ে থাকে। এর মধ্যে থাকে লেখকের কল্পনা, সৃজনশীলতা ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা। সাহিত্য নামক সম্পদের গ্রহণযোগ্যতা শিল্পগত সৌন্দর্যের ওপরেই নির্ভরশীল। সংস্কৃত হল একটি ভাষা, আর এই ভাষার মাধ্যমে সৌন্দর্য ও আবেগের ক্রিয়াশীলতা যখন শব্দের আশ্রয়ীভূত হয়ে নবরূপ লাভ করে তখন তা সংস্কৃত সাহিত্য নামে পরিচিতি হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের যে বিস্তৃতির কথা আগে বলা হল সেইসব শাখা-প্রশাখার কোন কোন ক্ষেত্রে আচার্য হলায়ুধের বিশেষ অবদান রয়েছে তারই আলোচনা আমাদের মুখ্য বিষয়।

আচার্য হলায়ুধভট্ট যিনি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হিসাবে দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন করেছেন, তিনি যে সংস্কৃত সাহিত্যজগতে একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের বহুবিধ শাখা-প্রশাখায় তাঁর অনন্যসাধারণ কৃতি বিদ্যমান সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি একদিকে যেমন বেদভাষ্যকার আবার অপরদিকে মীমাংসা, ছন্দঃশাস্ত্র ও কাব্যশাস্ত্রেও অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যজগতে এরকম ব্যক্তি সত্যই দুর্লভ।

প্রথমতঃ আচার্য হলায়ুধের অবদান বিশেষ করে পরিলক্ষিত হয় বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে। মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিকে বেদ নামে অভিহিত করা হয়।[১] সংখ্যাগণনায় বেদ চারটি। যথা– ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। এদের মধ্যে *ঋগ্বেদ* হল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সায়ণাচার্য অবশ্য যজ্ঞতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বেদভাষ্যরচনায় *যজুর্বেদের* প্রাথম্য স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায়-

"আধ্বর্যবস্য যজ্ঞেষু প্রাধান্যাত্ ব্যাকৃতঃ পুরাঃ।

যজুর্বেদোঽথ হোত্রার্থমৃগ্বেদো ব্যাকরিষ্যতে।।"[২]

---

[১] মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্; আ. য. প. সূ., ১.১

[২] ঋ. ভা. ভূ., সায়ণাচার্য, মঙ্গলাচরণ ৫

তাই যজ্ঞানুষ্ঠানের গুরুত্বে এই চতুর্বিধ বেদের মধ্যে যজুর্বেদকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হয়। যজুর্বেদের প্রাচীন নাম হল যজুংষি। এই *যজুর্বেদ-সংহিতা* আবার দুইভাগে বিভক্ত। যথা– *কৃষ্ণযজুর্বেদ* ও *শুক্লযজুর্বেদ*। *শুক্লযজুর্বেদের* সংহিতাভাগের নাম *বাজসনেয়ি-সংহিতা*। তার আবার দুটি শাখা পাওয়া যায়। যথা– কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। মাধ্যন্দিন শাখার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার হিসাবে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন উবট (একাদশ শতক), মহীধর (ষোড়শ শতক)। আবার কাণ্বশাখার ভাষ্যকারগণ হলেন আচার্য হলায়ুধ (খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক), অনন্তাচার্য, আনন্দবোধ ও কালনাথ। এঁদের মধ্যে হলায়ুধই আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের কেন্দ্রবিন্দু।

আচার্য হলায়ুধভট্ট শুক্লযজুর্বেদের কাণ্বশাখাকেই অবলম্বন করে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামে বেদভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখানে মূলত ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রের বর্ণনীয় বিষয়গুলিরই আলোচনা পাওয়া যায়। তবে এই গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এখানে স্মৃতিশাস্ত্রীয় তত্ত্বগত উপাদানের বর্ণনার পাশাপাশি বেশ কিছু শ্রৌতকর্মেরও বিবরণ পাওয়া যায়। গৃহ্যকর্মগুলি বিস্তৃত আকারে গ্রন্থের অনেকটা অংশ জুড়েই রয়েছে, তবে সেই তুলনায় শ্রৌতকর্মগুলি অপেক্ষাকৃত স্বল্প অংশ জুড়ে বর্ণিত হয়েছে। এই গৃহ্য ও শ্রৌতকর্মগুলির আলোচনার সঙ্গে প্রায় ৩০০টি মন্ত্রের উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গৃহ্য ও শ্রৌত কর্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত আচারাদির সঙ্গে সম্পর্কিত মন্ত্রগুলির উল্লেখ যেমন আচার্য হলায়ুধভট্ট করেছেন তেমনি তার পাশাপাশি সেই সকল মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যাও তিনি তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* নামক বেদ ভাষ্যগ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন।

দর্শনশাস্ত্রেও আচার্য হলায়ুধভট্টের কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। তিনি মীমাংসা দর্শনকে আশ্রয় করে *মীমাংসাসর্বস্ব* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। *পণ্ডিতসর্বস্ব*,

*শৈবসর্বস্ব* ও *বৈষ্ণবসর্বস্ব* গ্রন্থগুলির শুধুমাত্র বিষয়বস্তু সংক্রান্ত সামান্য পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই জানা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তবে এই গ্রন্থগুলি যে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টেরই রচনা তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

হলায়ুধরচিত *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ছন্দঃশাস্ত্রের অধ্যয়নে এই বৃত্তির গুরুত্ব অপরিসীম। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতামতকে স্বাগত জানিয়েই এই গ্রন্থের রচয়িতাকে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারীরূপে আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আচার্য হলায়ুধভট্ট সংস্কৃত সাহিত্যের বহুবিধ শাখা-প্রশাখায় তাঁর রচনাসমূহের জন্য অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ও সংস্কৃত সাহিত্যের আকাশে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে বিরাজ করে রয়েছেন। যদিও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনজন হলায়ুধের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁদের কালের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ও কৃতিসমূহও ভিন্ন ভিন্ন। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট মূলত বেদ বিষয়ক রচনাসমূহই প্রণয়ন করেছেন। তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য। সর্বস্ব নাম দিয়ে তিনি আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, *মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব* ও *শৈবসর্বস্ব* গ্রন্থগুলিতে যেহেতু সর্বস্ব নামের ব্যবহার রয়েছে সুতরাং এই গ্রন্থগুলিও *ব্রাহ্মণসর্বস্বে*র রচনাকার লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট কর্তৃক রচিত। কিন্তু সেই গ্রন্থগুলি অধুনা উপলব্ধ নয়। তাই সেই গ্রন্থগুলির বিষয়ে আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে আমাদের নীরবই থাকতে হয়েছে।

---

[৩] Kavi., Ed. Sourindro Mohun Tagore, Preface, p. ii.

## ৪.৩. লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের রচনায় পূর্বাচার্যদের প্রভাব :

হলায়ুধ তাঁর রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* পূর্বসূরি ভাষ্যকার হিসেবে কর্ক, উবট ও গুণবিষ্ণু নামে তিন জন বেদ ভাষ্যকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও আরও কয়েকজন পূর্বসূরি ভাষ্যকারদের মত আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাঁদের নাম তিনি উল্লেখ করেননি। নামহীন ভাষ্যকারদের পরিচয় প্রতিষ্ঠার কোনও উপায় নেই, তাঁরা যে গ্রন্থের উপর তাঁদের ভাষ্য লিখেছিলেন তার বিবরণ নির্ণয় করাও সম্ভব নয়। তবে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম বলে মনে হয়। অন্তত শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ি-সংহিতার ক্ষেত্রে তা তো খুবই কম। উবটাচার্য সম্পর্কে আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বলেছেন, 'ব্যাখ্যাতো মতিশালিনাঽযমুবটাচার্যেণ বেদঃ পরম্'।[৪] পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যায় তিনি আরও বলেছেন, "উবটপ্রভৃতিভির্যজুর্বেদভাষ্যকারৈর্বিনিযোগো ব্যাখ্যাতঃ।[৫] এছাড়া অন্নপ্রাশন প্রসঙ্গে একটি মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তাঁর অপর মন্তব্য- "প্রপূর্বঃ সুবতিরভ্যনুজ্ঞানে বর্তত ইতি উবটেন লিখিতম্"।[৬]

আবার গুণবিষ্ণু সম্পর্কেও আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে বলেছেন, 'প্রপূর্বঃ সুবতিরভ্যনুজ্ঞানে বর্তত ইতি উবটো গুণবিষ্ণুশ্চ'।।[৭]

আচার্য হলায়ুধভট্ট মীমাংসা এবং স্মৃতিতেও পারদর্শী ছিলেন। গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা করার সময় তিনি পূর্বসূরিদের ভাষ্যগ্রন্থের অনেক উদ্ধৃতিও দিয়েছেন।

---

[৪] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ৪

[৫] তদেব., পৃ. ১৩৪

[৬] তদেব., পৃ. ২৩৩

[৭] তদেব., পৃ. ২৫৬

*ব্রাহ্মণসর্বস্বে* বলা হয়েছে- "মীমাংসাব্যবসাযিভিঃ স্মৃতিপরামর্শপ্রকর্ষস্থিতৈঃ গাযত্রী দ্বিজপুরুষৈঃ কতি কিযত্কৃত্বো ন বা ব্যাকৃতা'।[৮]

উবট ছাড়া আচার্য হলায়ুধের পূর্বে *শুক্লযজুর্বেদের* কোনও ভাষ্যকারের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ছিল কি না তা খুবই সন্দেহজনক। অন্যান্য ভাষ্যকারগণ যথা- উদ্গীথ, স্কন্দস্বামী, মাধব, বেঙ্কটমাধব এবং গুণবিষ্ণু সকলেই অন্যান্য বেদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

আচার্য হলায়ুধভট্ট *যজুর্বেদের* উপর ভাষ্যগ্রন্থের অভাবকে নিন্দা করেছেন এবং সেই সময়ে বিদ্যমান একমাত্র ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে উবটাচার্যের ভাষ্যকে উল্লেখ করেছেন। সেই ভাষ্যগ্রন্থের নাম ছিল মন্ত্রভাষ্য, কিন্তু সেটিও হলায়ুধের মতে গ্রন্থ অধ্যয়নের অর্থ বোঝার জন্য অপর্যাপ্ত ছিল। সেই অপ্রতুলতা বা অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য আচার্য হলায়ুধভট্ট স্বয়ং সকলের নিকট পরিচিত পদগুলি ব্যবহার করে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বৈদিক মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাই *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থেও বলা হয়েছে-

"আসন্ বা কতি সন্তি বা কতি ন কিং ক্ষ্মামণ্ডলে পণ্ডিতা
ব্যাখ্যাতো মতিশালিনাঽযমুবটাচার্যেণ বেদঃ পরম্।
অস্পষ্ট তদপীত্যনেন বিদূষা বিশ্বপ্রসিদ্ধৈঃ পদৈঃ
সন্ধ্যাদিদ্বিজকর্মমন্ত্রবচসাং ব্যাখ্যানমেতত্ কৃতম্"।।[৯]

---

[৮] দুর্গামোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ব্রা. স., পৃ. ৫

[৯] তদেব.,পৃ. ৪

আচার্য হলায়ুধভট্টের পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে বেশ কয়েকজন বেদ-ব্যাখ্যাকার জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবে তাঁদের মধ্যে কেউ সম্পূর্ণ বেদের ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে জানা যায় না। সকলের রচনা হস্তগতও হয়নি, শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যাখ্যাকারের নাম জানা যায়। বেদ ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অমুদ্রিত অবস্থায় থেকে গেছে এবং কয়েকটিমাত্রই প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল ব্যাখ্যাকারেরা গৃহস্থের দৈনন্দিন ধর্মানুষ্ঠানের উপযোগী বৈদিক মন্ত্রগুলি একত্র করে তার উপর ভাষ্যপ্রণয়ন করেছেন, সম্পূর্ণ বেদের ব্যাখ্যা রচনায় কেউই অগ্রসর হননি।

আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, নুগড়াচার্যই প্রথম বাঙালি বেদব্যাখ্যাতা এবং তিনি বেদব্যাখ্যায় যে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলেন তা পরবর্তী ভাষ্যকার গুণবিষ্ণু ও আচার্য হলায়ুধ অনুসরণ করেছেন। ভট্ট গুণবিষ্ণু রচিত বেদভাষ্যের নাম হল *ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য*। তবে এই ভাষ্যগ্রন্থের মধ্যে ভাষ্যকারের কোনওরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। *ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্যের* রচয়িতা আচার্য গুণবিষ্ণু খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে বল্লালসেনের রাজসভায় বর্তমান ছিলেন।

গুণবিষ্ণুর রচিত *ছান্দোগ্য-মন্ত্রভাষ্য* আট খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন প্রভৃতি সংস্কার এবং স্নান, সন্ধ্যা, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের উপযোগী চারশোর অধিক মন্ত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই অনতিবিস্তৃত মন্ত্রভাষ্যে সমগ্র বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের মতো সর্বতোমুখী বিদ্যাবত্তা প্রতিফলিত না হলেও গুণবিষ্ণুর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ভাষ্য সরল, পরিমিত, অথচ সম্পূর্ণ। তিনিই ভাষ্যগ্রন্থে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, গৃহ্যসূত্র, নিঘন্টু, নিরুক্ত, পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করেছেন এবং পদসাধনে সর্বত্র পাণিনিব্যাকরণের অনুসরণ করেছেন। অপরদিকে,

আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* কাণ্বশাখীয় বাজসনেয়িগণের গার্হস্থ্যকর্মের উপযোগী ৩০০টির কিঞ্চিদধিক মন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। যে সকল অনুষ্ঠানে ওই মন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়, গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভেই তার একটি সূচি দিয়েছেন। এই শ্লোকবদ্ধ সূচিতে দন্তধাবন থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত চল্লিশ প্রকার কর্মের নাম রয়েছে। যে সকল কর্মে সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয়গণের একই মন্ত্র পাঠ করতে হয়, সেই সকল স্থলে গুণবিষ্ণু ও আচার্য হলায়ুধের ব্যাখ্যা প্রায় একরূপই বলা যায়। অন্যান্য মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য হলায়ুধভট্ট তাঁর সহজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। আচার্য হলায়ুধভট্টের ব্যাখ্যা সরল হলেও পুরাণ, গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণে সমৃদ্ধ এবং স্মৃতি-নিবন্ধের মতো কর্মানুষ্ঠানসম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রয়োগে পরিপূর্ণ।

আচার্য হলায়ুধভট্টের *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* বহু মন্ত্রের ব্যাখ্যা গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যার অনুরূপ। একটি বৈদিক মন্ত্রের পাঠভেদ সম্পর্কে আলোচনাকালে রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি বলেছেন যে, গুণবিষ্ণুর একটি হস্তলিখিত পুঁথিতে এই পাঠ দৃষ্ট হয়, কিন্তু হলায়ুধ প্রভৃতি শিষ্টগণ তা গ্রহণ করেননি। এখানে রামনাথ গুণবিষ্ণুকে আচার্য হলায়ুধ অপেক্ষা প্রাচীন বলে মতপ্রকাশ করেছেন। রামনাথের উক্তি এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের* ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন যে, গুণবিষ্ণুর ভাষ্য থেকে হলায়ুধ বহু অংশ স্বরচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* গ্রহণ করেছেন। এর দ্বারা আচার্য গুণবিষ্ণুর *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের* গুরুত্ব বোঝা যায়।

## ৪.৪. পরবর্তী সাহিত্যে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের রচনার প্রভাব :

সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টের রচনার প্রভাব পরবর্তী অনেক গ্রন্থকারদের রচনাতেই পরিলক্ষিত হয়। আচার্য চণ্ডেশ্বরের গ্রন্থে হলায়ুধভট্টের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। চণ্ডেশ্বররচিত *বিবাদরত্নাকর* গ্রন্থে ২২ বার,

*গৃহস্থরত্নাকর* গ্রন্থে আট বার এবং *কৃত্যরত্নাকরে* গ্রন্থে তিন বার আচার্য হলায়ুধের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। চণ্ডেশ্বরের *বিবাদরত্নাকর* গ্রন্থে বিশেষ করে ব্যবহারবিষয়ক পদগুলিরই আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের বৃদ্ধিতরঙ্গে আচার্য মনু ও নারদের বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে আধিবিষয়ক আলোচনায় যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুর বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে, আধিসিদ্ধি বিষয়ক আলোচনায় আচার্য বৃহস্পতির বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে, প্রতিভূ বিষয়ক আলোচনায় মনুর বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে, উদ্গ্রাহণবিধি বিষয়ক আলোচনায় বৃহস্পতির বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে, নিক্ষেপ বিষয়ক আলোচনায় কাত্যায়ন ও নারদের বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে, দত্তাপ্রদানিক বিষয়ের আলোচনায় নারদ বর্ণিত অদত্তষোড়শপদার্থের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে, দাস্যাধিকারবিধির আলোচনায় কাত্যায়নের বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে, ক্রীতানুশয়ের ধর্মবিষয়ে যাঞ্জবল্ক্যের বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে, প্রকাশতস্করদণ্ড বিষয়ক আলোচনায় মনু ও বৌধায়নের বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে, অপ্রকাশতস্করদণ্ড বিষয়ক আলোচনায় নারদের বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে, সাহস বিষয়ক ব্যবহার পদের আলোচনায় মনু ও নারদের বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে, অভিগমদণ্ডবিধির আলোচনায় শঙ্খলিখিতের ও মনুর বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে এবং জীবৎপিতৃকবিভাগবিধি বিষয়ক আলোচনায় যাজ্ঞবল্ক্য ও শঙ্খলিখিতের বচনের উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে আচার্য হলায়ুধের মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে।[১০] এইভাবে এই গ্রন্থে ব্যবহার বিষয়ক পদগুলির আলোচনায় মোট ২২ বার আচার্য হলায়ুধের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। *গৃহস্থরত্নাকর* গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধভট্টের নাম বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মোট আটবার উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বিবাহ্যাবিবাহ্যকন্যানিরূপণ, দাতৃনিরূপণ,

[১০] কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত, বিবাদ., পৃ. ১০, ১১, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৯, ৪৭, ৮২, ৮৬, ৯৮, ১৩৫, ১৫৩, ১৯৬, ২৯৪, ৩০৩, ৩২১, ৩৫৭, ৩৭৫, ৩৯০, ৩৯৩, ৪৬৭, ৪৬৮.

কন্যাস্বয়ম্বর, বিবাহব্যবস্থা, স্নানবিধি, ভোজনবিধি, দুগ্ধব্যবহারবিধি ও বাণিজ্যব্যবস্থা প্রসঙ্গে আচার্য হলায়ুধভট্টের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১] *কৃত্যরত্নাকর* গ্রন্থেও আচার্য হলায়ুধভট্টের নাম বিভিন্ন আচারাদি ক্রমে মোট তিনবার উদ্ধৃত করা হয়েছে। কখনও মঘাত্রয়োদশী আবার কখনও কাম্যকর্মের প্রসঙ্গে আচার্য হলায়ুধভট্ট এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছেন।[১২] এছাড়াও হরিনাথের *স্মৃতিসার*, রঘুনন্দনের *দায়তত্ত্ব, ব্যবহারতত্ত্ব, দিব্যতত্ত্ব, আহ্নিকতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব শ্রাদ্ধতত্ত্ব* বাচস্পতির *বিবাদচিন্তামণি* গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ধর্মশাস্ত্রকার রঘুনন্দন, রামনাথ, নিত্যানন্দ ও শত্রুঘ্নের গ্রন্থেও হলায়ুধের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের অনিরুদ্ধভট্টের *ছান্দোগ্য-মন্ত্রকৌমুদী*, বর্ধমানের *গঙ্গাকৃত্যবিবেক* ও *দানবিবেকে*, রামকৃষ্ণভট্টাচার্যের *মন্ত্রকৌমুদী* এবং রামকৃষ্ণভট্টের *শ্রাদ্ধসংগ্রহ*- এই সকল গ্রন্থে আচার্য হলায়ুধের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। আচার্য হলায়ুধের মতের উল্লেখ টীকাকার মল্লিনাথের টীকাতেও পাওয়া যায়।[১৩]

শ্রাদ্ধসূত্রের *হলায়ুধভাষ্য* বিভিন্ন রচনায় উল্লিখিত হয়েছে। বিশেষত কৃষ্ণমিশ্রের *শ্রাদ্ধকাশিকা* এবং *শ্রাদ্ধগণপতি* এবং রামকৃষ্ণের *সংস্কারগণপতি*তে আচার্য হলায়ুধভট্টের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক নিবন্ধ এবং বৈদিকভাষ্য নামে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

---

[১১] কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত, গৃহস্থ., পৃ. ২৭, ৪০, ৫২, ৯২, ১৯৫, ৩৫৮, ৩৭০, ৪৩৫.

[১২] ঐ, কৃত্য., পৃ. ৩১৯, ৩২৭, ৩৩২.

[১৩] দৃগ্ দৃষ্টিনেত্রলোচনচক্ষুর্নয়নাম্বকেক্ষণাক্ষী...ইতি হলায়ুধঃ। মল্লিনাথকৃত টীকা, রঘু. প্রথম সর্গ, ৪০

ধর্মসূত্রকার শ্রীদত্ত, শূলপাণি, রঘুনন্দন, রুদ্রধর, গোবিন্দানন্দ, চন্দ্রেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, পীতাম্বর, মহেশকবি এবং মিত্রমিশ্র প্রভৃতি নিবন্ধগ্রন্থ রচয়িতাদের দ্বারাও ধর্মীয় নিবন্ধ এবং বৈদিক ভাষ্য উভয়ক্ষেত্রেই হলায়ুধের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, নিবন্ধশাস্ত্রের টীকাকারগণ যেমন- নিত্যানন্দ, রামনাথ, শত্রুঘ্নমিশ্র প্রমুখ আচার্যদের রচনাতেও আচার্য হলায়ুধের ভাষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মিথিলার প্রথম দিকের নিবন্ধকারদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন শ্রীদত্ত উপাধ্যায়। তাঁর আবির্ভাবকাল আনুমানিক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর সমস্ত রচনায় আচার্য হলায়ুধের মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। আচার্য হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* এমন একটি গ্রন্থ ছিল, যা শ্রীদত্তকে তাঁর আচারাদর্শের কাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করেছিল। শ্রীদত্ত তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিতেও আচার্য হলায়ুধের একাধিক বার উল্লেখ করেছেন। আর এই হলায়ুধ *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* রচয়িতা ভিন্ন অপর কোনও ব্যক্তি ছিলেন না।

ষোড়শ শতকের নিবন্ধকার পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশরচিত *শ্রাদ্ধকৌমুদী* গ্রন্থে হলায়ুধ ও ধনঞ্জয়ের উল্লেখ একই সঙ্গে পাওয়া যায়। তিনি স্বয়ং বলেছেন, "ধনঞ্জয়-হলায়ুধধৃত স্বল্পমৎস্যবাক্যাৎ"।[১৪] এখানেই হলায়ুধের পিতা হিসাবে ধনঞ্জয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহেশকবির *আচারচন্দ্রোদয়* অথবা *মাধবপ্রকাশ* গ্রন্থে হলায়ুধ এবং তাঁর নিবন্ধ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* মধ্যে সংখ্যাতত্ত্ব ছাড়াও সময়ের উল্লেখও পাওয়া যায়।

---

[১৪] পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রাদ্ধ., পৃ. ১৮১

শত্রুঘ্ন তাঁর *মন্ত্রার্থদীপিকাতে ব্রাহ্মণসর্বস্বের* বৃহৎ অংশের প্রতিলিপি করেছেন। শত্রুঘ্ন ত্রিগর্তের (পাঞ্জাবের কাংড়া) রাজা ধর্মচন্দ্রের অনুরোধে এই গ্রন্থের *দীপিকা* টীকাটি লিখেছেন। সুতরাং তিনি ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের পরবর্তী কিছুতেই হতে পারেন না। আচার্য শত্রুঘ্ন তাঁর ভাষ্যের সূচনাতেই চার জন লেখকের নাম ও তাঁদের রচনাবলির উল্লেখ করেন। আচার্য হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* তার মধ্যে অন্যতম, যা থেকে তিনি অনেক উদ্ধৃতি নিজ গ্রন্থে প্রয়োগ করেছেন।

শত্রুঘ্নের ভাষ্যের মন্ত্রব্যাখ্যাগুলি আচার্য হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* এবং উবটাচার্যের ভাষ্যের মধ্যেও রয়েছে। বাস্তবে শত্রুঘ্নের ভাষ্যটি উবট এবং হলায়ুধের ভাষ্য থেকেই সংকলিত। দেখা যাচ্ছে হলায়ুধের ভাষ্যটি সমগ্র দেশে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি পেয়েছে। চার শত বছর পূর্বে দূর দেশে বসবাসকারী শত্রুঘ্নমিশ্রের কাছ থেকে একটি বিশেষ ধরণের শ্রদ্ধাবার্তা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়েই তা বোঝা যায়।

## অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ :

বঙ্গদেশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন এই অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু। এখানে প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যজগতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় আচার্য হলায়ুধের অবদান এবং তাঁর রচনাসমূহের অসাধারণত্ব বিচার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর আচার্য হলায়ুধকৃত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব* এবং *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের হলায়ুধবৃত্তি* গ্রন্থগুলির রচনাশৈলীর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। তবে এখানে আচার্য হলায়ুধের সাহিত্যকৃতিতে পূর্বাচার্যদের প্রভাব এবং পরবর্তী সাহিত্যে আচার্য হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির প্রভাব- এই দুটি বিষয়ের ওপরই বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

# উপসংহার

সংস্কৃত সাহিত্যজগতে রয়েছে আচার্য হলায়ুধের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। হলায়ুধ নামের মধ্যেই রয়েছে একপ্রকার গাম্ভীর্য। মহাকাব্য ও পুরাণে প্রসিদ্ধ বলরামের হল নামক আয়ুধ বা অস্ত্র থাকায় তাঁর হলায়ুধ নামে পরিচিতি ছিল।[১] সংস্কৃত সাহিত্যজগতে হলায়ুধ নামধারী ব্যক্তির অভাব নেই। গবেষণা-কার্যের যতই অগ্রগতি ঘটেছে ততই যেন নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আর তাতেই মনের মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছে নতুন তথ্য জানার আগ্রহ। এই মনোভাবের ফলস্বরূপ নতুন তথ্য পাওয়াও গিয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট ও তথ্য অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে সংস্কৃত সাহিত্যে হলায়ুধ নামে অনেক ব্যক্তি ছিলেন। একজন ছিলেন সেনবংশীয় সম্রাট লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী ও ধর্মাধ্যক্ষ এবং অন্যজন ছিলেন রাষ্ট্রকূট সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের রাজসভার সভাকবি। কেউ কেউ আবার পরমার রাজবংশীয় মুঞ্জের সভাকবি হিসেবেও হলায়ুধের উল্লেখ করেছেন। তবে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই মতামতকে খণ্ডন করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের হলায়ুধবৃত্তি* বা *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* লেখক রূপে যে হলায়ুধভট্ট ছিলেন তিনি সেনবংশীয় সম্রাট মহারাজ লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধিকারী ছিলেন।[২] *সেক-শুভোদয়ার* রচয়িতা রূপেও একজন হলায়ুধভট্টের নাম জানা যায়। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হিসেবে তাঁকে ধরা হলেও বিখ্যাত ভাষাবিদ সুকুমার সেন এই গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তাঁকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, অন্য কেউ হয়তো হলায়ুধের নামে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য

---

[১] ব. শ., শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ. ২৩৩৪

[২] কবি. শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (সম্পা.), ভূমিকা অংশ।

গবেষণা-নিবন্ধে হলায়ুধের পরিচয়গত সমস্যার সমাধান করে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হিসেবে আচার্য হলায়ুধভট্টের কৃতিসমূহেরই বিশ্লেষণপূর্বক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভের **প্রথম অধ্যায়ের** নামকরণ করা হয়েছে- সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের পরিচয়। এই অধ্যায়ে আচার্য হলায়ুধের ব্যক্তিগত পরিচিতি, স্থিতিকাল, বংশপরিচয়, মাতা-পিতা ও দুই ভাইয়ের নাম ও তাঁদের কৃতিত্ব ইত্যাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি হলায়ুধের ব্যক্তিগত পরিচিতি নিয়ে বিভিন্ন গবেষকের বিভিন্ন বক্তব্যও উপস্থাপিত হয়েছে। কেউ তাঁকে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হিসেবে দেখিয়েছেন আবার কেউ বা তাঁকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় সম্রাট রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি হিসেবে দেখিয়েছেন। আবার কেউ তাঁকে সংকর্ষণের পুত্র হিসেবেও দেখিয়েছেন। এই নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে মোট তিনজন হলায়ুধের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের ভরকেন্দ্র হিসাবে মূলত লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টকেই নির্বাচিত করা হয়েছে। এই অধ্যায়েই তাঁর কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতি অনুসন্ধানের জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সেনবংশের ইতিহাস, বিজয়সেন, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল ও আচার্য হলায়ুধভট্টের সঙ্গে সেনবংশের সম্পর্ক, সেনযুগের সাহিত্যচর্চা, লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় সংস্কৃতচর্চা, রাষ্ট্রকূট বংশের ইতিহাস, রাষ্ট্রকূটদের উৎপত্তি, রাষ্ট্রকূটবংশের শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রকূট রাজবংশের শাসকদের পরিচয়, বিশেষ করে রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের পরিচয় ও তাঁর সময়কালীন রাজসভাকবি ও তাঁদের কৃতিসমূহ, রাষ্ট্রকূট বংশের রাজত্বকালে সংস্কৃতচর্চা, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সামান্য পরিচয় ও তাঁদের কৃতিসমূহ ইত্যাদি বিষয়ের সুস্পষ্ট পর্যালোচনা যত্নপূর্বক গবেষণা-সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের **দ্বিতীয় অধ্যায়ের** নামকরণ করা হয়েছে– সংস্কৃত সাহিত্যজগতে আচার্য হলায়ুধের কৃতিসমূহ। সংস্কৃত সাহিত্যে আচার্য হলায়ুধের নামে যে সমস্ত রচনা পাওয়া যায়, এখানে তাদের সবগুলির উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আচার্য হলায়ুধের নামাঙ্কিত ১৬টি গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থগুলি হল- *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, শিবসর্বস্ব* বা *শৈবসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব, পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি, কর্মোপদেশিনী, দুর্গোৎসববিবেক, মৎস্যসূক্ততন্ত্র, দ্বিজনয়ন, সেক-শুভোদয়া, কবিরহস্য, অভিধানরত্নমালা, হলায়ুধ-স্তোত্র, ক্রিয়ানিঘণ্টু* ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও গ্রন্থের বিষয়বস্তু, *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু, *পণ্ডিতসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব* ও *বৈষ্ণবসর্বস্ব* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, *হলায়ুধবৃত্তি*র সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন, *কর্মোপদেশিনী* গ্রন্থের সামান্য পরিচয়, *দুর্গোত্সববিবেক* গ্রন্থের সামান্য পরিচয়, *মত্স্যসূক্ততন্ত্র* গ্রন্থের বিষয়বস্তু, *দ্বিজনয়ন* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, *সেক-শুভোদয়া* গ্রন্থের বিষয়বস্তু, ঐতিহাসিক ঘটনার পর্যালোচনা ও গ্রন্থের বৈশিষ্টাবলি, *কবিরহস্য* গ্রন্থের রচনাকাল ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ, *কবিরহস্য* গ্রন্থের কাব্যত্ববিচার, শাস্ত্রকাব্যরূপে *কবিরহস্যের* স্থান, ভারতের ইতিহাসে *কবিরহস্যের* স্থান, এছাড়াও সংস্কৃত ব্যাকরণে *কবিরহস্যের* অবদান, সংস্কৃত ভাষায় ধাতুর গুরুত্ব, ধাতুকোষরূপে *কবিরহস্যের* গুরুত্ব, *কবিরহস্য* গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী, *কবিরহস্যের* গ্রন্থের রহস্য নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি, *অভিধানরত্নমালা* গ্রন্থের রচনাশৈলী, *হলায়ুধস্তোত্র* গ্রন্থের সামান্য পরিচয়, *ক্রিয়ানিঘন্টু* গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইত্যাদি বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে বলে রাখা ভালো যে, এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কিছু কিছু গ্রন্থের ক্ষেত্রে কোনওটির সামান্য পরিচয় আবার কোনওটির নামমাত্র পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আচার্য

হলায়ুধ-রচিত গ্রন্থগুলির সামান্য আলোচনা বা বিষয়বস্তুগত আলোচনা করার পর গ্রন্থগুলির কোনটি কোন হলায়ুধ কর্তৃক রচিত এবং কোন সময়কার রচনা তারও বিবরণ আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধের নির্বাচিত কতিপয় গ্রন্থের বিশেষ অধ্যয়ন নামক **তৃতীয় অধ্যায়ে** মূলত লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধেরই নির্বাচিত কৃতিসমূহের সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। মূলত তিনটি গ্রন্থ নির্বাচিত করার পশ্চাতেও বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেহেতু গবেষণার মুখ্য বিষয় লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্ট সুতরাং তাঁর রচিত গ্রন্থেরই বিশেষ আলোচনা করা উচিত এবং কৃতিসমূহের মধ্যেও যেগুলো উপলব্ধ এবং প্রচলিত, মূলত এই গবেষণা-সন্দর্ভে সেই সেই গ্রন্থেরই বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন করা হয়েছে। বাংলার সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধভট্টের পাঁচটি সর্বস্বগ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। যথা – *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, পণ্ডিতসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব* ও *বৈষ্ণবসর্বস্ব*। এদের মধ্যে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থই পূর্ণভাবে উপলব্ধ, তাই তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই করা হয়েছে। এরপর *মীমাংসাসর্বস্বের* বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থ হিসেবে *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তিকে* নির্বাচিত করা হয়েছে। যদিও কেউ কেউ পরমারবংশীয় মুঞ্জের সভাকবি হলায়ুধভট্টকে এই বৃত্তিটির রচয়িতা বলে মত প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে লক্ষ্মণসেনেরই ধর্মাধিকারী হিসেবে স্বীকার করে এই বৃত্তিটির বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা গবেষণা-সন্দর্ভের এই অংশে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে যে তিনটি গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে সেই সব গ্রন্থের বিভিন্ন দিক পরিবেশিত হয়েছে। তিনটি গ্রন্থের মধ্যে যেসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, তা নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে আলোচনা করা হল-

***ব্রাহ্মণসর্বস্ব* :** আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের এই অংশে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থটির সার্বিক দিক পর্যালোচনার প্রয়াস করা হয়েছে। প্রথমে বেদভাষ্যগ্রন্থরূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থকে প্রতিষ্ঠা করে আচার্য হলায়ুধের বেদভাষ্যের বিষয়বস্তুর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন, সর্বস্ব শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ, পুরাণ-স্মৃতি ও নিবন্ধগ্রন্থের প্রমাণ প্রয়োগের আকররূপে *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*কে প্রতিষ্ঠা, *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* সংস্কারতত্ত্ব, হলায়ুধ ও গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যাপদ্ধতির তুলনাত্মক অধ্যয়ন, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* গৃহ্যসূত্রের প্রভাব, গুণবিষ্ণুপ্রণীত *ছান্দোগ্যমন্ত্রভাষ্যের* প্রভাব, *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* উৎসানুসন্ধান, স্বরূপবিশ্লেষণ, হলায়ুধসম্মত বেদাধ্যয়নের শর্তাবলি, বেদাধ্যয়নের রীতি, *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* বেদভাষ্যের বৈশিষ্ট্য, *ব্রাহ্মণসর্বস্বের* রচনাশৈলী, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির আচার-অনুষ্ঠানভিত্তিক ব্যাখ্যা। এছাড়া আরও কিছু মন্ত্রের ব্যাখ্যা এই অংশে তুলে ধরা হয়েছে।

***মীমাংসাসর্বস্ব* :** এই গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার প্রারম্ভে ভারতীয় দর্শন ও বেদ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর দর্শনশাস্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও দর্শন সম্প্রদায়ের আলোচনা, *মীমাংসাদর্শন* গ্রন্থের বিষয়বস্তু, মীমাংসা শব্দের অর্থ, *মীমাংসাদর্শনের* প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়, *মীমাংসাদর্শনের* ভাষ্যগ্রন্থ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলির আলোচনাপূর্বক *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস, *মীমাংসাসর্বস্বের*

বৈশিষ্ট্য ও *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

***পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি* বা *হলায়ুধবৃত্তি* :** এই গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাকালে সর্বপ্রথমে বেদাঙ্গশাস্ত্রের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর ছন্দঃশাস্ত্রের বেদাঙ্গত্ব বিচার ও ছন্দঃশাস্ত্রের বৃত্তিকার হলায়ুধের পরিচয়, *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের* আলোচনা, *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* উপযোগিতা, বৃত্তির বৈশিষ্ট্য, *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তির* গুরুত্ব, রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়টিকে মূলত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব* ও *হলায়ুধবৃত্তি* – এই তিনটি গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

গবেষণা-সন্দর্ভের **চতুর্থ অধ্যায়ের** নামকরণ করা হয়েছে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির মূল্যায়ন। এই অধ্যায়ে মূলত সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টের সাহিত্যকৃতিরই বিভিন্ন দিক সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যজগতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় আচার্য হলায়ুধের অবদান, আচার্য হলায়ুধের রচনায় পূর্বাচার্যদের প্রভাব এবং পরবর্তী সাহিত্যে আচার্য হলায়ুধভট্টের রচনার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা এই গবেষণা-সন্দর্ভের মুখ্য বিষয়। এই অধ্যায়ে লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী আচার্য হলায়ুধভট্টের (তৃতীয় অধ্যায়ের নির্বাচিত) তিনটি গ্রন্থেরই সাহিত্যিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবি আচার্য হলায়ুধভট্টের

সাহিত্যকৃতি এই গবেষণা-সন্দর্ভের মুখ্য বিষয় নয়। তাঁর জন্য পৃথক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভের **উপসংহারে** কোন অধ্যায়ে কি কি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তার সামগ্রিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা-সন্দর্ভের **নির্ঘণ্টতে** আচার্য হলায়ুধের রচিত *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের উদ্ধৃতি, *ব্রাহ্মণসর্বস্বে* উদ্ধৃত পূর্বাচার্যদের উদ্ধৃতি, *মীমাংসাসর্বস্বের* সূত্রসমূহ, *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের* সূত্রসমূহের বর্ণানুক্রমিক উপস্থাপন করা হয়েছে।

## নূতন দিগ্‌দর্শন (New Findings):

সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণার ক্ষেত্রে আচার্য হলায়ুধের সারস্বতকৃতি একটি স্বল্পালোচিত বিষয়। এই স্বল্পালোচিত সারস্বতকৃতিকেই গবেষণার বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচন করে বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে ঐতিহাসিক তথ্যাদির ভিত্তিতে একাধিক হলায়ুধের অস্তিত্ববিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। নানাবিধ তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যেমন একদিকে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা তৃতীয় কৃষ্ণের সভাকবিরূপে হলায়ুধের সাহিত্যকৃতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তেমনই অপর দিকে বঙ্গদেশীয় সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের ঐতিহাসিক পরিচিতির ভিত্তিতে তাঁরও সাহিত্যকর্মের উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া রাজা লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত পৃথক একজন হলায়ুধ যিনি হলায়ুধমিশ্র নামে পরিচিত, তাঁরও রচনার কথা প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণা-সন্দর্ভে হলায়ুধের নামাঙ্কিত যাবতীয় উপলব্ধ গ্রন্থ এবং উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সামান্য পরিচয় উপস্থাপন করে তাদের গ্রন্থকর্তৃত্বের নিশ্চয়তা প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কয়েকজন হলায়ুধের মধ্য

থেকে বঙ্গদেশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত আচার্য হলায়ুধরচিত তিনটি গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাকেই বর্তমান গবেষণাসন্দর্ভে অধিক পরিমাণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি গ্রন্থ হল *ব্রাহ্মণসর্বস্ব*, *মীমাংসাসর্বস্ব* এবং পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রের *মৃতসঞ্জীবনীবৃত্তি*। তাঁর নামাঙ্কিত এই গ্রন্থগুলিই বর্তমানে উপলব্ধ এবং এগুলির সবকটিই বেদসংক্রান্ত গ্রন্থ। বৈদিক সাহিত্যের কোন কোন শ্রেণীর সঙ্গে তারা সম্পর্কযুক্ত, তা প্রদর্শন করার চেষ্টা করা হয়েছে। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের অন্যান্য গ্রন্থগুলির পরিচয় স্বপ্রদত্ত ও অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত, কিন্তু তাদের মুদ্রিত ও প্রকাশিত রূপ অনুপলব্ধ। তাই শুধুমাত্র উপলব্ধ গ্রন্থগুলিরই পর্যালোচনার মাধ্যমে সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধের সংস্কৃত সাহিত্য জগতে অবদান ও রচনানৈপুণ্য বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে সাধ্যমত উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা অংশে গবেষণা-পদ্ধতিগত যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি এখানে যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করা হয়েছে। এখন এই গবেষণা-সন্দর্ভটি বিদ্বদ্‌বর্গের সকাশে গুণমান বিচারের জন্যে সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

.....

# নির্ঘণ্ট

## *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থের উদ্ধৃতি :


অত্রবেদমন্ত্রব্যাখ্যাপরত্বাৎগ্রন্থস্য বলীনাশ্চ বৈদিকমন্ত্রশূন্যত্বাৎ বলযো ন ব্যাখ্যাতাঃ। পৃষ্ঠা. ১৫৭

অত্র যদ্যপি সূর্যাদিদেবতাপুজাসু পৌরাণিকাদিমন্ত্রা বহব এব সংবিহিতাঃ সন্তি তথাপ্যস্মাভির্বৈদিকমন্ত্রব্যাখ্যানস্যোপক্রান্তত্বাত্তৎপ্রসঙ্গেনৈবানুষ্ঠানাভিধাম্। তাৎপর্যং তু বৈদিকমন্ত্রব্যাখ্যায়ামেব। পৃষ্ঠা. ১৫৭

অত্রৈকদেশপদেন যাবদনুষ্ঠানোপযুক্তবেদভাগোঽপেক্ষিতঃ। পৃষ্ঠা. ১৬১

অশ্বশব্দঃ স্বামীবচনঃ, ককারঃ কুৎসাযাম্, কুস্বামীত্যর্থঃ। পৃষ্ঠা. ১৬৭

অস্য মন্ত্রস্যাশ্বমেধে পত্নীবাচনে বিনিযোগে সত্যপি মন্ত্রলিঙ্গাশ্চণ্ডিকাপূজাযাং বিনিযোগ উচ্যতে। অনেন মন্ত্রেণ সৌভাগ্যকামযা স্ত্রিযা ভগবতী পূজ্যতে। পৃষ্ঠা. ১৬৬

অস্যাঘমর্ষণস্য ব্যাখ্যানমাচরিতুং হৃদি প্রকম্পো জাযতে যতঃ
সর্ববেদসারভূতোঽত্যন্তগুপ্তশ্চাযং মন্ত্রঃ। অস্য পদপাঠমাত্রঞ্চ নাস্তি
ব্রাহ্মণনিরুক্তাদিকমপ্যস্য নাস্তি। ইত্থমেতদীযব্যাখ্যানানুগুণং কমপ্যুপাযমপ্রাপ্য যদেতদস্য স্বকপোলমাত্রেণ ব্যাখ্যানমাচরণীযং তদতিসাহসম্। পৃষ্ঠা. ১৩৮

আসন্ বা কতি সন্তি বা কতি ন কিং ক্ষ্মামণ্ডলে পণ্ডিতা ব্যাখ্যাতো
মতিশালিনাঽযমুবটাচার্যেণ বেদঃ পরম্। অস্পষ্ট তদপীত্যনেন বিদূষা বিশ্বপ্রসিদ্ধৈঃ পদৈঃ সন্ধ্যাদিদ্বিজকর্মমন্ত্রবচসাং ব্যাখ্যানমেতৎ কৃতম্।। পৃষ্ঠা. ১৬৬

ইত্যাবসথিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ-শ্রীহলায়ুধকৃতৌ ব্রাহ্মণসর্বস্বে সহস্রশীর্ষাব্যাখ্যা।। পৃষ্ঠা. ৫০, ৬৬

ইত্থমেকদেশাধ্যয়নে কর্তব্যে সংশয়ঃ কিং স্বেচ্ছযা যঃ কশ্চিদেকো ভাগোঽধ্যেতব্যঃ। কিং তৃতীয়ো ভাগশ্চতুর্থো বাঽধ্যেতব্য উত্তানুষ্ঠানোচিতভাগো বা। পৃষ্ঠা. ১৬১

উৎকলপ্রাশ্চাত্ত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্ত্বধ্যয়নং বিনা ক্রিয়দেব বেদার্থস্য কর্মমীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞেতিকর্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে। পৃষ্ঠা. ১৫৮

উভযোরপি গ্রন্থার্থতো বেদজ্ঞানং নাস্ত্যেব। পৃষ্ঠা. ১৫৮

একদেশোঽপ্যধ্যেতব্যো যদি সর্বো ন শক্যতে। পৃষ্ঠা. ১৬০

এতেনৈতদুক্তং ভবতি–যথা প্রুশ্নি পর্ণী শৈবলং চ প্রসিদ্ধমেব মূলেন ক্বচিদপ্যসংলগ্নং জলোপরিস্থিতং সৎ ক্ষুদ্রবাতাদিপ্রেরণমাত্রেণাপ্যপগচ্ছতি তথা জরাযু সুখেনাপগচ্ছতু। পৃষ্ঠা. ১৭০

এষা যদ্যপি বৈষ্ণবসর্বস্ব এব তত্তদ্বিশেষেণ প্রতিপাদিতা তথাপি

পুরুষসূক্তব্যাকারপ্রসঙ্গাদেতদীয়মাহাত্ম্যং পুনরিহাপি কিঞ্চিদভিধীয়তে। পৃষ্ঠা. ৫৫, ৬৪

জলস্যোপরিস্থিতশৈবালবদান্তরাবযবাসম্বদ্ধম্। পৃষ্ঠা. ১৭০

তদ্বরং বেদৈকদেশস্যাপি যথাবিধ্যধ্যয়নং কৃত্বাঽর্থবিচারাঃ ক্রিয়তে। পৃষ্ঠা. ১৬০

তদ্বরং সন্ধাস্নানাদ্যাহ্নিকগর্ভাধানাদিসংস্কারাগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্তমন্ত্রভাগ এবাধ্যেতুং যুজ্যতে। পৃষ্ঠা. ৫২

তদেবং ব্যবস্থিতে শাস্ত্রার্থে কৃৎস্নবেদাধ্যয়নাসমর্থানাং রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রকদ্বিজাতীনাং কান্বশাখীবাজসনেয়ীনাং কর্মানুষ্ঠানার্থং....গ্রাহ্যকর্মোপযুক্তমন্ত্রব্যাখ্যা প্রস্তোতব্যা। পৃষ্ঠা. ১৬২

ত্রিদিবাভরণং কালত্রযহেতুস্ত্রযীমযঃ। ত্রিবর্গপ্রাপ্তিসরণিস্তরণিঃ শ্রেযসেঽস্তু বঃ।। পৃষ্ঠা. ১২৪

ত্রিলোকপূজ্যাং নমতি ত্রিসন্ধ্যং যাং ত্রিলোচনঃ। ত্রিবর্গফলনির্মাত্রীং গাযত্রীং তামুপাস্মহে।। পৃষ্ঠা. ১২৫

দত্ত্বার্থরূপং প্রথমমদত্তমপরৈর্ভুবি। পৃষ্ঠা. ১৩৭, ১৬৩

দধানং চতুরাম্নাযপূতাং মুখচতুষ্টযীম্। মুনিমাদ্যং নমামস্তং পঙ্কজোটজবাসিনম্।। পৃষ্ঠা. ১২৪

দীপবদ্দ্যোতয়তি যো ভুর্ভূবঃস্বর্জগত্রয়ীম্ সবিতুস্তং বয়ং ভর্গমপবর্গকরং স্তুমঃ।। পৃষ্ঠা. ১১১, ১২৪

নিবন্ধেন সমেতাং যৎ পাকযজ্ঞস্য পদ্ধতিম্ জ্যেষ্ঠঃ পশুপতিশ্চক্রে তেনাস্মাভির্ন সা কৃতা। অন্ত্যেষ্টিকর্মণো মন্ত্রা ব্যাখ্যাতাঃ খ্যাতকীর্তিনা। পৃষ্ঠা. ৬০, ১১১

ন শুদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে। যস্য বিপ্রস্য তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে।। পৃষ্ঠা. ১২১

পাকযজ্ঞপদ্ধতিশ্চ সনিবন্ধাঽস্মজ্জ্যেষ্ঠাবসথিক-পশুপতিকৃতাঽস্ত্যেব। সৈব লোকেঽতিপ্রসিদ্ধা। অতোঽস্মাভিরস্মিন বিষযে পদ্ধতির্ন কৃতা। পৃষ্ঠা. ৫০, ৫১

পাত্রং দারুময়ং ক্বচিদ্বিজযতে হৈমং ক্বচিদ্ভাজনং কুত্রাপ্যস্তি দুকূলমিন্দূধবলং কৃষ্ণাজিনং ক্বাপি চ। ধুমঃ ক্বাপি বষট্কৃতাহুতিকৃতো ধূমঃ পরঃ কাপ্যভূদগ্নেঃ কর্মং ফলং চ তস্য যুগপজ্জাগর্তি যন্মন্দিরে।। পৃষ্ঠা. ৪৬, ৫০, ১১৫

বংশো বাৎস্যমুনের্মুনেরিব সদাচারস্য বিশ্রামভুর্ধর্মাধ্যক্ষধনঞ্জয়ঃ সমজনি জ্যায়ান্ পরজ্যোতিষঃ। পৃষ্ঠা. ১১২

বাঞ্ছাতিক্রমসম্ভবেঽপি বিভবে জ্যোতির্জটালান মণীন হিত্বা যস্য জগন্নমযস্যমহসো জাগর্তি কোষঃ কুশঃ। অপ্যেতস্য বিলঙ্ঘ্য শৈলসদৃশঃ প্রাগ্দ্বারবদ্ধান দ্বিপান্ দূরোদ্দণ্ডিতযজ্ঞযূপবৃষভোৎকর্ষেণ হর্ষোঽভবৎ।। পৃষ্ঠা. ৫০, ১১৩

বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বলচ্ছত্রোৎসক্তমহামহত্তকপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে। যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ শ্রীমাল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতির্ধর্মাধিকারং দদৌ।। পৃষ্ঠা. ৪৯, ৫৩, ১১৫

বিষ্ণুপদসম্বন্ধেন ভুমিরতীব শুদ্ধেতি ভূমিস্তুতিঃ। ইত্থং স্তুতা ভূমির্মাং পাবযত্বিত্যভিপ্রেত্য ভূদ্গ্রহণামনেন ক্রিযতে। পৃষ্ঠা. ১৬৬

ভ্রাতা পদ্ধতিমগ্রজঃ পশুপতিঃ শ্রাদ্ধাদিকৃত্যে ব্যধাদীশানঃ কৃতবান্ দ্বিজাহ্নিকবিধৌ জ্যেষ্ঠোঽপরঃ পদ্ধতিস্ম। তেনাস্মিন্নমুনা ফলস্তুতিপরাঃ প্রস্তুত্য নানাস্মৃতীঃ সন্ধ্যাদি-দ্বিজকর্ম্ম-মন্ত্রবচসাং ব্যাখ্যা পরং খ্যাপিতা।। পৃষ্ঠা. ৫১, ১১৪

যদা তু শনৈশ্চরপূজাযামস্য বিনিযোগস্তদা অভিষ্ঠযে অপেক্ষিতফলাবাপ্তযে। যদা শ্রাদ্ধে তদা পীতযে পিতৃণাং পানাযেতি বিশেষো বোদ্ধব্যঃ। পৃষ্ঠা. ১৬৬

যদি বা পাঠক্রমানুরোধেন প্রথমভাগ একোঽধীযতে তদা তস্মিন্ ভাগে সন্ধ্যাস্নানাদ্যাহ্নিকগর্ভাধানাদিক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্তমন্ত্রাণাং সর্বেষামসম্ভবাৎ তদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতি। তদ্বরং সন্ধ্যাস্নানাদ্যাহ্নিকগর্ভাধানাদিক্রিয়াকাণ্ডোপযুক্তমন্ত্রভাগ এবাধ্যেতুং যুজ্যতে। অস্যৈবাধ্যযনেন বেদস্যৈকদেশাধ্যয়নং পর্যবস্যতি। পৃষ্ঠা. ১৬১

যস্মিন জুহুতি জাতবেদসি হবির্ব্যোমাঙ্গনব্যাপিভিঃ.... পৃষ্ঠা. ৫০

যাজ্ঞবল্ক্য-মৎস্যপুরাণাদাবস্য মন্ত্রস্য ভৌমপূজাযামুপযোগাদ্ভৌম-প্রকাশকত্বশ্রুতিঃ প্রতীযতে। অতোঽযমিতি পদেন ভৌমোঽভিধীযতে।। পৃষ্ঠা. ১৬৮

যোঽতিতীক্ষ্ণবুদ্ধিত্বাদল্পসমযেনৈব বেদত্রযমভ্যস্যতি তেন তদভ্যাসানন্তরমেব সমাবর্তনং কর্তব্যম্... পৃষ্ঠা. ৫২

লব্ধ জন্ম ধনঞ্জয়াদ্গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতেরাবৃত্যা সদৃশী নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা। শব্দব্রহ্ম করোদরামলকবদ্ভোগোত্তরা সৎক্রিয়েত্যস্তি প্রার্থয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্।। পৃষ্ঠা. ৫২, ১১৪

শ্রীমতোঽবন্তিনাথস্য বিক্রমার্কস্য ভূপতেঃ। ধর্মাধ্যক্ষো হরিস্বামী ব্যাখ্যচ্ছাতপথী শ্রুতিম্।। পৃষ্ঠা. ৫৪

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্বতস্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ পৃষ্ঠা. ১২০

সূক্ষ্মাববোধকমদৃষ্টবিকাশকারি নিস্তারকং কিমপি... পৃষ্ঠা. ৫৬

হলায়ুধেন গৌড়েন্দ্রধর্মাগারাধিকারিণা। এতৎ পুরুষসূক্তস্য ব্যাখ্যানং প্রতিপাদ্যতে।। পৃষ্ঠা. ৬৬

## হলায়ুধের *ব্রাহ্মণসর্বস্ব* গ্রন্থে উপলব্ধ পূর্বাচার্যদের উদ্ধৃতি :

আসন্ বা কতি সন্তি বা কতি ন কিং ক্ষ্মামণ্ডলে পণ্ডিতা ব্যাখ্যাতো

মতিশালিনাঽযমুবটাচার্যেণ বেদঃ পরম্। অস্পষ্ট তদপীত্যনেন বিদূষা বিশ্বপ্রসিদ্ধৈঃ পদৈঃ

সন্ধ্যাদিদ্বিজকর্মমন্ত্রবচসাং ব্যাখ্যানমেতৎ কৃতম্।। পৃষ্ঠা. ২৪৮

প্রপূর্বঃ সুবতিরভ্যনুজ্ঞানে বর্তত ইত্যুবটেন লিখিতম্। পৃষ্ঠা. ২৪৭

প্রপূর্বঃ সুবতিরভ্যনুজ্ঞানে বর্তত ইত্যুবটো গুণবিষ্ণুশ্চ। পৃষ্ঠা. ২৪৭

ব্যাখ্যাতো মতিশালিনাঽযমুবটাচার্যেণ বেদঃ পরম্... পৃষ্ঠা. ২৪৭

উবটপ্রভৃতিভির্যজুর্বেদভাষ্যকারৈর্বিনিযোগো ব্যাখ্যাতঃ। পৃষ্ঠা. ২৪৭

মীমাংসাব্যবসাযিভিঃ স্মৃতিপরামর্শপ্রকর্ষস্থিতৈঃ গাযত্রী দ্বিজপুরুষৈঃ কতি কিযৎকৃত্বো ন বা ব্যাকৃতা। পৃষ্ঠা. ২৪৮

## *মীমাংসাসর্বস্ব* গ্রন্থের উদ্ধৃত সূত্রসমূহ :

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা (সূত্র - ১.১.১) পৃষ্ঠা. ১৮২, ১৮৬

আম্নাযস্য ক্রিযার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে (সূত্র - ১.২.১) পৃষ্ঠা. ১৮৬

চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ (সূত্র - ১.১.২) পৃষ্ঠা. ১৮২, ১৮৩, ১৮৬

তস্য নিমিত্তং পরীষ্টিঃ (সূত্র - ১.১.৩) পৃষ্ঠা. ১৮৪

ধর্মস্য শব্দমূলত্বাদশব্দমনপেক্ষ স্যাৎ (সূত্র - ১.৩.১) পৃষ্ঠা. ১৮৭

বিধির্বা স্যাদপূর্বত্বাদ্বাদমাত্রং হ্যনর্থকম্ (সূত্র - ১.২.১৯) পৃষ্ঠা. ১৮৬

বেদাংশৈচকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ (সূত্র - ১.১.২৭) পৃষ্ঠা. ১৮৫

সৎসম্প্রয়োগে... (সূত্র - ১.১.৪) পৃষ্ঠা. ১৮৪

হেতুদর্শনাচ্চ (সূত্র - ১.৩.৪) পৃষ্ঠা. ১৮৭

## *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্র* গ্রন্থের উদ্ধৃত সূত্রসমূহ :

অক্ষরপঙক্তিঃ পঞ্চকাশ্চত্বারঃ (সূত্র - ৩.৪৪) পৃষ্ঠা. ২৩০

অগ্নিঃ সবিতা সোমো বৃহস্পতির্মিত্রাবরুণাবিন্দো বিশ্বদেবা দেবতাঃ (সূত্র - ৩.৬৩) পৃষ্ঠা. ২৩৪

অগ্নিবেশ্য কাশ্যপগৌতমাঙ্গিরসভার্গবকৌশিকবাশিষ্ঠানি গোত্রাণি (সূত্র - ৩.৬৬) পৃষ্ঠা. ২৩৪

অত্রানুক্তং গাথা (সূত্র - ৮.১) পৃষ্ঠা. ২৩৯

অনুষ্টুপ্ গাযত্রৈঃ (সূত্র - ৩.২৩) পৃষ্ঠা. ২২৭

অযুক্তৃতীযেনোদীচ্যবৃত্তিঃ (সূত্র - ৪.৩৮) পৃষ্ঠা. ২১৪

আদিতঃ সন্দিগ্ধে (সূত্র - ৩.৬১) পৃষ্ঠা. ২৩৩

আদ্যং চতুষ্পাদৃতুভিঃ (সূত্র - ৩.৮) পৃষ্ঠা. ২২৪

আসুরী পঞ্চদশ (সূত্র - ২.৪) পৃষ্ঠা. ২২০

আস্তারপঙক্তিঃ পরতঃ (সূত্র - ৩.৪০) পৃষ্ঠা. ২৩০

অষ্টৌ বসবঃ ইতি (সূত্র - ১.১৫) পৃষ্ঠা. ২১৯

ইযাদিপূরণঃ (সূত্র - ৩.২) পৃষ্ঠা. ২২৩, ২৩৭

উপরিষ্টাদ্বৃহত্যন্তে (সূত্র - ৩.৩১) পৃষ্ঠা. ২২৮

উপরিষ্টাজ্জ্যোতিরন্ত্যেন (সূত্র - ৩.৫৪) পৃষ্ঠা. ২৩২

উরোবৃহতী যাস্কস্য (সূত্র - ৩.৩০) পৃষ্ঠা. ২২৮

উষ্ণিগ্গাযত্রৌ জাগতশ্চ (সূত্র - ৩.১৮) পৃষ্ঠা. ২২৬

ঊনাধিকৈনৈকেন নিচৃদ্ভুরিজৌ (সূত্র - ৩.৫৯) পৃষ্ঠা. ২৩৩

ঋচাং ত্রিঃ (সূত্র - ২.৮) পৃষ্ঠা. ২২১

একদ্বিত্রিচতুষ্পাদুক্তপাদম্ (সূত্র - ৩.৭) পৃষ্ঠা. ২২৪

একস্মিন্ পঞ্চকে ছন্দঃ শঙ্কুমতী (সূত্র - ৩.৫৫) পৃষ্ঠা. ২৩২

একেন ত্রিষ্টুপ্ জ্যোতিষ্মতী (সূত্র - ৩.৫০) পৃষ্ঠা. ২৩১

একোনেঽধ্বা (সূত্র - ৮.৩৩) পৃষ্ঠা. ২৩৯

একৈকং শেষে (সূত্র - ২.১২) পৃষ্ঠা. ২২১

ককুম্মধ্যে চেদন্ত্যঃ (সূত্র - ৩.১৯) পৃষ্ঠা. ২২৬

কদাসজ্ (সূত্র - ১.৬) পৃষ্ঠা. ২১৮

কাগুহার্ (সূত্র - ১.৩) পৃষ্ঠা. ২১৮

কিংবদভ্ (সূত্র - ১.৭) পৃষ্ঠা. ২১৮

ক্বচিৎ ত্রিপাদৃষিভিঃ (সূত্র - ৩.৯) পৃষ্ঠা. ২২৫

ক্বচিন্নবকাশ্চত্বারঃ (সূত্র - ৩.৩৩) পৃষ্ঠা. ২২৯

গন্তে (সূত্র - ১.১০) পৃষ্ঠা. ২১৯

গাযত্র্যা বসবঃ (সূত্র - ৩.৩) পৃষ্ঠা. ২২৩, ২২৬, ২২৮

গাযত্রী (সূত্র - ২.২) পৃষ্ঠা. ২২০

গ্লৌ (সূত্র - ১.১৪) পৃষ্ঠা. ২১৯

গৃল্ (সূত্র - ১.৯) পৃষ্ঠা. ২১৮

চতুরশ্চতুরস্ত্যজেদুৎকৃতেঃ (সূত্র - ৪.২) পৃষ্ঠা. ২৩৪

চতুরশ্চতুরঃ প্রাজাপত্যাযাঃ (সূত্র - ২.১১) পৃষ্ঠা. ২২১

চতুষ্পাদৃষিভিঃ (সূত্র - ৩.২২) পৃষ্ঠা. ২২৭

চতুষ্ক ষটকৌ ত্রযশ্চ (সূত্র - ৩.৪৭) পৃষ্ঠা. ২৩১

চতুঃশতমুৎকৃতিঃ (সূত্র - ৪.১) পৃষ্ঠা. ২৩৪

ছন্দঃ (সূত্র - ২.১) পৃষ্ঠা. ২২০

জগতী ষডভিঃ (সূত্র - ৩.৪৯) পৃষ্ঠা. ২৩১

জগত্যা আদিত্যাঃ (সূত্র - ৩.৪) পৃষ্ঠা. ২২৪

জহ্যাদাসুরী (সূত্র - ২.১৩) পৃষ্ঠা. ২২২

তথা জগতী (সূত্র - ৩.৫১) পৃষ্ঠা. ২৩১

তান্যভিসংব্যাপ্রেভ্যঃ কৃতিঃ (সূত্র - ৪.৩) পৃষ্ঠা. ২৩৪

তান্যুষ্ণিগনুষ্টুব্বৃহতী পঙক্তি ত্রিষ্টুব্জগত্যঃ (সূত্র - ২.১৪) পৃষ্ঠা. ২২২

তিস্রস্তিস্রঃ সনাম্ন্য একৈকা ব্রাহ্ম্যঃ (সূত্র - ২.১৫) পৃষ্ঠা. ২২২

তৃতীযং দ্বিপাজ্জাগতগাযত্রাভ্যাম্ (সূত্র - ৩.১৬) পৃষ্ঠা. ২২৬

ত্রিপাৎক্বচিজ্জাগতাভ্যাং চ (সূত্র - ৩.২৪) পৃষ্ঠা. ২২৭

ত্রিপাৎ ত্রৈষ্টুভৈঃ (সূত্র - ৩.১৭) পৃষ্ঠা. ২২৬

ত্রিপাদনিষ্ট মধ্যা পিপীলিক মধ্যা (সূত্র - ৩.৫৭) পৃষ্ঠা. ২৩৩

ত্রিভির্জাগতৈর্মহাবৃহতী (সূত্র - ৩.৩৫) পৃষ্ঠা. ২২৯

ত্রিষ্টুভো রুদ্রাঃ (সূত্র - ৩.৬) পৃষ্ঠা. ২২৪

ত্রীংস্ত্রীনৃচাম্ (সূত্র - ২.১০) পৃষ্ঠা. ২২১

দেবতাদিতশ্চ (সূত্র - ৩.৬২) পৃষ্ঠা. ২৩৩

দৈব্যেকম্ (সূত্র - ২.৩) পৃষ্ঠা. ২২২

দ্বাদশশ্চ বানবাসিকা (সূত্র - ৪.৪৩) পৃষ্ঠা. ২১৪

দ্বাবপ্যল্পশঃ (সূত্র - ৩.৪৫) পৃষ্ঠা. ২৩০

দ্বাভ্যাং বিরাট স্বরাজৌ (সূত্র - ৩.৬০) পৃষ্ঠা. ২৩৩

দ্বিতীয়ং দ্বিতীয়মতিতঃ (সূত্র - ৪.৭) পৃষ্ঠা. ২৩৫

দ্বৌ দ্বৌ সান্নাং বর্ধেত (সূত্র - ২.৯) পৃষ্ঠা. ২২১

দ্বৌ নবকৌ ষটকশ্চ নাগী (সূত্র - ৩.১২) পৃষ্ঠা. ২২৫

ধ্রাদিপরঃ (সূত্র - ১.১১) পৃষ্ঠা. ২১৯

ধীশ্রীস্ত্রীম্ (সূত্র - ১.১) পৃষ্ঠা. ২১৭

ধৃত্যষ্টিশক্করীজগত্যঃ (সূত্র - ৪.৫) পৃষ্ঠা. ২৩৫

নহসন (সূত্র - ১.৮) পৃষ্ঠা. ২১৮

ন্যঙ্কুসারিণী দ্বিতীযঃ (সূত্র - ৩.২৮) পৃষ্ঠা. ২২৮

পঞ্চমেন পূর্বঃ সাকং প্রাচ্যবৃত্তিঃ (সূত্র - ৪.৩৭) পৃষ্ঠা. ২১৪

পথ্যা পূর্বশ্চেত্তৃতীযঃ (সূত্র - ৩.২৭) পৃষ্ঠা. ২২৮

পথ্যা পঞ্চভির্গাযত্রৈঃ (সূত্র - ৩.৪৮) পৃষ্ঠা. ২৩১

পরোষ্ণিক পরঃ (সূত্র - ৩.২১) পৃষ্ঠা. ২২৭

পাদঃ (সূত্র - ৩.১) পৃষ্ঠা. ২২৩

পঙ্ক্তির্জাগতৌ গাযত্রৌ চ (সূত্র - ৩.৩৭) পৃষ্ঠা. ২২৯

পদপঙক্তিঃ পঞ্চ (সূত্র - ৩.৪৬) পৃষ্ঠা. ২৩১

পুরউষ্ণিক পুরঃ (সূত্র - ৩.২০) পৃষ্ঠা. ২২৭

পূর্বৌ চেদযুজে সতঃ পঙক্তিঃ (সূত্র - ৩.৩৮) পৃষ্ঠা. ২৩০

পুরস্তাদ্বৃহতী পুরঃ (সূত্র - ৩.৩২) পৃষ্ঠা. ২২৯

পুরস্তাজ্জ্যোতিঃ প্রথমেন (সূত্র - ৩.৫২) পৃষ্ঠা. ২৩১

পৃথক্ পৃথক্ পূর্বত এতান্যেবৈষাম্ (সূত্র - ৪.৬) পৃষ্ঠা. ২৩৫

প্রস্তারপঙক্তিঃ পুরতঃ (সূত্র - ৩.৪১) পৃষ্ঠা. ২৩০

প্রকৃত্যা চোপসর্গবর্জ্জিতঃ (সূত্র - ৪.৪) পৃষ্ঠা. ২৩৫

প্রমিতাক্ষরা জৌসৌ (সূত্র - ৬.৩৬) পৃষ্ঠা. ২৩৯

প্রাগ্যজুষামার্ষ্য ইতি (সূত্র - ২.১৬) পৃষ্ঠা. ২২২

প্রাজাপত্যাষ্টৌ (সূত্র - ২.৫) পৃষ্ঠা. ২২০

বরাসায্ (সূত্র - ১.২) পৃষ্ঠা. ২১৮

বসুধাস্ (সূত্র - ১.৪) পৃষ্ঠা. ২১৮

বিপরীতা যবমধ্যা (সূত্র - ৩.৫৮) পৃষ্ঠা. ২৩৩

বিপরীতা বারাহী (সূত্র - ৩.১৩) পৃষ্ঠা. ২২৫

বিপরীতা প্রতিষ্ঠা (সূত্র - ৩.১৫) পৃষ্ঠা. ২২৬

বিপরীতৌ চ (সূত্র - ৩.৩৯) পৃষ্ঠা. ২৩০

বিরাজো দিশঃ (সূত্র - ৩.৫) পৃষ্ঠা. ২২৪

বিস্তারপঙ্ক্তিরন্তঃ (সূত্র - ৩.৪২) পৃষ্ঠা. ২৩০

বৈরাজী গাযত্রৌ চ (সূত্র - ৩.৩৪) পৃষ্ঠা. ২২৯

বৃহতী জাগতস্ত্রযশ্চ গাযত্রাঃ (সূত্র - ৩.২৬) পৃষ্ঠা. ২২৮, ২২৯

ভুজগশিশুভৃতা নৌম্ (সূত্র - ৬.৭) পৃষ্ঠা. ২৩৯

মধ্যেঽন্ত্যে চ (সূত্র - ৩.২৫) পৃষ্ঠা. ২২৭

মধ্যেজ্যোতির্মধ্যমেন (সূত্র - ৩.৫৩) পৃষ্ঠা. ২৩২

যজুষাং ষট্ (সূত্র - ২.৬) পৃষ্ঠা. ২২০

যুগপরান্তিকা (সূত্র - ৪.৪১) পৃষ্ঠা. ২১৪

লৌসঃ (সূত্র - ১.১৩) পৃষ্ঠা. ২১৯

ষট্কসপ্তকযোর্মধ্যেঽষ্টাবতিপাদনিচৃৎ (সূত্র - ৩.১১) পৃষ্ঠা. ২২৫

ষট্কসপ্তকাষ্টকৈর্বর্ধমানা (সূত্র - ৩.১৪) পৃষ্ঠা. ২২৫

ষট্কৈ ককুদ্মতী (সূত্র - ৩.৫৬) পৃষ্ঠা. ২৩২

সতোবৃহতী তাণ্ডিনঃ (সূত্র - ৩.৩৬) পৃষ্ঠা. ২২৯

সংস্তারপঙক্তির্বহিঃ (সূত্র - ৩.৪৩) পৃষ্ঠা. ২৩০

সাতেক্বৎ (সূত্র - ১.৫) পৃষ্ঠা. ২১৮

সাম্নাং দ্বিঃ (সূত্র - ২.৭) পৃষ্ঠা. ২২১

সা পাদনিচৃৎ (সূত্র - ৩.১০) পৃষ্ঠা. ২২৫

সিতসারঙ্গপিশঙ্গকৃষ্ণনীললোহিতগৌরা বর্ণাঃ (সূত্র - ৩.৬৫) পৃষ্ঠা. ২৩৪

স্কন্ধোগ্রীবী ক্রৌষ্টুকৈঃ (সূত্র - ৩.২৯) পৃষ্ঠা. ২২৮

স্বরাঃ ষডজাদয়ঃ (সূত্র - ৩.৬৪) পৃষ্ঠা. ২৩৪

হে (সূত্র - ১.১২) পৃষ্ঠা. ২১৯

# ग्रन्थपञ्जि

## सस्कृत-पुस्तकमाला :


*क्रियानिघण्टु*। उमाकान्तभट्टः (सम्पा.)। मेलुकोट : श्रीवेदवेदान्तबोधिनी संस्कृतमहापाठशाला, २००० (प्र. सं.)

गङ्गादास, *छन्दोमञ्जरी*। ब्रह्मानन्द-त्रिपाठी. (सम्पा.). वाराणसी : चौखाम्वा सुरभारती प्रकाशन, २०१५

चण्डेश्वर-ठक्कुर, *विवादरत्नाकर:*। कमलकृष्ण स्मृतितीर्थ (सम्पा.)। दिल्ली : ओरियंटल बुक सेन्टर, २०४६ (वि. सं.)

चण्डेश्वर-ठक्कुर, *गृहस्थरत्नाकरः*। कमलकृष्ण स्मृतितीर्थ (सम्पा.)। कलकाता : एशियाटिक सोसाइटि, १९२८

चण्डेश्वर-ठक्कुर, *कृत्यरत्नाकरः*। कमलकृष्ण स्मृतितीर्थ (सम्पा.)। कलकाता : एशियाटिक सोसाइटि, १९२५

जगदीशचन्द्रमिश्रः। *वैदिकवाङ्मयस्येतिहासः*, सम्पा. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी। वाराणसी : चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०२१

पिङ्गलाचार्यः। *छन्दःशास्त्रम्, हलायुधभट्टविरचितया मृतसञ्जीवनी, मधुसूदनसरस्वतीप्रणीतया छन्दोनिरुक्तिश्च*। सम्पा. अनन्तकृष्ण-शर्मा। दिल्ली : परिमल पब्लिकेशन्स, २००१

पिङ्गलाचार्यः। *छन्दःशास्त्रम्*। सम्पा. पण्डित केदारनाथ। न्यु दिल्ली : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, २००२ (पु. मु.)

पाण्डेय, उमेशचन्द्र (सम्पा.)। गौतमधर्मसूत्रम्। वाराणसी: चौखम्वा संस्कृत संस्थान, २००५ (५म सं)

पिङ्गलाचार्यः। *छन्दःशास्त्रम्*। सम्पा. पण्डित केदारनाथ। न्यु दिल्ली : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, २००२ (पु. मु.)

वल्लालसेनः। *दानसागरः*। सम्पा. भवतोष भट्टाचार्य। कलकाता : दि एशियाटिक सोसाइटि, १९५३

वल्लालसेनः। *अद्भुतसागरः*। सम्पा. मुरलीधर-झा। काशी : प्राभाकरी-यन्त्रालय, १९०५

वेदव्यास, *श्रीमद्देवीभागवतमहापुराण* (द्वितीय खण्ड)। गोरखपुर : गीताप्रेस, २०६७

भट्ट, लक्ष्मीनाथ (सम्पा.)। *प्राकृतपिङ्गलसूत्राणि*। न्यु दिल्ली : निर्णयसागर प्रेस, १८९४

ভট্টাচার্য, দুর্গামোহন (সম্পা.)। *ছান্দোগ্যব্রাহ্মণম*। কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৫৮

মম্মট। *কাব্যপ্রকাশঃ*। হরিশঙ্কর-শর্মা. (সম্পা.)। বারাণসী : চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ১৯৮২ (পঞ্চম সংস্করণ)।

মিশ্র, জয়কৃষ্ণ। *ধর্মশাস্ত্রস্যেতিহাসঃ*। প্রথমভাগঃ বারাণসী : চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ ওফিস, ২০১৪

মিশ্র, রামচন্দ্র. (সম্পা.)। *সংস্কৃতসাহিত্যেতিহাসঃ*। বারাণসী : চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৭

সিংহরয, হরিদাস (সম্পা.)। *ছন্দঃসূত্রভাষ্যম্ যাদবপ্রকাশকৃতম*। কলকাতা : দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭৭

হলায়ুধ। *অধিধানরত্নমালা*। সম্পা. আচার্য প্রিয়ব্রত শর্মা। বারাণসী : চৌখম্বা ওরিয়েন্টালিয়া, ২০১২

হলায়ুধ। *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রম*। সম্পা. বিশ্বনাথ শাস্ত্রী। কলকাতা : গণেশযন্ত্রে মুদ্রিতম্, ১৮৭৪

হলায়ুধ। *কবিরহস্য*। (সম্পা.) শৌরীন্দ্রমোহন-ঠাকুরঃ। কলকাতা : রয প্রেস, ১৮৭৯

## বাংলা-পুস্তকমালা :

অধিকারী, তারকনাথ (সম্পা.)। *নিরুক্ত* কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২

অনির্বাণ, *বেদ মীমাংসা*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬

আচার্য, নারায়ণ রাম (সম্পা.)। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*। দিল্লী : রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত সংস্থান, ২০১০ (পু. মু.)

কাণে, পি. ভি. *হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র*। পুণা: ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৫ (২য় সং.)

কালিদাস, *রঘুবংশ*। অশোকনাথ শাস্ত্রী ও সরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ (সম্পা.)। কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১৩৫৬ (বঙ্গাব্দ)।

কৃষ্ণযজ্ব, *মীমাংসাপরিভাষা*। (সম্পা.) নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৩ (পু. মু.) ২০০৬ (প্রথম প্রকাশ)।

গোভিল, *গোভিলগৃহ্যসূত্রম্*। সত্যব্রত সামশ্রমী (টী. এবং অনু.)। কলকাতা : দি সত্য প্রেস, ১৮৮৬

*গৌড় কাহিনী*। শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ (সম্পা.)। কলকাতা : দি আর্ট সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৭

চক্রবর্তী, শ্রীবাণী। *সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন*। কলকাতা : ১৯৬৪

চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ (সম্পা.)। *সাম্প্রতিকতমকালে বাঙালীর বেদ-গবেষণা এবং প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬

চট্টোপাধ্যায়, অমরকুমার (সম্পা.)। *আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০২

চট্টোপাধ্যায়, হরিলাল (সম্পা.)। *বৈষ্ণব-ইতিহাস*। কলকাতা: শঙ্কর প্রেস, ৪৩৯ চৈতন্যাব্দ

চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী (সম্পা.)। *অলংকার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস.* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২০ বঙ্গাব্দ (তৃতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ)

চট্টোপাধ্যায়, অমরকুমার (সম্পা.)। *ঋগ্বেদীয় গৃহ্যসূত্র (আশ্বলায়ন-শাঙ্খায়ন-কৌষীতকী গৃহ্যসূত্র)*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৮(বঙ্গাব্দ)।

চ্যাটার্জী, অশোক (সম্পা.)| বৈদিক ও লৌকিক ছন্দে পিঙ্গল| কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০

জৈমিনি। *মীমাসাদর্শনম্* (সম্পা.) এবং বাংলা (অনু.) ভূতনাথ সপ্ততীর্থ। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৯

তর্করত্ন, পঞ্চানন এবং মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। *মনুসংহিতা*। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩ (পু. মু.)

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.)। *বায়ুপুরাণ*। কলকাতা: নবভারতী প্রকাশনী, ১৯৮৩ (১৩৯০ বঙ্গাব্দ)।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.)। *অগ্নিমহাপুরাণ*। কলকাতা: নবভারতী প্রকাশনী, ১৮৯০

..... (সম্পা.)। *মৎস্যপুরাণ*। কলকাতা: নবভারতী প্রকাশনী, ১৯৮৮ (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ)।

দণ্ডী, *কাব্যাদর্শ* চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৮ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)।

দত্ত, চৈতালী (সম্পা.)। *মনুসংহিতা*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০০৮

দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সম্পা.)। *বাংলা ভাষার অভিধান*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১১

ধর্মপাল, গৌরী (সম্পা.)। *বেদের ভাষা ও ছন্দ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫

পাল, বিপদভঞ্জন (সম্পা.)। *বেদান্তসার*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২২ (বঙ্গাব্দ) দশম সংস্করণ।

পাহাড়ী, অন্নদাশঙ্কর (সম্পা.)। *মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়)*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৮.

পিঙ্গল, *পিঙ্গলছন্দঃসূত্রম* (সম্পা.) সীতানাথ সামাধ্যায়ী ভট্টাচার্য এবং অমর কুমার চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৯ (বঙ্গাব্দ)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু (সম্পা.)। *মনুসংহিতা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভণ্ডার, ১৪১০.

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা.)। *পারস্কর গৃহ্যসূত্র* কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৬(বঙ্গাব্দ)

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি (সম্পা.)। *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা: ২০০৩ (তৃতীয় সংস্করণ)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি (সম্পা.)। *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (সম্পা.)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, নিউ দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ২০০১

বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমার (সম্পা.)। *মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়)*। কলকাতা: সদেশ, ২০০৯ (নবম সংস্করণ)

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলিকাতা: দি ঢাকা স্টুডেন্ট'স লাইব্রেরী, ১৯৭০

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *নাট্যশাস্ত্র*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ২০১৪ (ষ. মু.)

বসু, যোগীরাজ। *বেদের পরিচয়।* কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩

বসু, সুমিতা (সম্পা.)। *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা (ব্যবহার অধ্যায়)*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. ১৪০৭ (বঙ্গাব্দ)

বসু, অনিলচন্দ্র (সম্পা.)। *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৯৯

বসু, অনিলচন্দ্র (সম্পা.)। *রঘুবংশম* কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪০৭ (বঙ্গাব্দ)

বাগচী, যোগেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিকতত্ত্ব*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৫ (প্রথম সংস্করণ)।

বাল্মীকি, *রামায়ণ*। পঞ্চানন-তর্করত্ন (সম্পা.)। কোলকাতা: বেণীমাধবশীল লাইব্রেরী, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ (পুনর্মুদ্রণ)।

বিদ্যালঙ্কার, রামগোপাল (সম্পা.)। *সংস্কার প্রকাশ*। কলকাতা: বৈদিক প্রেস, ২০০০

বিশ্বনাথ, *সাহিত্যদর্পণ* (দশম পরিচ্ছেদ)। উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬ (তৃতীয় সংস্করণ)

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। (সম্পা.)। *ধর্মসূত্রস্*। ক্যালকাটা : পুস্থি পুস্তক, ১৯৭২

ভট্টাচার্য, সুকুমারী (সম্পা.)। *বিবাহ প্রসঙ্গে*। কলকাতা: ক্যাম্প, ২০১০ (চতুর্থ সংস্করণ)

ভট্টাচার্য, অমিত (সম্পা.)। *প্রাচীন ভারতের সংস্কার চর্চা*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০২

ভট্টাচার্য্য, দুর্গামোহন (সম্পা.)। *প্রাচীন বঙ্গে বেদচর্চা*। কলকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, (প্রকাশকাল অপ্রাপ্ত)

ভট্টাচার্য্য, দূর্গামোহন (সম্পা.)। *ব্রাহ্মণসর্বস্বম্*। কোলকাতা : সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬০

ভট্টাচার্য্য, বিমানচন্দ্র (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*। কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৬৭

ভট্টাচার্য্য, ভবানীপ্রসাদ এবং তারকনাথ অধিকারী (সম্পা.)। *বৈদিক সংকলন*। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৪

ভট্টাচার্য্য, পরেশচন্দ্র (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ২০১৪

ভট্টাচার্য্য, পরেশচন্দ্র. (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলিকাতা: জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৯৯৫

ভট্টাচার্য, ঝর্ণা (সম্পা.)। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৬

ভট্টাচার্য্য, তপনশঙ্কর (সম্পা.)। *অষ্টাধ্যায়ী*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৪

ভৌমিক, জাহ্নবীচরণ (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩

মিত্র, সনৎকুমার (সম্পা.)। *সাহিত্য-টীকা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৩ (প্রথম প্রকাশ)।

মুখোপাধ্যায়, গুরুশঙ্কর (সম্পা.)। *ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণ*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫

রঘুনন্দন, *শুদ্ধিতত্ত্বম্*। অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.)। কলকাতা: সদেশ, ২০০৯

রায়, নীহাররঞ্জন (সম্পা.)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস – আদি পর্ব* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪২০ (বঙ্গাব্দ)।

রায়, নিখিলনাথ (সম্পা.)। *ঐতিহাসিক চিত্র*। চতুর্থ খণ্ড, প্রথম বর্ষ। কলকাতা: ত্রিদিব প্রেস, ১৩১১-১৩১২

লাহিড়ী, দুর্গাদাস (সম্পা.)। *লক্ষ্মণ-সেন*। কলকাতা: পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়, ১৫৮৩ বঙ্গাব্দ।

শাস্ত্রী, সুখময় (সম্পা.)। *পূর্বমীমাংসাদর্শন*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩.

সরকার, দেবার্চনা (সম্পা.)। *নিত্যকালের তুই পুরাতনা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৩

সেন, পৃথ্বীরাজ. (সম্পা.)। *অষ্টাদশপুরাণ কাহিনী সমগ্র*। কলকাতা: গিরিজা লাইব্রেরী, ২০১৪

সেন, প্রভাসচন্দ্র (সম্পা.)। *বাঙলার ইতিহাস*। কলকাতা: কথাশিল্প প্রকাশ, ১৯৪৯

সেনগুপ্ত, আনন্দগোপাল (সম্পা.)। *সমকালীন*। সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ১৩৬৬ (বঙ্গাব্দ)।

সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল (সম্পা.)। *স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যা সাধক*। কলকাতা: শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৪ (প্রথম প্রকাশ)।

সেনগুপ্ত, গৌরাঙ্গগোপাল (সম্পা.)। *বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক*। কলকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৬৫ (প্রথম সংস্করণ)।

হলায়ুধ, *কবিরহস্য।* (সম্পা.) রামনাথ ভট্টাচার্য্য। বাংলা অনু. কালীপদ-সিদ্ধান্তশাস্ত্রী। কলকাতা: দি সংস্কৃত বুক ডিপো প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

হলায়ুধ। *ব্রাহ্মণসর্বস্বম্*। প্রথম খণ্ড, (অনু.) বিশ্বনাথ মাইতি। কলকাতা : শ্রীগুরু প্রকাশনা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

হলায়ুধ। *ব্রাহ্মণসর্বস্বম্*। (সম্পা.) তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ। কলকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (তৃ. সং.)।

## English books :

Altekar, A. S. *The Rāshtrakūtas and Their Times*. Poona : Oriental Book Agency, 1934.

Chatterji, Kshitish Chandra (Ed.). *Vedic Selections.* Part. 3. Calcutta : University of Calcutta, 1957.

Chakravarti, N. P. (Ed.). *Archaeological Survey of India, Epigraphia Indica*. Vol. XXV, Delhi : The Government of India Press, 1940-42.

Dasgupta, S. N. *A History of Sanskrit Literature.* Vol. I. Calcutta (Now Kolkata): University of Calcutta, 1975 (Second Ed.).

Dutta Sastri, Kali Kumar (Ed.). *Bengal's Contributions to Sanskrit Literature.* Calcutta (Now Kolkata): Sanskrit College, 1974

Griffith, Ralph T. H. *The Hymns of the Ṛgveda.* Ed. J. L. Shastri. Delhi : MLBD, 2004 (Print).

Halāyudha-Miśra. *Seka-śubhodayā*. Ed. & Eng. Translation by Sukumar Sen. Kolkata: The Asiatic Society, 2002 Rpt. (1963).

Halāyudha. *Abhidhānaratnamālā*. (Ed.) Th. Aufrecht. Leipzig: FR. NIES (Carl B. Lorck), 1861.

Halāyudha-Bhaṭṭa, *Mimāṃsā-Śāstra-Sarvasva*. Vol. XVII & XVIII. Ed. Umesa Misra. Patna: Bihar and Orissa Research Society, 1931.

Joshi, K. L. (Ed.) *Agnimahāpurāṇam*. (Vol.I & II.) Delhi: Parimal Publication, 2005.

Kane, Pandurang Vaman, *History of Dharmaśāstra.* Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1974.

Keith, A. Berriedale. *A History of Sanskrit Literature.* Oxford: Oxford University Press, 1928.

Lahiri, Durgadas. (Ed & Trans.) *Atharvaveda.* (Vol. I-V.) Calcutta (now Kolkata) : 1925.

Max Muller, F. (Ed.). *The Sacred Hymns of the Brāhmaṇas.* London: Henry Frowde Oxford University Press, 1892.

Macdonell, A. A. (Ed.). *Kātyāyana's Sarvānukramaṇī of Ṛgveda*. Oxford: Clarendon Press, 1886.

Macdonell, *A. History of Sanskrit Literature*. New York: D. Appleton and Company, 1899.

…….. *Vedic Mythology*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2000.

Mahajan, Vidya Dhar. *Ancient India*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1975 (1st Ed.).

Max Mmuller, F. *A History of Ancient Sanskrit Literature*. London: Williams and Norgate, 1859.

Misra, Jagadishchandra. *Vaidikabāṇmayasyetihasaḥ*. (Ed.) Brahmananda Tripathi. Baranasi : Choukhamba Surabharati Prakashan, 2002 (Rpt.).

Monier-Williams, Monier. *A Sanskrit-English Dictionary*. (Vol. I). Delhi: MLBD, Pvt. Ltd., 1993.

Monier-Williams, Monier. *Indian Wisdom*. London: Waterloo Place, 1875.

Mukhopadhyay, Govindagopal (Ed.). *A New Tri-lingual Dictionary*. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2006.

Max Muller, F. *History of Ancient Sanskrit Literature*. Delhi: MLBD, 2002.

Nagar, R. S. and K. L. Joshi. *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni*. (Vol. I.) Delhi: Parimal Publication, 2009.

Nath Reu, Bisheshwar (Ed.). *History of the Rāshtrakūtas*. Jodhpur: The Marwar State Press, 1933.

Śaunaka. *Ṛgveda-Prātiśākhya*. Ed. Taraknath Adhikari. Kolkata: Sanskrit Book Depo, 2007.

Sashtri, Nilakanta K. A. (Ed.). *A History of South India : from pre historic times to the fall of Vijayanagara*. London: Oxford University Press, 1955.

Sharma, Basudeb.(Ed.) *Raghuvaṃśa of Kālidāsa*. Mumbai: Nirnay Sagar Press, 1918.

Śaunaka. *Ṛgvedaprātiśākhya.* Ed. Virendra Kumar Varma, with Uvata's commentary and Hindi trans. Together with Visnumitras Vargadvayavrtti. Varanasi: Banaras Hindi University, 1970.

Shastri, Jagadishlal. (Ed.) *Manusaṃhitā.* Delhi: MLBD. 2008.

Sharma, Chandradhar. (Ed.) *Śatapatha Brāhmaṇa*. (Vol. I.) Kashi (Varanasi): Achyuta Granthamala Karyalaya, 1994.

Sharma, P. R. P. *Encyclopedia of Vedas.* New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd., 2007.

Telang, N. Kanta Nath Shastry and Braj Bihari Choubey. *The New Vedic Selection.* Varanasi: Prachya Bharati Prakashan, 1965.

Upadhyay, Chandrashekhar and Anil Kumar Upadhyay (Ed.). *Vaidika-Koṣa.* (Vol. I & III.) Delhi: Nag Publishers, 1995.

*Vātsyāyana*, *Kāma-Sūtra*. Lence Dane. (ed.). Vermont: Brijbasi Art Press Ltd., 2003.

*Vedāṅgas: Language, Religion, Philosophy and Science (Collection of Research Articles)*. Ed. Tapan Sankar Bhattacharyya. Jadavpur University. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2018.

Winternitz, M. *A History of Indian Literature.* Vol. I. Part. 1, Calcutta (now Kolkata): University of Calcutta, 1962.

Yāska. *Nirukta*. (Ed.) Mukunda Jha Sharma. Delhi: Chaukhamba Sanskrit Pratisthan, 2008.

## Hindi Book:

श्रीवास्तव, कृष्णचन्द्र (सम्पा.)। *प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति*। ईलाहाबाद : यूनाइटेड बुक डिपो, २०१८-२०१९ (संशोधित तथा परिवर्धित)

## Web links:

| | |
|---|---|
| https://archive.org | accessed on 10.12.2019 |
| https://www.granthsanjeevani.com | accessed on 01. 03. 2020 |
| https://epustakalay.com | accessed on 12.07.2021 |
| https://epgp.inflibnet.ac.in | accessed on 08.09.2021 |
| https://sanskritdocuments.org | accessed on 28.01.2022 |
| https://rarebooksocietyofindia.org | accessed on 03.08.2022 |
| https://books.google.com | accessed on 27.01.2023 |

**********

Signature of the Candidate

**Mahadeb Das**

Dated: